সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

এবং অন্যান্য প্রবন্ধ

বিষ্ণু দে

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২০

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কে

প্রথম সিগনেট সংস্করণ

আশ্বিন ১৩৫৯

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০।২ এলগিন রোড

কলকাতা ২০

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সহায়তা করেছেন

পীযূষ মিত্র

মুদ্রক

শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ

৩২ আপার সারকুলার রোড

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইন্ডিং ওয়ার্কস্

৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রিট

দাম দু টাকা

সূচীপত্র

১॥ বাংলাসাহিত্যে প্রগতি . . . ১
২॥ অবনীন্দ্রনাথ . . . ১৬
৩॥ যামিনী রায় . . . ২১
৪॥ বাংলাসাহিত্যের ধারা . . . ২৬
৫॥ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত . . . ৩৪
৬॥ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ . . . ৩৯
৭॥ বীরবল থেকে পরশুরাম . . . ৪৪
৮॥ রাজায়-রাজায় . . . ৫১
৯॥ আরাগঁ . . . ৬৬
১০॥ পরিবর্তমান এই বিশ্বে . . . ৭৬
১১॥ পিকাসো . . . ৮৬
১২॥ ক্যালকাটা গ্রুপ . . . ৯০
১৩॥ সোভিয়েট শিল্প-প্রদর্শনী . . . ৯৩
১৪॥ লোকসঙ্গীত . . . ৯৮
১৫॥ বুদ্ধিবাদী উপন্যাস . . . ১০৩
১৬॥ বাংলা গদ্যকবিতা . . . ১০৭
১৭॥ হাল্‌কা কবিতা . . . ১১২
১৮॥ এলিঅট্‌ . . . ১১৫

বাংলাসাহিত্যে প্রগতি

বাংলাসাহিত্যে প্রগতির কথা প্রায়ই শোনা গেছে। এবারে মনে হয় কথাটা বিশেষ একটা অর্থেই উঠেছে। তার একটা কারণ অবশ্যই মনের আবহাওয়ায় কয়েক বছর যে প্রত্যক্ষের দিকে বৈজ্ঞানিকমন্য ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রসার। তাছাড়া লেখকেরা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, তার থেকেও লেখার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলা যেতে পারে যে আমাদের সাহিত্যের শৈশব অতিক্রান্ত এবং সাহিত্যিকরা আজ বিষয় ও কলাকৌশল, ভাব ও রূপের অভিন্নতায় সন্দেহহীন। কলাকৌশল বা টেকনিকের প্রগতি নির্ভর করে মানসের ব্যাপ্তি বা রূপান্তরে। আর এই মনের মানচিত্রে সৃষ্টির আবেগ থাকবে কি করে যদি সে জীবনের দিকে না তাকায়? সাধারণের জীবনেই তো এ মানসসরোবরের উৎস, যদিচ তার নীল জলে আকাশের ছবি প্রতিফলিত। এই উৎসের সন্ধান কেউ হয়তো জীবনযাত্রার কর্মধারায় পান, কেউ জনগণমন-অধিনায়কদের খুঁজে পান ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় প্রগতিতে।

সমস্যা ওঠে জ্ঞান ও সৃষ্টিক্রিয়ার হ্রস্বদীর্ঘে। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে প্রত্যক্ষ জীবন থেকে মন সরে যায় জ্ঞাত পরোক্ষের স্বকীয় ধর্মে। শিল্প-সাহিত্যে কিঞ্চিৎ স্থায়ী বন্দোবস্তের কারণ মানবচৈতন্যেরই ভেস্‌টেড ইন্টারেস্টস্‌ বা সম্পত্তির স্থাবরতার দিকে ঝোঁক। ভাষার একটা স্বাভাবিক স্থিতিপ্রবণতার জন্য রচনার গতিতে আসে দ্বিধা। গতিতে গা ভাসালে অবশ্য খুঁটিতে বাঁধা মনের দ্বিধাও নিষ্প্রয়োজন। সজীব রচনাতে তাই শিল্পী ও শিল্পবস্তু, বিষয় ও টেকনিকে টান পড়ে জ্যাবদ্ধ ধনুকের টঙ্কারে ধনু ও ছিলার টানের মতো। লক্ষ্যভেদের লক্ষ্য হয়তো অনেক সময়ে সরাসরি চেনা যায় না, ধনুর্ভঙ্গও হতে পারে। তবু প্রগতিশীল সাহিত্যের চিরকালীন লক্ষণ হল এই চৈতন্য-জ্যাবদ্ধ টান। অভ্যাসিক শিল্প উপাদেয় পণ্যশিল্প হতে পারে, চমৎকার কুটিরশিল্প হতে পারে, প্রগতির প্রশ্নক্ষেপ সে অভ্যাসের যন্ত্রে অবান্তর।

নেতিতে আরম্ভ হতে পারে এই মানসের প্রগতি। তারপরে, মিনারবাসীর ভূতলে অবতরণ। মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে ঐ চৈতন্য, ঐ বোধ। ঐ বোধের পেশীবহুল ছাপ আসে স্বভাবজড় পাথরে, রংরেখায়, শব্দে, ভাষার বনেদী রীতিতে, বাক্যের গোঁড়ামিতে। জীবনের প্রত্যক্ষে আর সর্বসংস্কৃতিগত পরোক্ষের দ্বন্দ্ব থেকে-থেকে মাটিতে এসে মেশে প্রচন্ড পালোয়ানিতে। তাই প্রয়োজন শিল্পীর অপক্ষপাত, পিকাসোর মতো নৈর্ব্যক্তিকতার সিদ্ধান্তে যাতে দ্বন্দ্বটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। ব্যক্তিগত বিষয়ী মাহাত্ম্যের ভঙ্গীটা অভ্যাসে সহজ, কিন্তু সেখানে

ধনুকের বন্ধন না থাকলেও, তীরের মুক্তিও নেই। অবশ্য একাকিত্বের শানে মাথাকুটেও মর্মান্তিক রোমাঞ্চকর গান রচনা করা যায়, বহির্জগতের পরিবর্তনকে মানসে না মেনে। অরণ্যে রোদনেরও সাময়িক সার্থকতা স্বীকার্য। আর নেতি নেতি ধ্বনিতে প্রত্যক্ষের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়, হিরণ্যকশিপুর ঈশ্বরপ্রমাণের মতো।

টেকনিকের সাধনাই শিল্পীকে জিজ্ঞাসার সীমান্তে টেকনিকের উৎসে নিয়ে যেতে পারে। রচনার পদ্ধতি চৈতন্যমার্গ বা বিশ্বাসের বিরোধী একথা শুধু অতিবামপন্থীদের অপ্রাকৃত মনেই ওঠে। কারণ বিজ্ঞানপদ্ধতির সত্যের মতো শিল্পপদ্ধতির উপার্জনও শ্রেণীহীন। মায়াকফস্কির প্রতীকচর্চার পরিণতিতে তাই গন্তব্য ছিল বিপ্লব। একমাত্র ন্যায়সঙ্গত পরিণতি ছিল সেইখানে, নাহলে থাকে র‍্যাঁবো-র মরুভূমিতে মৃত্যু। লুই আরাগঁ-র অবচেতন-বাদের খেলা থেকে ইউ. আর. আর. এস-এর গানের পরিণতিতেও তাই দেখি। অতএব লেখককে লেখা ছাড়তে কেউ বলছে না, বলছে শুধু লেখকধর্মী প্রস্তুতির কথা। আপন সমস্যাকে শুধু নিজের মনের গহ্বরনিষ্ক্রান্ত স্বয়ম্ভু জীব না ভেবে, সে যে ইতিহাসব্যাপী সমস্যারও অংশ এই উপলব্ধির নিয়ত চর্চা লেখকের প্রস্তুতির সহায়। এ চর্চায় বিষয়বস্তুর ও আধারের বিস্তার ঘটে অধিকন্তু জীবনের ধারা বহুমিশ্রিত সমগ্রতা পায়। আর সমগ্রের বিকাশের অসীম সম্ভাবনায় শিল্পীর শিল্পী হিসাবে পরিণতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর সন্ধানে বা ব্যক্তিগত বিশেষত্বের মৃগতৃষ্ণিকায় ঘোরায় লাভ আখেরে কমই। কারণ নিছক শিল্পগত বিবেচনাতেও এই সমাজভঙ্গের দিনে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সুস্থ পরিণতি ও ভারসাম্য আনা কঠিন। কারণ সমাজের সঙ্গে তাল কাটলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বোধও কেটে যায়। আর ঐ স্বাধীনতার বোধ ছাড়া মনের বিকাশ সম্ভব নয়। স্বাধীনতা তাই শুধু সীমা ও পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকারে। নিঃসঙ্গতার অ্যাবস্ট্রাকশন্-এ —পরোক্ষ নিদানে স্বাধীনতা কোথায়?

কাব্যের উৎস যতই রহস্যময় হোক, কাব্য কিছু গোপন তন্ত্রমন্ত্র নয়। কাব্য সম্বোধন, সম্বোধনে শ্রোতার সম্বন্ধ গ্রাহ্য। সোঽহম-বাদে সম্ভাষণ সম্বোধনের সুযোগ বেশি নয়। আমাদের লেখকেরা জানেন যে দৃষ্ট ও জ্ঞেয় দ্রষ্টার জ্ঞানে জারিয়ে যায় এবং তার পরিবর্তনে তাঁদের পরিণতির ভ্রান্তি। ইন্টারপ্রিটেশন্ তাই চেঞ্জ-এ সম্পূর্ণ। সেই জন্যই তাঁরা যন্ত্রবৎ নতুন অভ্যাসের কলে পা দেন না, কোনো দর্শন থেকে টুকরো কুড়িয়ে জোড়া লাগাতেও চান না। বিশেষত মার্ক্সীয় দর্শনে এই চিরকালের জন্য একবার অর্জিত অভ্যাসের যান্ত্রিকতা অচল। সে দর্শনের ভিত্তিই হচ্ছে চিরদ্বৈতাদ্বৈতের গতিশীল জীবন্ত পরিণতিতে, প্রথাসিদ্ধ দার্শনিকতার জড় অবসর যান্ত্রিসূত্রে নেই। সে পরগাছা চালাকির চেয়ে জিজ্ঞাসুমাত্র বিষয়ানুরাগ সার্থক।

বিষয়ের বা বস্তুসত্তার অনুরাগে অন্তত সেই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি আসে, যাতে জীবনের বহুব্যাপ্ত সমগ্রতার আভাস পায়, যাতে শিল্পরূপ ও শিল্পবস্তু একটি সক্রিয়তার দুটি দিক বলে বুঝি। ইংরেজি সাহিত্যে এলিঅট্ প্রায় পেয়েছিলেন এই বিষয়-সমাধি। কিন্তু তাঁর আশ্চর্য পরিণতি তির্যক হয়ে রইল বর্তমানে অবাস্তব এক ধর্মসমাজঘটিত দর্শনের হস্তক্ষেপে। তবু বলতে হবে যে এলিঅটের এই বিষয়শ্রদ্ধাই তাঁকে ইংরেজদের শ্রেষ্ঠ কবি করেছে এবং ঐ

নৈর্ব্যক্তিক প্রয়াসের জন্যই তাঁর প্রভাব হয়েছে মুক্তিবহ। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের কুম্ভীরক বৃত্তিতে যে মুক্তি নেই, সেটা আবার স্মরণ করি। দার্শনিক চয়নিকা প্রয়োগে বামপন্থীর মনোবিকার যে ঘটে, তার প্রমাণ স্টেন্-স্পেন্ডর-লুইসের দল। তাছাড়া, একটা মতবাদের জ্ঞানের দিক যখন গভীর হয়—এবং আমরা কড্‌ওএল-এর 'ইলিউসন অ্যান্ড রিয়ালিটি' বা জ্যাক লিন্ডসের 'শর্ট হিসট্রি অব কালচার' ও 'দি অ্যানাটমি অব স্পিরিট'-এর কাছে একান্ত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—তখনও শিল্পসাহিত্যের উৎসে চৈতন্যের গভীরে সে মত চারিয়ে যেতে সময় লাগে। কড্‌ওএল-এর বা লিন্ডসের কবিতায় প্রাক্‌মার্ক্সীয় মামুলীত্ব কথাটার প্রমাণ। তবুতো কড্‌ওএল জীবন দিয়েছিলেন এই মতে নিজেকে মেলাবার জন্য। আর যাঁরা এই জীবনে বুদ্ধিতে এক সাধনা ধরেন নি, যাঁরা এক দাগ ওষুধের মতো পাঁজির বর্ষফলের মতো মার্ক্সিস্‌মের চটক ব্যবহার করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের নিজেদের মনগড়া ছক্ থেকে দূরে যাবার প্রতিবিপ্লবী ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। এলিঅটের নৈর্ব্যক্তিকতার তীব্র চেষ্টা এর চেয়ে প্রগতিবান। তাঁর ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ব্যক্তিগত বিশৃঙ্খলা বিষয়ের নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষে দানা বাঁধতে পারে। সে কৈলাসভাবনা থেকে তবু ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিস্তার আনা সম্ভব, দৃশ্যটা অন্তত আয়ত্তে আসতে পারে। চালাকির দ্বারা কোন মহৎকার্য সাধিত হয় না, এই কথার জের টেনেই বলা যায় যে খণ্ডিত মনের হঠকারিতায় প্রতিক্রিয়ার চোরাবালিই পরিণাম, ব্যক্তিস্বরূপের মুক্তি নয়। ভালেরির আত্মভুক্ সর্পে নয়, আমাদের লেখকেরা জানেন যে বিশ্বরূপদর্শনেই ব্যক্তির ঐশ্বর্য।

ব্যাপারটা বলাই বাহুল্য, মোটেই সরল নয়। তার উপরে আছে বাংলা-সাহিত্যের অপরিসর কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহ্যের চাপ। এবং সংস্কৃতিগত রচনায় প্রত্যক্ষ ইমারতকে অস্বীকার করে অর্থনীতিগত কাঠামোতে কাজ করা যায় না। আমাদের লেখকেরা চেষ্টা অবশ্য করছেন (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ স্থানমাহাত্ম্য—লোকাল কালার এ কথাটার প্রমাণ) প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রা ও মানস-কে সেতুবন্ধে মেলাতে, কিন্তু চৈতন্যের স্রোত গভীর ও প্রবল। সেই গভীরেই শিল্পসাহিত্যের কারবার। হয়তো যদি কিছু প্রচণ্ড আলোড়নে সারা দেশের জনমানস পাশ ফেরে, তাহলে এই দ্বিধা দ্রুত সমাধান পেতে পারে। ইতিহাসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে আর তাতে জনসাধারণের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধিতে কল্পনারাজ্যেও লাগছে হাওয়া। তাই জনসাধারণের জীবনে ও আন্দোলনে লেখকদের দৃষ্টি যেমন বেশি যাচ্ছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যে ও টেকনিকের প্রশ্নেও লেখকরা মন দিচ্ছেন।

এই সাহিত্যিক ঐতিহ্য মোটামুটি ভাবে স্যাক্‌সনোত্তর ইংরেজি সাহিত্যের সমবয়সী হলেও এর ক্ষীণধারা শুধু থেকে থেকে কয়েকবার ঝল্‌সিয়ে উঠেছে। সংস্কৃত ঐতিহ্যের অতি নিকট হলেও বাংলার প্রাকৃত ঐতিহ্যের স্বভাব ভিন্ন। এমনকি কৃষ্ণকীর্তন-এর মতো প্রাচীন ও কাঁচা রচনাতেও আমরা সংস্কৃতের রাজসভাশোভন প্রথাসিদ্ধ মানস ও দেশজ লৌকিক মানসের অস্পষ্ট কিন্তু সুস্থ

প্রাকৃতধর্মের বিরোধ দেখতে পাই। লোকমানসের এই স্বাতন্ত্র্য শুধু গ্রাম্যতা বা স্থূলতা ভাবলে ভুল হবে। এ মানস জীবনধর্মী, জীবনভোগী, প্রত্যক্ষবোদ্ধা মন, যা জনসভ্যতারই প্রাণময় লক্ষণ। এ এক জীবনকে পরিগ্রহণের ভঙ্গী, প্রাত্যহিককে স্বীকারের দর্শন, তাই এতে পাই হাসিকান্নার মধ্যে একটা বাস্তববিলাসের কর্মঠতা, সময়ে সময়ে অপরাজেয় জীবনীশক্তির হাস্যোজ্জ্বল আভাস। এতে বিরুদ্ধ মেলে মানিয়ে নেবার স্বাস্থ্যে, দেবদেবী হয়ে ওঠে ঘরোয়া মানুষ, মানুষ হয়ে ওঠে বিস্ময়কর। এ মানসে অশ্লীলতার সন্ধান অন্ধ রুচির খেয়াল, কারণ এর মূল্যজ্ঞান এসেছিল সমাজের একটা বিশেষ সাময়িক অখণ্ডতায়, শ্রেণীগত ধর্মব্যবস্থার মধ্যেই এক জীবনব্যাপী আবেগের ছকে। সে ছকের পৌরাণিক মহলে মহলে ছিল লোকের যাতায়াত, উপরে নিচে ছিল সম্বন্ধ, নিচের লোক গোপন প্রতিশোধে টেনে আনত উপরের জবরদস্তদের। অনার্য শিব তো এইভাবেই গ্রীকপুরাণে ডায়োনিসসের মতোই আর্যজগতে প্রবেশ করেন। আবার সেই নব্যআর্য শিব যখন ব্রহ্মণ্যবিলাসী হয়ে উঠলেন, তখন সে রুদ্র মহাদেবকে টেনে আনতে হল নেশাখোর বেকার স্বামীর প্রাপ্য গঞ্জনার মধ্যে। ব্রহ্মণ্যের অন্নদাতা সদাগরকে তাই মানতে হল মনসার লৌকিক শক্তি। অবশ্যই সংস্কৃতের বৈদগ্ধ্য অনেকখানি আমরা নিলুম, যেমন নিলুম অলঙ্কার আর রীতির নির্বিশেষ অভ্যাসের সামান্যতা। উপনিষদ্ ও মহাভারতোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যের ছদ্মধ্রুপদী ভাব যে তবু বাংলা সাহিত্যের গতিরুদ্ধ করতে পারেনি, সে শুধু দেশী কবিরা মৃত্তিকার সন্তান ছিলেন বলেই। জনমনের বিশ্বাস ও দৃষ্টি এবং তাদের জীবনের রূপের প্রভাবেই কন্‌ভেন্‌শন্‌সের ঈষৎ ভিন্ন চেহারা আমাদের প্রতিবাদী প্রাকৃত সাহিত্যে।

বলার দরকার নেই যে সেকালে আমাদের স্বাধীনতার মাত্রা ইচ্ছাধীন ছিল না, না ছিল আত্মসচেতনতার সুযোগ বা প্রয়োজন। দুটি মোটা পথ ছিল—এক দেবদেবী ভাঙাগড়া, আরেক নরনারীর সম্বন্ধের বিদগ্ধচর্চা। সে চর্চার সফিস্‌টিকেশন আজও আমরা গ্রাম্যসাধারণেরও প্রেমালাপে শুনতে পাই।

মধ্যযুগের পরিধিতেই এই একটা মানবিকতার পথে লোকে নিষ্পত্তি ও ক্ষতিপূরণ আদায় করে এসেছে। চণ্ডীকাব্যে, নানা মঙ্গলকাব্যে, শিবদুর্গায়, পাঁচালী ও যাত্রা প্রভৃতি জননাট্যে এ ক্ষতিপূরণটা বেশ বোঝা যায়। চিত্রশিল্পেও এই মন কাজ করেছিল; পটে, পাটায়, মেলার পুতুলে, আল্‌পনায়, ব্রতকথায়, ছড়ায়, গ্রাম্যগানে এ মন রূপ পেয়েছিল। (অবনীন্দ্রনাথের বাংলার ব্রত এদিকে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।) পূর্ববঙ্গগাথায় এই জীবনেরই প্রত্যক্ষতা। লোকমনের দিগ্বিজয় প্রাদেশিক বাংলা দেশে মহাকাব্য দুটিতেও পৌঁছেছিল, বৈষ্ণব তত্ত্বকথাতেও তাই প্রেমের সরস আবেদন। মানি পদকল্পতরু-র কন্‌ভেনশন্‌স্ প্রাণহীন—কেননা বৈষ্ণব কবিদের মন ছিল জনবোধ্য বিষয়ের আবেদনে, সংস্কৃত রীতিবাদীদের মতো কন্‌ভেন্‌শন্‌সের চর্চায় নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষণে ক্ষণে সূক্ষ্ম বাস্তবিকতার তীব্রতায় আমাদের মধ্যবিত্ত অভ্যাসের মধ্যে চমক লাগে। হঠাৎ এমন লাইন আসে যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যেই মেলে, যা আমাদের ডুবিয়ে দেয় মানুষের অভিজ্ঞতার গভীর সমুদ্রে। অন্তর্দৃষ্টি ও আবেগের পরিধি বেড়ে যায়। প্রেমের বেদনা যে দুই চলিষ্ণু ব্যক্তির চলিষ্ণু সম্বন্ধের দোটানার যন্ত্রণা ও আনন্দ বৈষ্ণবকবি এটা আমাদের বিস্ময়করভাবে জানিয়ে দেন।

খানিকটা অস্পষ্ট অবশ্য এই মানস। তবু এই মানসের ছাপ আমাদের য়ুরোপীয় যুগ অবধি মোটামুটি একভাবে দেখা যায়।

তারপরে এল তাতে পরিবর্তনের ঝড়। ঈশ্বরগুপ্তকে বলা যায় শেষ জনকবি, তিনি লিখেছিলেন ইতিহাসের ঘোর বিশৃঙ্খলার যুগে, অনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে অতীতের ব্যবস্থার দিকে বারে‑বারে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে। এক হিসাবে বিদ্যাসাগর আমাদের সবচেয়ে শুদ্ধ ও মহৎ য়ুরোপীয়, তাই তাঁর দরদী মানবিকতায় দেশী সংস্কৃতি দানা বেঁধেছিল। বিদ্যাসাগর নিজের সমগ্রতার জগৎ থেকে খুঁজলেন সাধারণ ভারসাম্য, এক নতুন ও রীতিমতো সংস্কৃতঘেঁষা ভাষায়। তার কারণ বোধহয় প্রথমত সংস্কৃতের দীর্ঘ ইতিহাস এবং দ্বিতীয়ত তখনকার উচ্ছৃঙ্খল নিকট প্রাদেশিকতা থেকে সংস্কৃত ঐতিহ্যের দূরত্বের আকর্ষণ। মধুসূদনের বিলম্বিত এবং বিষয়হীন রোমান্টিক ভাবাবেগই তাঁকে আবার বাংলায় ফিরিয়ে আনল। তাঁর প্রচন্ড প্রতিভায় দীপ্ত ভাষা অবশ্য বাংলার লৌকিক ঐতিহ্যে তাঁর য়ুরোপার্জিত দান। কিন্তু মধুসূদনের বিদ্রোহী রাগে দেবদেবীরা সাবেক বাংলার নরকল্পতাই পেয়েছেন, তাঁদের পোশাকী জাঁকজমক সত্ত্বেও। য়ুরোপীয় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ মধুসূদনের মানসে বাংলার জনজীবনের দৃষ্টির আভাস আশ্চর্য ব্যাপার। নূতন সভ্যতাকে সে দৃষ্টি নিজের ভাষ্য দেয়, সমালোচনার বাস্তবে মিলিয়ে নেয়। তাই মধুসূদনের নাটক দুটিতে ভাষার যে সরস স্বাস্থ্য, যে দেশজ পেশীর সচ্ছলতা পুলকিত করে, তা আমরা বঙ্কিমের হিন্দুত্বের সঙ্গে ইংরেজশাসনের মিশ্রণকৃতিত্বে পাই না।

বরং পাই কয়েকজন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকে, কালীসিংহে, টেকচাঁদে, এমনকি হেমচন্দ্রের কিছু কিছু সাময়িক পদ্যরচনায়। এঁদের দেখে কল্পনা করা যায় সে সময়কার দুই জগতের মধ্যে একটা সাময়িক ভারসাম্য। তাই দীনবন্ধু মিত্রকে প্রথম শ্রেণীর লেখক বলেই সম্ভাষণ করতে হয়, বিশেষ করে সধবার একাদশী-র সুস্থ বাস্তবিকতা ও ব্যঙ্গের জন্য। তাঁর পলায়নবিমুখ দুর্মর সাধারণ্য কারণ ও কার্য, উৎস ও গতিকে এক করতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে অতীতে ছোটেনি। তাঁর মানবিকতার করুণা ও হাস্যজাগ্রত শুভবুদ্ধিতে তিনি আমাদের নাট্য-সাহিত্যের শীর্ষে।

তবে স্থিতিটা যে অসম্পূর্ণ ও নেহাৎ সাময়িক ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। নাহলে আমাদের উপন্যাসের পুরোধা বঙ্কিম কেন তাঁর গম্ভীর আত্মমর্যাদা সত্ত্বেও উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলেন। অবশ্যই য়ুরোপীয় সভ্যতা, ব্রহ্মণ্য ও মধ্যবিত্ত স্থূলতার প্রেস্‌ক্রিপশন কেবল তাঁর স্বকীয় দায়িত্ব ছিল না। বঙ্কিম তাঁর প্রতিভার দ্বারা দ্বন্দ্ব নিরাকরণের চেষ্টাই করেছিলেন, আজকে সাহিত্যে ও রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াবাদীরা যদি তাঁকে নিয়ে টানাটানি করে, সে দেশের দুর্ভাগ্য।

বাংলার ছোট ঐতিহ্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের বিরাট আবির্ভাব একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। এ প্রচন্ড আবিষ্কারে আমরা যদি গালিলেও-র মতো উত্তেজিত হই তো সে মার্জনীয়। আমার এই সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে তাঁর মতো প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসাধ্য। অথচ তাঁর তুলনা অন্য সাহিত্যেও ঠিক পাওয়া যায় না। একদিকে

ইংরেজিতে চসর অন্যদিকে জার্মানে গয়টে মিলিয়ে হয়তো খানিকটা ঐতিহাসিক তুল্যাভাস দিতে পারেন। তাঁর প্রভাবে বাংলা সংস্কৃতির সুরে এল অনেক বিন্যাস, তাঁর প্রতিটি বই টেকনিকের প্রগতিতে পদক্ষেপ ও বিষয়বস্তুর বাহু-বিস্তার। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ আমাদের শেখালেন শালীনতা। মার্জিতরুচির এ উত্তরাধিকার অস্বীকার করা কোনো গোঁড়ামিতেই আর সম্ভব নয়। প্রাদেশিকতা-দুষ্ট বাংলায় তিনি আনলেন বিশ্বের মানদণ্ড। রোমান্টিকের পরিবর্তন-অভীপ্সা, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, পেলবতা তাঁরই দান। বড়ো কথা, সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন যে নিছক সৌন্দর্যের চেতনা, সেও আমরা রবীন্দ্র-নাথেই দেখেছি। ভিক্টোরীয় চরিত্রের বলিষ্ঠ সততা, কর্মের দায়িত্ববোধও বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা।

ব্যক্তির যে স্বকীয়তাবোধ, সেন্স অফ প্রাইভেসি তাও রবীন্দ্রোত্তর সমাজেই বাংলার মানসে কিছু দেখা যায়। তাছাড়া শুধু শ্রেষ্ঠ নন, তিনিই আমাদের সাহিত্যিক পেশার দায়িত্বের প্রথম ও চরম উদাহরণ। তাঁর দান আমাদের নানামুখ আত্মসচেতনতায় মানুষ করে তুলবে, যদিও তাঁর সম্পূর্ণতা তাঁর একান্ত স্বকীয় ব্যক্তিস্বরূপেই সম্ভব। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যই তাঁর ব্যাপক কর্মক্ষেত্র ছিল, তবু তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ নদীর মুখর স্রোত নয়, সংহতসত্তা হিমালয় নামে নগাধিরাজ যেন। যান্ত্রিক বামপন্থী ব্যাখ্যায় এই মহত্ত্বের মর্যাদা হয় না। বনেদী পরিবার, সামন্ততন্ত্রসমাজের অবশেষ ও বুর্জোয়া সভ্যতার উত্থানশক্তির সন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব এসব কথায় তাঁর দুর্নিবার প্রতিভার নিঃসঙ্গ সৃষ্টির আবেগের আংশিক ব্যাখ্যামাত্র। মহর্ষির প্রভাব, ব্রাহ্মসমাজের মানসও নিশ্চয়ই তাঁর প্রবল বিশ্বাসের মূলে ছিল, যার বলে সুন্দর ও মঙ্গল তাঁর কাছে পরোক্ষতত্ত্ব মাত্র ছিল না, ছিল জীবনের উদারনীতিক সত্য। তবু তাঁর প্রাণময় রহস্য শেষ হয়ে যায় না।

> তবু শূন্য শূন্য নয়
> ব্যথাময়
> অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
> একা একা সে অগ্নিতে
> দীপ্তগীতে
> সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

আশ্চর্য এই তৃপ্তিহীন প্রাণময়তার আশীবছরব্যাপী সমগ্রতা। এতেই টেকনিকের নব নব বিকাশে বিষয়ের প্রসার, এতেই শেষটা তিনি তাঁর পটভূমি প্রায় পিছনে ফেলে আধুনিক জীবনের মহত্তম কবি হয়ে উঠেছিলেন। তবু মোটামুটি বলতে হবে যে তাঁর নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাংলার রসালো মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় বিরাজমান থেকেও বহু ঊর্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখানে মধুসূদন বা দীনবন্ধু বরং আমাদের চেনা অগ্রজ।

সুখের কথা যে আমাদের লেখকেরা ইতিহাসের এক বড়ো মোড়ে দাঁড়িয়ে

সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধিতে চিন্তিত। সে স্বরূপ সন্ধানে ইয়েট্‌সের সেই 'গ্রেট মাদার'-এর প্রভাব আজ স্পষ্ট—সেই বিশ্বজননী; মৃত্তিকার মানুষের মনের দীর্ঘ স্মৃতি; ফ্রয়েডের অবচেতন; যিনি বিরহী দ্বন্দ্বে ক্ষেপিয়ে বেড়ান, জনসমষ্টির মিলনে যদি একবার তাল কাটে। তাইতো আজ মানব-চৈতন্যের বিকাশের বর্তমান অবস্থায় আমরা বুঝেছি যে টেকনিক ও জীবনোৎসারিত বিষয়বস্তু একটি ক্রিয়ার দুটি দিক, আর লেখক শুধু মাত্র কারুশিল্পী নয়, শুধু অনুপ্রেরণায় মত্তও নয়, সমগ্র মানুষ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় ভাবেই। অধিকন্তু শিল্পেতিহাসে প্রাথমিক গোষ্ঠীজীবনের কাল থেকে আমরা দেখেছি যে বস্তুরূপ ও বস্তুসত্তা অঙ্গাঙ্গি ধারায় চলে। রূপজ্ঞানের চর্চায় বহু শতাব্দীর সঞ্চয়ের পরে আজ তাই দেখি নিছক রূপায়ণে আসে প্রতীকের দ্রুতবোধ্যতা—যদি অবশ্য সমাজে থাকে সম। সুতরাং সজীব সমাজে উঁচ্‌কপালে রূপচর্চা ও কন্‌ভেন্‌-শন্‌সের সাক্ষাৎ আবেদন, সেকালের সাহিত্যিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বস্তুচর্চার বুর্জোয়া ঐশ্বর্যের অনুকরণে নয়। সাম্যবাদের প্রাকৃতধর্মে নিশ্চয়ই পণ্যবিপ্লবের প্রথম যুগে ফিরে চলার আহ্বান নেই।

২

অবনীন্দ্রনাথ

এক হিসাবে চিত্রশিল্পের সংবেদন মার্গে যে শুদ্ধির অবকাশ, তাতেই সাধারণ মানুষের আবেগ সহজে জাগে এবং সে আবেগের কথা বলতে গিয়ে তাকে প্রথাসিদ্ধ শিল্পসমালোচক সাজতে হয় না। বাঙালী শিল্পীর রচনা এক হিসাবে এ দেশের নবজাগরণে, যাকে বলে জাতীয় রেনেসান্স-এ সক্রিয়তার একটি দিক। যে সাধারণ্যে রুচি মূর্তি নিচ্ছে, সেই জনরুচির মানেই তাই এক্ষেত্রে কান্তি-বিদ্যার মানদণ্ড প্রয়োগ সম্ভব। ভাষাবহ শিল্পেও অবশ্য ছন্দের প্রাথমিক অঙ্গীকার আছে, এবং ছন্দ মূলত শুদ্ধ সন্দেহ নেই, নৃত্যের শারীরিকতা ও সামাজিকতাতেই ছন্দের বংশনির্দেশ। কিন্তু বংশপরিচয়ে পুরুষার্থ সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রাথমিক ছন্দের প্রত্যক্ষ আবেগ আমরা দীর্ঘকাল হল হারিয়েছি সভ্যতার প্রগতির অনিবার্য কারণে, যেমন শ্রুতির মিথ্ বদলেছে স্মৃতির পুরাণে, প্রতীক বদলেছে ব্যক্তিগত কল্পপ্রতিমায়। ভাষার বহুধাব্যবহার ও সামাজিক ক্রমচ্ছেদের গতি সভ্যতার সঙ্গে সমানতালেই চলেছে। কিন্তু একদিকে সঙ্গীত আর অন্যদিকে দৃশ্যশিল্পে এখনও বিভিন্ন আবেদনের পরিচ্ছন্নতা খানিকটা বর্তমান। রং এখনও কৃষি বা যন্ত্র বা মসীজীবীর জীবনবোধের বৃদ্ধি সাধন করে, রূপাকার এখনও আমাদের স্পর্শাবেগে সম্পূর্ণতা আনে, শেষ পর্যন্ত আমাদের পেশলত্বের তারে মোচড় দেয়।

এই আবেগে ধরা দেয় বস্তুর অধরাসত্তা, শিল্পীর চৈতন্যে এবং শিল্পের মাধ্যমে চারিয়ে রূপান্তরে। শিল্পীমানসের আর্তিতে, তাঁর প্রকাশের তাগিদের বিচারেই তাঁর বাস্তবউপলব্ধির সততার বিচার। আমাদের শিল্পরেনেসান্সের ইতিহাস এ বিচার ছাড়া বোধ্য নয়। এ বিচারেই অবনীন্দ্রনাথের সূত্রপাত ঐতিহাসিক সার্থকতা পায়, এ বিচারেই সেই ধারা পরিণতি পায় যামিনী রায়ের পাকা তুলিতে এবং তারই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখতে পাই তরুণ শিল্পীদের কাজে, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, রথীন্দ্র মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল, চিত্তপ্রসাদ, তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের শিল্পচেষ্টায়।

প্রথমেই নমস্য তাই অবনীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর গভীর শিল্পস্বভাবে আর সেই শুদ্ধ কারণে বাংলার লৌকিকজীবনের সঙ্গে দুর্মর সাযুজ্যে বুঝেছিলেন কোথায় বাংলার নবজাগরণের উৎস। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব, সমাজসংস্কার, ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন ইত্যাদি যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য নয়, সে বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথই প্রথমে আমাদের সচেতন করেন, পাল্টা গোঁড়ামির বাঁধি গতে নয়, সৃষ্টিময় শিল্পচৈতন্যেরই সার্থক এষণায়।

এ কাজে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী হ্যাভেলের ভাষায় পথনির্দেশ এই :

'Present methods of education have opened a rift between the artistic castes and the 'educated' such as never existed in any previous time in Indian history. The remedy lies, not in making Indian artists more literate in the European sense...nor in manufacturing regulation pattern books but in making the literate, educators and educated conscious of the deficiences of their own education...'

সম্প্রতি ইংরেজ সমালোচক এলিক্ ওয়েস্ট এক প্রবন্ধে (মডার্ন কোয়ার্টারলি —মার্ক্সিস্‌ম ও কালচার) ভারতবর্ষে এখনো অবশিষ্ট এই লোকশিল্পের স্থান আলোচনায় প্রায় এই প্রশ্নই তুলেছেন, তিনিও মনে করেন যে আমাদের শিল্প-ভবিষ্যৎ খানিকটা স্বচ্ছ, কারণ ঐ তথাকথিত য়ুরোপীয় শিক্ষার যে অ্যাকাডেমিক বা মাছিমারা বস্তুতান্ত্রিকতার বন্ধন সেটা এখনও আমাদের জনসাধারণের রুচি একেবারে নষ্ট করেনি। কথাটা পুরানো বা নতুন কোনো রেগুলেশন কপিবুক তৈরি ও চালু করার আগে সবার পক্ষে, মার্ক্সিস্টেরও পক্ষে স্মর্তব্য। বলাই বাহুল্য, ভবিষ্যৎ রচনা সহজ ব্যাপার নয়। কারণ ঐ হ্যাভেলোক্ত 'শিক্ষিত' ও ইংরেজিহীন শিল্পকর্তা জনসাধারণের মধ্যে ভেদটা নগণ্য নয়, এমন কি চিত্র বা গঠনমূলক শিল্পাদিতেও, যদিও ভেদটা সাহিত্যেই বেশি প্রকট ভাষাগত কারণে। ভেদের জোড় লাগবে অবশ্যই বৃহত্তর সমাধানে, নিছক শিল্পক্ষেত্রেই যে চেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকবে না। হ্যাভেল তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতির অগাধ জ্ঞান ও শ্রদ্ধা নিয়েও একথা ঠিক বোঝেন নি, যদিও মার্কসের ভারতীয় পত্রাবলীতে এর নিশানা মেলে। হ্যাভেল তাই সামাজিক জীবনের সমগ্রতার ঘোড়ার মুখে জুততে চান শিক্ষার আংশিক সমাধানের গরুর গাড়ি।

কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের দান কতোখানি হতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনের নবজাগরণে সে বিষয়ে হ্যাভেল প্রায় এলিক ওয়েস্টের মতোই দৃষ্টিবান—

'...behind all this intellectual and administrative chaos there remains in India a native living tradition of art, deep-rooted in the ancient culture of Hinduism, richer and more full of strength than all the eclectic learning of the modern academies and artguilds of Europe...'

এর থেকে যদি ঐতিহ্যধারায় মানুষ অনাত্মচেতন কারুশিল্পী, অভ্যাসিক যাঁর কর্মপদ্ধতি এবং যাঁর স্থিতীয় মন বিশেষ কিছু স্বীয় কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না তাঁর সঙ্গে, যে শিল্পীর কাজ মোটামুটি তাঁর মানসের সমগ্রতায় সচেতন কর্ম, সে শিল্পীকে এক করে ফেলি তাহলে আজ সেটা মারাত্মক ভুল, প্রতিক্রিয়াশীলতা বা অতীতসর্বস্বতারই নামান্তর। তার অর্থ এ নয় যে আমাদের লোকশিল্প যে বছরে বছরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা শিল্পীরা ভিক্ষায় বা অকাজে নামবেন, সে বিষয়ে কিছু কর্তব্য নেই। কিন্তু অতীতকে

জীয়ানো যায় না, ইতিহাসকে এড়িয়ে কিছু শৌখিন বাড়ি সাজানোর জিনিস হয়তো পাওয়া যায়, আর্টিস্ট পাওয়া যায় না। ঐতিহ্যগত লোকশিল্পে শিল্পীর কোনো বিকাশ বা বিবর্তন নেই।

আসলে হ্যাভেলও কার্যত তা জানতেন, নাহলে তিনি কি করে অবনীন্দ্রনাথের সাহায্যে শিল্পশিক্ষার সরকারী স্কুল চালালেন শিল্পীর সম্ভাবনা ভেবেই, প্রথাসিদ্ধ তথাকথিত ভারতীয় কারুশিল্পী তৈরি করতে নয়।

শিল্প ও কারুকারের ঐক্যসাধনের প্রশ্ন এখানে উঠছে না, যদিচ উভয়ের সুস্থ সম্বন্ধপাত এবং একই ব্যক্তির মধ্যে শিল্পী ও কারুকারের ঐক্য একান্ত প্রয়োজনীয়। আধুনিক শিল্পের কিছুটা নিরক্ততা, কিছুটা টেকনিকগত দুর্বলতা নিশ্চয়ই এই ঐক্যের অভাবে। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে আজ সজ্ঞান নির্বাচন অনিবার্য। আমাদের এই প্রাচীন চিরাচরিত মহাদেশেও জীবনের রূপ বদলেছে এবং এই প্রতিযোগিতার যুগে পণ্যের যুগে মানুষ তার মানসকর্মে বৃত্তিনির্ভর ধারাবাহিক স্বাক্ষরহীনতা হারিয়েছে, যেমন শক্তি লাভ করেছে ব্যক্তিস্বরূপের সাধারণ ঐশ্বর্যে, আত্মচেতনায়, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের নির্বিশেষ ক্ষমতায়—সর্বদা না হলেও অন্ততঃ নির্বাচনের সম্ভাবনায়। অবনীন্দ্রনাথ সে নির্বাচন করেছিলেন, তিনি য়ুরোপীয় যাথার্থ্যমার্গে ওস্তাদ হতে পারতেন, বড়ো প্রতিচিত্রকর হতে পারতেন, মহত্তর রবিবর্মা হতে তো পারতেনই। কিন্তু তিনি স্পষ্টই হলেন ভারতীয় শিল্পের রেনেসান্সের নেতা।

এটা প্রাদেশিকতা নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির জগতে প্রায় অপাংক্তেয় বাংলায় যে কেন ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কারবার পাতল, তার কারণ অবশ্যই কোনো জাতি-তত্ত্বে খোঁজবার দরকার নেই। সূত্রপাতে এবং সাংস্কৃতিক পক্ষপাতে অনার্য, ব্রহ্মণ্যের সবচেয়ে দুর্বল ঘাঁটি, দিল্লী থেকে বারাণসী কাঞ্চী থেকে দূরে বাংলার কিন্তু ছিল স্বকীয় সমস্যা ও সমাধান চেষ্টা—জীবনেরই মতো, লৌকিক শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। এবং বাংলাতেই গজাল ও বিকাশ পেল প্রথম ভারতীয় মধ্যবিত্ত, চাকুরিয়া, নব্যশিক্ষিত, সংস্কারক, প্রতিসংস্কারক, ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব থেকে জাতীয় ভারতের স্বপ্নের রাত অবধি।

অবনীন্দ্রনাথের সত্তার শিকড় এই বাংলার আদিম গভীরে। অবশ্যই তিনি নবাবী আমেজ পেয়েছিলেন, ব্রিটিশপূর্ব ও প্রাক্-ব্রিটিশ দরবারী সংস্কৃতি তাঁরও স্মৃতিতে সঞ্চারিত এবং মুঘল তস্‌বিরের বিলাসী সৌকুমার্য, রাজপুত চিত্রের গীতায়িত আবেগ, জাপানী-ছবির সূক্ষ্ম পেলবতা ও ওয়াশ্ টেকনিক তাই তাঁর আয়ত্তে এল অতো সহজে।

কিন্তু এও বাহ্য। প্রথম উৎসাহে এবং খানিকটা তখনকার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের দরুন তাঁর হ্যাভেল কুমারস্বামী প্রভৃতি বন্ধু ও ভক্তরা এবং ছাত্রেরা অবনীন্দ্রনাথের স্বভাব ও কাজের আরেক দিক, স্থায়ীতর দিকটা গৌণ ভাবেন। তাঁর প্রতিভার সেদিক দেখি তাঁর বাংলার নিসর্গদৃশ্যমালায়, চণ্ডী কৃষ্ণলীলার চিত্রে, ঠাকুমা, শিশু ইত্যাদি ঘরোয়া ছবিতে। তাঁর প্রতিভার এই দিক থেকেই তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠতম লেখকও বটে। তাঁর গল্পের বইতে, তাঁর মজাদার নাটকে, ছড়ায় অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে গ্রামীন বাংলার সংস্কৃতি তাঁর স্বরূপ খুঁজে পায়। আমাদের ছড়া, গান, কথকতা, রূপকথা, মেয়েলি ব্রতে বাংলার প্রত্যক্ষ নিসর্গে তাঁর প্রতিভা ক্ষীরের পুতুল গড়ে, হাঁসের ঝাঁকে

বাংলাময় ওড়ে, কুঁকড়োর গানে জাগে আমাদের অজাতমৃতমূর্খপ্রায় সংস্কৃতি-তত্ত্বে ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় তাঁর বাংলার ব্রত প্রাথমিক বই। গমনাগমন-এর শিল্পপ্রতিভা শুধু রচনায় নয়, শিল্প-বিচারের অন্তর্দৃষ্টিতেও অসামান্য। আমাদের নদীমাতৃক মাটির যে সংস্কৃতেতর লৌকিক সরস প্রত্যক্ষধর্মী মানবিক সংস্কৃতি, দ্বারকাঠাকুরের গলির পাঁচ নম্বরের শৈশবার্জিত তার জ্ঞান ও জীবনবোধই তাঁর মুখ্য দান, যার স্বীকৃতি ভবিষ্যতে বিস্তৃত।

নিজবাসভূমে পরবাসী সে যুগে অবনীন্দ্রনাথের এই আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ নির্ণয় অর্থাৎ নবজাগ্রত আন্দোলনের ঐতিহাসিক মর্যাদা কতোখানি তা বোঝা যায় চিত্রের মাধ্যমের বাইরে এই আন্দোলনের খতিয়ানে বিশেষ করে ভাষাবহ কর্মক্ষেত্রে, যথা সাহিত্যে। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাবেই বোধহয় আজও ভারতীয় ইতিহাস সংস্কৃতির বিচারে এই ব্রহ্মণ্যহীন লোকায়ত পক্ষপাত প্রায় দুর্লভ—একদিক থেকে রাহুল সাংকৃত্যায়ণ এবং ক্ষিতিমোহন সেনের কোনো কোনো লেখা ছাড়া। এ তির্যক ইংরেজপক্ষপাতের জন্যেই বোধহয় সাহিত্যবাদী সাহিত্যিকও আপন অজ্ঞাতে অবনীন্দ্রনাথের ভাষারচনার অসামান্য সাহিত্যমূল্য—কি শিল্পমর্যাদায় কি বৈচিত্র্যে, নির্ধারণে দুর্দান্তরকম কার্পণ্য করেন। শিল্পবিচার বা কান্তিবিদ্যার চর্চাতেও অবনীন্দ্রনাথের লেখা সংখ্যায় বা গৌরবে কম নয়।

অথচ ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়, কারণ এ স্বীকৃতির সঙ্গে জড়িত যে শুধু মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, দীনবন্ধু, এমনকি তারাশঙ্করের বিচার কিম্বা পট বা পাটার আলোচনা তা নয়, এরই সঙ্গে জড়িত আমাদের ইতিহাসের পাঠোদ্ধার, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের রূপায়ণ। রামমোহনের দেশ, বঙ্কিমের দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ আরো অনেকেরই তো দেশ, তাছাড়া তার অতীত বাদ দিয়ে কি শুধু উকিল মোক্তারে মাস্টারে কেরাণীতেই তার বর্তমান নিঃশেষ? তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কি শুধু দিল্লীতেই ফুরিয়ে যায়? এবং যদি ভাবা যায় যে এটা অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাহলে ভুলই হবে। কারণ যদিও অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বহুধা বৈচিত্র্য আরেক দেশের বৃহত্তর ও মৌলিক রেনেসান্সের কথা মনে আনে—দা ভিঞ্চি বা বেলিনির যুগের কথা, তবু তাঁদেরই মতো অবনীন্দ্রনাথও তাঁর কালেরই মানুষ, অর্থাৎ একা নন।

গগনেন্দ্রনাথের মধ্যেও বাংলার জীবন ও জনসংস্কৃতির সঙ্গে এই যোগাযোগেরই আরেক প্রকাশ। ভারতীতে এবং বিশেষ করে "জীবনস্মৃতি"র সহজ কিন্তু মনোরম ব্যঞ্জনাময় চিত্রাবলীতেই তাঁর বিলম্বিত আত্মপ্রকাশ। তারপরে বৈষ্ণব ভাবধারায় তাঁর ঐশ্বর্য বিস্তারের অধ্যায়। কিন্তু সে অধ্যায়েই তাঁর হাত ক্ষান্তি মানেনি, এল প্রখর সমাজবেদনাহত ব্যঙ্গচিত্রাবলী এবং যেন একজন শিল্পীর পক্ষে এই যথেষ্ট কীর্তি নয়, গগনেন্দ্রনাথ শুরু করলেন তাঁর তথাকথিত ঘনকাট্য যুগ, ভাস্বর কোণমিতির সাক্ষাৎ কাব্য। আর্টিস্ট যে কি সম্পূর্ণতায় স্বকীয় সীমাবদ্ধতার সদ্ব্যবহার করতে পারেন, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রাবলী তার আশ্চর্য উদাহরণ।

তারপরে আরেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথ যখন দুহাতে দিলেন উড়িয়ে নব্যভারতীয় ভাববিলাস আর অ্যাকাডেমির যথাযথবাদের দাবি। আমাদের কালের সবচেয়ে প্রচন্ড মনের উলঙ্গ স্বপ্ন, অফুরন্ত কল্পনা রেখার

রঙের অজস্র কিন্তু নিশ্চিত ছন্দে ভাসিয়ে দিলে অশিক্ষিতপটুত্বের পুঁথিগত দ্বিধা, যেমন ভেঙে দিলে রবীন্দ্রনাথেরই বিরাট সাহিত্যকীর্তিলালিত তাঁর শুচিবায়ুগ্রস্ততার, শালীননীতির পুরাণ।

আরেকজন মহৎ শিল্পীর কাজেও এই দ্বৈততার আভাস দেখা যায়, নন্দলাল বসুর বিরাট চিত্রকর্মে। নন্দলালের রূপায়ণে অন্তহীন নবনব বিকাশ, তাঁর নানা রীতির অন্বেষা যে কোনো শিল্পগোষ্ঠীর গর্বের বিষয়। দীর্ঘ কীর্তির পটে আজও তাঁর কল্পনার সাবেক ঐশ্বর্য কমেনি, অধিকন্তু এই কথাই বলা উচিত যে তাঁর মানস সম্পদের প্রাচুর্যই তাঁকে তাঁর রেখার ও রঙের অমিত ঐশ্বর্যের সাততলা মহলে বারবার নিয়ে যায় রূপের শুদ্ধ মাটি থেকে। নন্দলালের পোস্টারচিত্রে অবশ্য লোকশিল্পের ব্যবহার দ্রষ্টব্য, যেমন তাঁর বাংলার গ্রাম্য-জীবন ও নিসর্গের অজস্র চিত্রাবলীতেও তা দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে আমাদের নতুন শিল্পান্দোলনে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে প্রদোষ দাসগুপ্তের মতো শিল্পী থাকা সত্ত্বেও চিত্রের অনুরূপ কিছুই বিশেষ কাজ হয়নি। স্থাপত্য তো বটেই এমনকি ভাস্কর্যের প্রসারে সামাজিক সমর্থন আশু প্রয়োজন। আমাদের জীবনযাত্রায়. জীবনের প্রত্যেক স্বচ্ছ উপভোগে কোথায় সে সমর্থন ? সে অভাবেই বোধহয় চিত্রকলাতেও এতো মৌল রূপ-ভাবনায় শৈথিল্য, কোনো ব্যক্তিগত ত্রুটির চেয়ে বেশি এই ঐতিহাসিক কারণেই।

এইদিক থেকেই যামিনী রায় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁর মধ্যে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, তাঁর বন্ধু নন্দলালের সাধ সম্পূর্ণ। তাঁর কাজে আমাদের শিল্প রেনেসান্সের পটে বাংলার স্বকীয় সমগ্রতালাভ। এদিকে তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ অ্যাকাডেমিক বা বস্তুতান্ত্রিক রীতির পাকা চিত্রকর, অসামান্য রেখাশিল্পী, আবার বাংলার লোকমানসে ও শিল্পে তাঁর গভীর সাযুজ্য। তাঁর প্রথম যুগের অনলস কঠিন সিদ্ধির মধ্যে তাঁর যে শিল্পমানসের বিপ্লব এল, তার দীর্ঘ ও বিস্ময়কর বিবর্তনের ইতিহাসে, গ্রহণে ও বিচারেই আমাদের শিল্পের ভাবী সম্ভাবনা।

৩

যামিনী রায়

যামিনী রায়ের চিত্রাবলী এতই চিত্রগুণে শুদ্ধ, যে তাঁর বিষয়ে ভাষায় লেখা সক্ষম হলেও খানিকটা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সচরাচর এই চিত্রগুণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আক্রমণে কাবু দেখা যায়। তাই আমরা গল্প না পেলে চিত্রকে দুর্বোধ্য তো বলিই, তার সামাজিক সত্তাও দেখতে পাই না। মাতিসের মতো যামিনী রায়ের দীর্ঘ চিত্রসাধনার বিষয়ে একথা বিশেষভাবে সত্য। ফলে আমরা হয়তো তাঁর বিশেষ দু'একটি ধরনের ছবি পছন্দ করতে পারি, কিন্তু তাঁর কীর্তির সামগ্রিক উৎকর্ষ উপলব্ধি আমাদের বোধের বাইরে থেকে যায়।

কারণ মাতিসের সঙ্গেই তাঁর শিল্পস্বভাবের কিছুটা তুলনা সম্ভব হলেও, এক হিসাবে তাঁর বিকাশের বহুবিধ ঐশ্বর্যের তুলনা মেলে খানিকটা পিকাসোরই সঙ্গে, যদিচ পিকাসোর বুদ্ধিখর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদীর অস্থির কৌতূহল বা পিকাসোর মায়ামমতাহীন গড়ে ভাঙা ও ভেঙে গড়া এক স্বতন্ত্র শিল্পস্বভাবের ইতিহাস।

চৌষট্টি বছর আগে বাঁকুড়ার এক অন্তর্বর্তী গ্রামে তাঁর জন্ম। লোক-সংস্কৃতির অবশেষে ও অপেক্ষাকৃত আঞ্চলিক সচ্ছলতার মধ্যে বেলেতোড় গ্রামে তাঁর শৈশব তাঁর জীবনের বিকাশে নিরর্থক নয়। শিল্পের প্রাণ সন্ধান এবং সামাজিক জীবনের আত্মসম্পূর্ণতার স্বপ্ন তাঁর এই গ্রামীন পটভূমিতেই আরম্ভ। এরই স্মৃতি তাঁকে ভুলতে দেয়নি কলকাতার নকল বুর্জোয়া জগতের পশ্চিমা প্রাকৃতবাদী শিল্পমার্গের অসারতা। তাঁর নিজের হাতের অসামান্য সাফল্য সত্ত্বেও। কারণ য়ুরোপের প্রথাসিদ্ধ শিল্পরীতিতে যামিনী রায়ের কৃতিত্ব য়ুরোপের বাইরে অভূতপূর্ব। অবশ্য এই য়ুরোপীয় রীতির যুগে তাঁর বিস্তৃত কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী সাধনার প্রাণপ্রতিষ্ঠার কাজে লেগেছে, বিশেষ করে দেশের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দেহ ও মুখের টাইপের জ্ঞান তাঁর তুলিতে মজ্জাগত হয়ে গেল এই পোর্ট্রেটের যুগেই। এবং রেখাসংক্ষেপের দখলও এসে গেল এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

সুনাম ও পসারের মধ্যে যামিনী রায়ের মানসিক যন্ত্রণা মোড় নিলে, সন্ধিক্ষণের বিপ্লবী দিকে, ব্যক্তিগত স্টাইল বা রীতির সামাজিক শিকড়ের অন্বেষায়। প্রথমত রূপান্তরের তাগিদ তাঁর এল তাঁর তৎকালীন শিল্পসাফল্য এবং তাঁর দর্শক-ক্রেতা বাবুসমাজের সম্বন্ধের মধ্যে মানসিক অসারতা বা উভয়ত প্রাণবন্ত শিল্পপ্রেরণার অভাব উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয়ত তিনি দেখলেন যে ঐ পূর্বোক্ত কারণেই আমাদের জেবলী বা উন্মূল শিক্ষিত শ্রেণীর

সংস্কৃতিতে য়ুরোপের ওস্তাদের ঐতিহ্য চালান করা ব্যর্থ চেষ্টা। তাছাড়া এদেশের কড়া রৌদ্রের আলোয় ছায়াবর্ণাঢ্য প্রথাসিদ্ধ তৈলাঙ্কনের অর্থহীনতাও তাঁর কাছে স্পষ্ট হল।

তখন থেকে তাঁর তপশ্চর্যা, সারল্যের অভিযানে অবিশ্রাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রথমদিকেই তাঁর সাফল্য দেখা যায়—বহুর মধ্যে একটি ধরনের উদাহরণই নেওয়া যাক, তাঁর সাঁওতাল মেয়েদের বা পুরুষদের মনোরম ছবিগুলি, কিম্বা কৃশ বাংলার মা, বাহুতে ছেলে। যামিনী রায় তখনও তেল রং ব্যবহার করেন, কিন্তু লঘু মসৃণ টানে। এ সময়েই দেখা যায় তাঁর ছবিতে রংগুলির পারস্পরিক সমান চাপের দিকে একটা ঝোঁক। দেখা যায় আকারগত এবং রেখাগত শুদ্ধতা এবং রঙের একটা ভাবব্যঞ্জক গঠনমূলক ব্যবহার।

অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য চিত্রকর হয় আকারের ভাস্কর্যমূলক সমস্যায় কম-বেশি ভাবিত থাকেন (সেজান্ থেকে পিকাসোর অনেক কাজ অবধি) নয়তো রঙের লিপিমূলক ঐশ্বর্যবিস্তারে ঝোঁক দেন (ইম্প্রেশনিষ্ট থেকে মাতিসের অনেক কাজ অবধি)। যামিনী রায় চিত্রের গঠনময়তা আর ভাস্কর্যে কঠিন স্পর্শসহতা কখনও এক ভাবেননি. আবার বর্ণাঢ্য রেখার স্পষ্টতাও তিনি কখনও হারাননি বর্ণের বিলাসে। ভারতবর্ষের শিল্পের ঐতিহ্যে তিনি দরবারী মিনিয়েচর্ রীতিবিলাসকে কোনোদিনই মূলধারা ভাবেননি।

তিনি খুঁজেছিলেন মৌলিক আকারের ও সমবর্তী রঙের উজ্জ্বল রূপায়ণ এবং তা তিনি স্বচক্ষে দেখলেন বাংলার পুতুলের চৈত্যরূপের নিশ্চিত ঋজুতায়, তাঁর ঘরের ও সর্বদেশের শিশুদের শুদ্ধ ভাবগঠনের দৃষ্টিতে, আদিম বর্ণপংক্তির রঙীন শক্তিতে। তাই তাঁর পরীক্ষা চলল আমাদের চোখের প্রাথমিক অন্তরস্থ জালিধূসরের সারল্যে; যে ধূসর, চোখ খুললেই রূপের কাঠামোতে হয়ে পড়ে আকাশের অনন্ত নীলিমা। এই ধরনের ছবিগুলি আঁকা তুলির একটানে, ধূসর পটভূমিতে, ভূসোরঙে; যামিনী রায়ের চোখের এবং কব্জির ধ্রুব নিশ্চিত শক্তিতে এই সব ছবিতে আসে বিষয়বস্তুর গঠনবেদ্যতা—তা সে মা হোক বা শিশু হোক বা বৃদ্ধ মানুষ বা হরিণ বা বাংলার বিধবা মেয়ে। এবং সেটা আসে পরিপ্রেক্ষিতের স্তরবিন্যাসে নয়, আসে শুধু অধরা ধূসরের পটে কৃষ্ণ রেখার ধৃতসীমার সবল টানের চাক্ষুষ ব্যাপ্তিতে। এই সব রেখাশরীরের দেহভার হয়তো যাঁরা শুধু পারসীক মিনিয়েচর দেখে কাটান বা তথাকথিত নব্য-ভারতীয় ছবির ভক্ত তাঁদের চোখ এড়িয়ে যাবে, যেমন যাবে তাঁদের কাছে যাঁরা শুধু ক্যামেরার চড়া ছায়াতপে অভ্যস্ত. যে কড়া শাদা-কালোর তুলনাবৃত্তিতে চোখ খোলার মুহূর্তে মানবচক্ষুর পক্ষপাতহীন ধূসরিমার কোনো স্থান নেই।

যামিনী রায়ের প্রতিভা অবশ্য এই সিদ্ধিতে বিরাম মানেনি। যাঁরা তাঁর তুলির অবিরাম রেখার সঙ্গে কালীঘাটের জের-টানা রেখার তুলনা করে সন্তোষ পান যেন তাঁদেরই অধিকতর হতভম্ব করতে তিনি শেষ করলেন বিরাট দেয়াল-চিত্রের একটি গোটা সারি। রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলার কঠিন মাধুরীতে এই চিত্রমালার চৈত্যপ্রমাণ মূর্তিগুলিতে এক নতুন সৌন্দর্যের উন্মেষ। বলাই বাহুল্য, যে-কোনো গুণী শিল্পীর মতো যামিনী রায় সর্বদাই পাঠ নিতে প্রস্তুত, এবং বাংলার পট বা পাটা, রেমব্রাণ্ট বা ভানগঘ কিছুই তিনি তুচ্ছ

করেননি। কিন্তু তিনি চূড়ান্তভাবে নির্বাচনক্ষম সজ্ঞান শিল্পী এবং তাঁর রুচি ক্ষণকালের জন্যও তাঁর তুলিকে ছাড়েনি, অন্যপক্ষে লোকশিল্পীরা প্রায় অভ্যাসিক কারিগর এবং সুরুচির সমান মাত্রা সচেতনতা ছাড়া না থাকাই স্বাভাবিক। এই বড়ো বড়ো ছবিগুলিতে চৈত্যমাত্রিক বলিষ্ঠ আকার যেমন মুখ্য তেমনি এদের আলঙ্কারিক সৌষ্ঠবও অবিচ্ছেদ্য। এই সার্থকতা সম্ভব শিল্পীর হাতের অসামান্য দক্ষতায়, তাঁর চিত্তের একাগ্র অনুসন্ধিৎসায় এবং একান্ত শিল্পীদায়িত্ব-বোধে আর দেশের লোকের ভালোবাসার উৎসে নিজের ব্যক্তিগত ভালোবাসাকে ডোবাতে পারলেই। এই ছবিগুলিতে ঘনতা পটসন্ততিতে বা স্থানযোজনায় এমনভাবে বিন্যস্ত যে শিল্পীর গঠন-সুনম্যতার কর্তৃত্ব আপাত-দৃষ্টিতেও স্পষ্ট অথচ তাঁর মূর্তিগুলি বা চিত্রদেহগুলি চিত্রগতই, ভাস্কর্যগত নয় এবং এ ভেদেই তাঁর শিল্পসিদ্ধির আরেক প্রমাণ।

কিন্তু যামিনী রায় এখানেও থামেননি। যেন রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলার পরিচিত রসাভাসে পাছে তাঁর পরীক্ষা বহির্মুখ থেকে যায়—আসলে অবশ্য এ পরীক্ষা তাঁর মানসের গভীর আবেগবহ দ্বন্দ্বময় প্রেরণাই—তাই শুদ্ধির খোঁজে তিনি খুঁজলেন পুরাণের বাইরে, তৈরি অনুষঙ্গের বাইরে তাঁর চিত্রের উপজীব্য। বাউরী, সাঁওতাল, সাধারণ চাষী, সাধারণ জীবনযাত্রারত মেয়ে-পুরুষ এরা হল তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু। শুদ্ধ চিত্র সাধনায় তারা অবশ্যই নির্বিশেষ, সাধারণ, কিন্তু তবু তারা টাইপ, প্রতিভূ মানুষ সব। তাঁদের মুখ ভিন্ন, শরীর ভিন্ন, ভঙ্গী ভিন্ন এবং বাঙালীর কাছে তারা চেনা, আত্মীয়। তাই তারা মনকে এত নাড়া দিয়ে যায়, শুদ্ধ ছবির বেষ্টনীতে প্রত্যক্ষ জীবনের রসাভাসে—মহৎ শিল্পের আপাতবৈপরীত্যগুণে খণ্ডিত সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধের শিল্পগত ডায়ালেক্‌টিকে। বুর্জোয়া স্বার্থে য়ুরোপের শিল্পে যে মানুষে মানুষে ভেদের উপরেই ঝোঁক পড়েছিল গত কয়েকশত বছর ধরে, সে ঝোঁক তিনি শুধু নেতিতে ভাঙেননি, ভারতবর্ষের বিশেষ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের কিছুটা সাহায্যে তাঁর সমাধান শ্রেণী-উত্তীর্ণ না হলেও কিছুটা আস্তিকও বটে।

শিল্পের সীমা যামিনী রায় সর্বদাই মানেন, সেইখানেই তাঁর শিল্পসাধনার মুক্তি। আধুনিক পশ্চিমা শিল্পবিদ্রোহীদের কথা তিনি প্লেটোর মতোই মানেন—জ্যামিতির আকারে, ঘন, গোলনলিকা ও উপবৃত্তই হচ্ছে প্রাথমিক রূপাকার। তবে, তারপরে, তিনি বলবেন যে শিল্প কিন্তু প্রাথমিক রূপাকার নয়, অন্তত মানুষের কাছে। মানুষের কাছে শিল্প প্রত্যক্ষ বাস্তবজীবনের রসায়িত আকারের রূপায়ণ, দর্শনের বা স্মৃতির দৃশ্যের রূপান্তর বা নির্মাণ—অর্থাৎ মানবিক, সামাজিক। তিনি তাঁর বিষয়বস্তুর মৌলিক বস্তুপরিচয় অস্বীকার করেন না। পাবলো পিকাসোর মননী নেতিবাদ বা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসায় সব সম্বন্ধপাত ভেঙে যায়। পশ্চিম য়ুরোপের বুর্জোয়া বিকাশের অন্তিম ক্ষণে সেটাই সঙ্গত, পুনর্নির্মাণের, পুনঃপ্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে। এদেশে বুর্জোয়া যুগ আরম্ভে অপ্রকৃত ও বিকাশে অসম্পূর্ণ। গ্লানি তাই বিস্তর, পুনর্নির্মাণে লাভ শুধু দ্রুতমুমূর্ষু লোকসংস্কৃতির বিড়ম্বিত ঐতিহ্যের অবশিষ্ট সুযোগটুকু।

যামিনী রায় সেই ক্ষীণ সুযোগ তাঁর শিল্প-সাধনায় সার্থক করেছেন। আমাদের শিল্পীদের মধ্যে য়ুরোপকে চিত্রে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাঁরই সমধিক, এবং তিনিই বুঝেছেন আমাদের দুশো বছরের মধ্যবিত্ত চাকুরিয়া

যুগের প্রচণ্ড অসম্পূর্ণতা। এইখানেই তাঁর ক্ষমতার উৎস এবং হয়তো এই খানেই অসম্পূর্ণতার দোটানায় কিছুটা বা তাঁর অতীতের স্বপ্নাতীত ও তাঁর ইউটোপিয়া। নিজের সাধনার একক ও প্রবল তীব্রতায় তিনি হয়তো ক্লাইভ হেস্টিংস ডালহৌসি থেকে কংগ্রেস অবধি, রামমোহন থেকে বাংলার প্রগতিতাত্ত্বিক অবধি যে নববাবুবিলাস তাকে একটু বেশি অস্বীকার করেছেন, ভাঙা সেতুর প্রশ্নটা বড়ো করেননি, মানেননি ঐতিহাসিক প্রয়োজন হিসাবে। বেলিন্‌স্কি একবার বলেছিলেন যে রুশ মহাকবি পুশকিন অর্ধেকটা জাতীয় কবি। কথাটা তখন সত্যই ছিল, আজকেই শুধু দেশের মানুষের সামগ্রিকতায় জাতির অখণ্ডতায় রুশদেশের সেই পুশকিনকেই বলা যায় জাতীয় কবি। রুশ বুর্জোয়ার তুলনায় বাংলার অসম্পূর্ণ বুর্জোয়া আরও বিচ্ছিন্ন, তাই রবীন্দ্রনাথের বিরাট সার্বভৌমত্ব আজো ইতিহাসের ভবিষ্যতে নিহিত, কর্মের ভাবী সিদ্ধির পটে সম্ভাবনায়। রুশদেশে রোমাণ্টিক বিদ্রোহী পুশকিনের চেয়েও কথাটা মাউন্টব্যাটেনপ্যাটেল যুগে এখানে আমাদের পক্ষে আরো কঠিনভাবে সত্য—রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক বিদ্রোহী যদিচ আস্তিক প্রতিভার অসামান্য ব্যাপ্তি সত্ত্বেও।

সম্ভবত মহৎ শিল্পীর আবশ্যিক একাগ্রতায় এই সমাধানের জটিলতার প্রশ্নে ঝোঁক কম পড়ে। সে যাই হোক, যামিনী রায়ের এইসব চাষী মজুর বাউল ফকির, লালপাখি হাতে নীল চাষার ছেলে, কামার, লাঠি হাতে বা টোকা মাথায় কৃষক, গৃহস্থ, বৃদ্ধা প্রবীণ ও নবীন, কুমারী ও বিবাহিতা মেয়েরা মায়েরা—এরা সবাই দেশের চেনা মানুষ, যামিনী রায়ের দীর্ঘ পরিচয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষের মমতার শুদ্ধ রূপান্তর। এবং এসব ছবিতে রঙের সেই প্রয়োগ যাতে চোখ পটের উপরে ঘুরে মরে না বস্তুর গোটা রূপের সন্ধানে ভ্রাম্যমাণ যোগবিয়োগে। যামিনী রায় এই সিদ্ধি অর্জেছেন তাঁর বৈচিত্র্যের সীমায়নে এবং বিশেষ করে প্রাণময় রেখাগণ্ডীর মধ্যে রঙগুলির সমলেপ চাপে এবং পারস্পরিক সঙ্গতিতে; তার দ্বারা তাঁর ছবি একটা সামগ্রিক সাযুজ্য লাভ করে, এমন একটা সত্তা যা স্পষ্টত ন্যস্ত এবং চাক্ষুষভাবে সাক্ষাৎবোধ্য, সান্ধ্য আলোক ছটায় প্রশান্ত স্বচ্ছ সীমাসংহত একটা সমগ্র নিসর্গদৃশ্যের মতো।

এই একদৃষ্টিভাত রূপ যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ অবশ্যই মূলত তাঁর রীতিবিন্যস্ত রিয়ালিসম্‌ বা বাস্তবিকতা, যা তিনি অর্জন করেছেন প্রাকৃতবাদের বা সাংবাদিকতার বিসর্জনে, সম্ভব হয়েছে কারণ তাঁর ছবিতে প্রতি অংশ প্রাণ পায় প্রতি অংশের সঙ্গে প্রতিসংস্থানে, মামুলী চিত্রের ভারসাম্যের বা বাদপ্রতিবাদের জ্যামিতিক বা যান্ত্রিক কৌশলের রসাভাসে ততোটা নয় যতোটা সমগ্রোৎসারী সক্রিয় অঙ্গাঙ্গিতায়, রঙেরই স্বকীয় গুণের সচল সম্বন্ধপাতে, যা তাঁর অনবদ্য রেখাকর্তৃত্বের সঙ্গে হাতবাঁধা।

প্রাচ্যশিল্পে এই রং ব্যবহার খুব প্রচলিত রীতি নয়। ভারতীয় চিত্রে এ আমরা কদাচিৎ দেখি, কিছুটা হয়তো বাশোলীচিত্রে এবং কিছুটা অজন্তায়। কিন্তু অজন্তা ভারতশিল্পে একটা দুর্লভ এবং অসাধারণ কীর্তি; অজন্তা, বলা যায়, স্থাপত্যচিত্র। তাছাড়া অজন্তায় পাওয়া যায় তার পরিমাণ বা আকার সত্ত্বেও মধ্যযুগের পুঁথি সচিত্রকরণের গাল্পিক চলমানতা। যামিনী রায়ের ছবি যেন স্থানসন্ততিতে কাটা কাটা ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসা স্নায়ুতে গাঁথা মানুষের

রূপ। তাছাড়া অজন্তার ওস্তাদদের পাথরের গায়ে যে উপরভাসা বর্ণাভাস আনতে হয়েছিল তাও তাঁকে আনতে হয়নি।

যামিনী রায় যে সব নানারকম টেকনিক প্রয়োগ করেন বা তিনি কি ভাবে টেম্পেরা বা তেল রং তৈরি করেন সে সব আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু মনে রাখা দরকার যে আপাত-বর্ণলয়হীন টেম্পেরা রঙে তৈলচিত্রের ভাস্বরতা ও গভীরতা আনবার অপূর্ব নৈপুণ্যে, যাঁরা তাঁর রেলওয়ে লাইনের বা বাগবাজারের গলি বা বাঁকুড়ার বাড়ি বা দক্ষিণেশ্বরের ছবি দেখেছেন তাঁরাই অবাক না হয়ে পারেন না। এবং এ প্রসঙ্গে সচরাচর অবহেলিত জমিতৈরির প্রয়োজনীয় কাজেও তাঁর কৃতিত্ব স্মরণীয়। রঙের ও কাপড়ের বা কাঠের বা বোর্ডের এই বিজ্ঞান তাঁর নখদর্পণে বলেই তাঁর নৈসর্গিক ছবিগুলি এতো আশ্চর্য সুন্দর। তিনি অবশ্য এগুলিকে তাঁর খেলা বা ব্যায়াম মনে করেন, যদিচ যে-কোনো ইংরেজ চিত্রকর এরকম কৃতিত্বে খুশিই হতেন।

এ ছাড়াও যামিনী রায়ের বহু ছবি আছে : গরু, ঘোড়া, হরিণ, বাঘ, হাতি—দীপ্তবর্ণ; শিশুর মতো সরল কিন্তু যে নিশ্চিত সরলতা চরম বিদগ্ধ ও অভিজ্ঞ কলাকুশলীরই আয়ত্তে। তাঁর বাইবেল-পুরাণঘটিত ছবিতে এই কুশলী-পনার সর্বপটীয়সী প্রতিভা স্পষ্ট। খৃষ্টঘটিত এই চিত্রগুলিতে তাঁর বৈষ্ণব চিত্রেরই কারুণ্য ও স্নিগ্ধতা, আবার বাইজানটীয় ও রুশ আইকনের সমতুল্য তীব্র আর্ততিও তাতে মেলে।

বাগবাজারের নোংরা গলিতে তাঁর বাড়িতে যাওয়া একটা আনন্দের উৎসব ছিল। এখন তাঁর ডিহি শ্রীরামপুর লেনের বাড়িতে যাওয়াও আনন্দের ব্যাপার, আমাদের ভবিষ্যতের সুখীজগতের শান্তিময় একটা সপ্তবর্ণ আভাস।

যামিনী রায়ের চিত্রসাধনায় যে শুধু আমাদের শিল্পের মুক্তি, তাই নয়, আমাদের সাধারণ বাংলার মানুষের চোখের আনন্দে তিনি আমাদের মনো-জগৎকেও রূপ দিয়েছেন—দৃশ্যপথে। এবং এই আনন্দ যেহেতু দেশের আনন্দে, মানুষের শান্তিতে প্রসাদে মৃন্ময়; তাই আমরা সবাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

মাতিসের কথায় এই অক্ষম পরিচিতির আরম্ভ, তাই দিয়ে শেষ করি। লুই আরাগঁ বলেছেন, মাতিস হচ্ছেন এ শতকের ফ্রান্সের তথা সুখের বা আনন্দেরই চিত্রকর। এক শতাব্দী ধরে এই আনন্দ নাকি য়ুরোপে একটা নতুন ধারণা। একশো বছরে নাকি এই তারাটি আজ (১৯৪৮) মানব-আকাশে ধ্রুব হয়ে উঠেছে। এবং মাতিসের চিত্রাবলী নিশ্চয়ই এই আনন্দের যুক্তি ও প্রবল সমর্থন। মনে হতে পারে চিত্রিত বা কল্পিত এই আনন্দের ধ্যানে দর্শনে আনন্দের জন্য লড়াই থেকে লোকে নিরুদ্ধ হবে, আরাগঁ কিন্তু তা অস্বীকার করেন। তাই তিনি মাতিসকে মনে করেন সাৎর-মার্কা জ্বরের যম, মনে করেন অতীতের জীর্ণ রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, আজকের আনন্দের কর্মিষ্ঠ মিছিলে মাতিস যেন একটা বিরাট নিশান।

যামিনী রায়ের শান্ত ও রঙিন আনন্দের চিত্রলোক আমাদেরও যেন সেই নিশান নির্দেশে সমৃদ্ধ করে—আমাদের দ্বিধান্বিত অসম্পূর্ণতায়, গৌণতার গ্লানির মধ্যে অপরাজেয়। মাতিস বলেছিলেন, শ্রমকাতর লোককে বিশ্রামের শান্তি দিতে চাই। যামিনী রায় চান ঘরোয়া মানুষকে আনন্দ দিতে। এ আনন্দ শুধু বিশ্রাম নয়, এ প্রতিবাদে ভেঙে গড়ারই প্রেরণা।

৪

বাংলাসাহিত্যের ধারা

বাংলাসাহিত্যের বর্তমান ধারা নির্ণয়ে সাহিত্যের ইতিহাস নগণ্য তো নয়ই, বরঞ্চ প্রথমেই বিবেচ্য। অবশ্য এ বিবেচনা শ্রমসাপেক্ষ এবং সাহিত্য-নিষ্ঠা ও বোধ ছাড়া এ বিবেচনা শুধু পণ্ডশ্রম নয়, ভ্রান্ত নির্দেশেও পরিণত হতে পারে। বিপদ আছে দুই দিকেই। পাণ্ডিত্যের অচলায়তনে উৎস ও মূল্য, বিকাশের সন্ধান ও পুরুষার্থ এক হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে; যার ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শুধু অতীতের অভ্যাসিক দিকটাই গ্রহণে নিঃশেষ হয়ে যায়; তখন চণ্ডীদাস বা কবিকঙ্কণ বা আর কোনো মহাজনকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের চেয়েও উৎকৃষ্ট কবি। আবার অন্যদিকে ভয় থাকে আমাদের বিচ্ছিন্ন, ইংরেজী আমলের মধ্যবিত্ত শিক্ষাদীক্ষার আত্মসর্বস্বতার দরুন উনিশ শতকেই বাংলা সংস্কৃতি তথা বিশ্বসংস্কৃতিরই আরম্ভ ও শেষ কল্পনায়। অথচ সাহিত্যের ধারা আজ জ্ঞানত সত্যই দীর্ঘ সংগ্রাম ও বহুবিস্তৃত যোগাযোগের বিকাশের ধারা। এবং সে ধারায় রবীন্দ্রপ্রতিভার মতো মহৎ কীর্তির বিচার পূর্বাপরহীন নয়, অন্তত সাহিত্যের ইতিহাসের অর্থাৎ তার কর্মঠ বিকাশের আলোচনার স্তরে।

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ তাই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁর বই 'বেঙ্গলি লিটরেচর' যে শুধু পাণ্ডিতী পুস্তকজগতে আশ্চর্যরকম সুপাঠ্য দান, তাই নয়, তাঁর মতো সাহিত্যিক রুচি ও বোধ এবং জ্ঞান আমাদের দেশে দুর্লভ। তদুপরি, তাঁর দৃষ্টি ঐতিহাসিক, সে হিসাবেও তিনি অগ্রগণ্য। অবশ্য দীনেশ সেন মহাশয় অসামান্য উৎসাহে ও শ্রমে যে যুগান্তকারী কাজ করে গেছেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে বা বৃহৎবঙ্গে, তারই পটভূমিতে এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়েছে। ঘোষ মহাশয় এনেছেন তাঁর সরস লেখনী ও সজাগ মনের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের মান বিচার এবং মধ্যযুগ থেকে উনিশ শতকের বিচারে প্রায় মার্কসীয় ঐতিহাসিক চৈতন্য।

তাই তিনি সূত্র খুঁজেছেন নৃতত্ত্বের জ্ঞানব্যবহারে, বাংলার মিশ্রিত আরম্ভে, কোল-দ্রাবিড়-মোঙ্গল-আর্যের তথাকথিত বর্ণসংকরতায়। এ সূত্র আপাত-দৃষ্টিতেও আলোকদান করে, যথা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণ পার্থক্যবিচারে পশ্চিমের দ্রাবিড় মিশ্রণের প্রাধান্য ও পূর্বে মোঙ্গলের প্রভাব বিবেচ্য। বলাই বাহুল্য এ বিচারে আর্য কিছু একটা কালাতীত স্থির সংজ্ঞা নয়, কারণ ভারতবর্ষে আর্য প্রসার ক্রমান্বয়ে অনার্যের সঙ্ঘর্ষে ও সংযোগে আত্তীত ও আত্মসাৎকরণের দীর্ঘ ও নব নব বিন্যাসের ইতিহাস; জ্যোতিষবাবু ঠিকই বলেছেন : বাংলার উপাদান এসেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়তই অনার্য

প্রভাবে; শেষোক্তটি এসেছে অনার্য-আক্রান্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃত থেকে। কথাটা মনে রাখা দরকার, ভাণ্ডারকরের মতো পুরোধা পণ্ডিতব্যক্তিও এই দ্বন্দ্বময় সংযোগের কথা মনে রাখেননি বলেই, অনার্য শিবের হিন্দুসমাজে অভিযানের ব্যাখ্যা খুঁজেছেন শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদের রুদ্রমহাদেবের উল্লেখে, যেন একটি যুগের একটিমাত্র গ্রহণস্বীকারে ও রূপান্তরেই এই অভিযান শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণ-বাসুদেবের ইতিহাস বিচারেও সেকালে এই অসম্পূর্ণতা দ্রষ্টব্য। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় এই অসম্পূর্ণতা অনেকটা দূর করেছেন, আশা করা যায় এবিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞানের সাহায্য আমরা আরো বিস্তৃতভাবে পাব।

আমাদের প্রয়োজন আপাতত সেই বিচার যাতে এই সংঘাত-সংযোগে বহমান ও পরিবর্তমান সাংস্কৃতিক বিন্যাসের ধারার রূপ স্পষ্ট হবে এবং বর্তমানের সাংস্কৃতিক রূপায়ণের চেষ্টায় অপচয়হীন নির্দেশ দেবে। যাতে শুধু ঋগ্‌বেদীয় রুদ্র ও শিবের যোগ নয়, রুদ্রমহাদেবের বাংলার ঘরোয়া মানবিক শিবের গাজনে পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যাবে, স্পষ্ট হবে মথুরা-দ্বারকার বাসুদেবের গৌড়ীয় বৃন্দাবনে রূপান্তর। বাংলার এই লৌকিক আর্তাতির স্রোত কিছুটা ইতিহাসের এবং নৃতত্ত্বেরই বিষয়, কিছুটা হয়তো ধর্মতত্ত্ব এবং কিছুটা সাহিত্যগতও। দ্বিতীয় বিচারের সন্ধানে শশিভূষণ দাশগুপ্তের বাংলার অপজ্ঞাত ধর্মসাধনা বিষয়ে বিরাট বইটি নিশ্চয়ই কার্যকর, কিন্তু তিনিও আচার অনুষ্ঠানের দিকে মন দেননি এবং এ অবহেলার কারণ দেখিয়েছেন সেগুলির আদিবাসী উৎসে। সেদিক দিয়ে বিস্ময়কর কাজ করেছেন এবং সমানে করে যাচ্ছেন ভেরিঅর্‌ এলউইন। এলউইন আর্চর, গ্রিগ্‌সন বা হাইমেন্‌ডর্ফের কাছে আমাদের ভাবী ইতিহাসকার এবং সাংস্কৃতিক কর্মী ঋণস্বীকারে কুণ্ঠিত হবে না। এলউইনদের নিষ্ঠা ও বিরাট কর্মক্ষমতা শুধুই শ্রদ্ধেয় নয়, সাক্ষাৎ সাহায্য করবে, যদি তিনি বা সহকর্মীরা তাঁদের আদিবাসী-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে আমাদের অর্থাৎ সাধারণ ভারতীয়ের কথা মনে রাখেন। আর্য-অনার্য, বর্ণ-বর্ণেতর হিন্দু, আদিবাসী, হিন্দু মুসলিম ইত্যাদি নানা সুবিধাজনক ভাগে সেকালের ইংরেজ আমাদের ভাগ করেছিল। আশা রাখি, সে ভ্রান্তির জের এলউইন বা আর্চর তাঁদের ভারতীয় সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের মহৎ সূচনায় দূর করে দিয়ে তাঁদের মূল্যবান গবেষণা ও রচনা কথঞ্চিৎ দিশাহারা আর থাকতে দেবেন না। এখনও মনে হয় এঁরা তথাকথিত বর্ণহিন্দু নামক প্রত্যয় থেকে তাঁদের আদিবাসীদের মৌলিক বিভাগের উপরেই তাঁদের অসাধারণ গবেষণা ও গ্রন্থরচনার ভিত্তি গড়েন। অবশ্যই ইতিহাসের পর্বে পর্বে বিভেদের স্তরগুলি গৌণ নয়, কিন্তু নব নব যোগাযোগের স্তরগুলিও মৌল। তাছাড়া এতোদিন যে মহেনজোদারো, ছঙ্গুদারো বা হরপ্পাকে একটা আকস্মিক ঘটনা বলে নিশ্চিন্ত হবার দিকে য়ুরোপীয় পুরাতাত্ত্বিকের ঝোঁক ছিল, সে ঝোঁকও নর্মদা উপত্যকায় এবং দক্ষিণাপথে প্রাচীন সভ্যতার নানা আবিষ্কারে ক্রমেই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হচ্ছে। আপাতত হয়তো আমরা সব কটি ঐতিহাসিক সম্বন্ধপাতে অক্ষম, কিন্তু তারও আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

অধিকন্তু, এলউইন বা আর্চর যদি তাঁদের আদিবাসীতত্ত্বের স্বয়ং সর্বস্বতা ত্যাগ করে, আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী বিচারের মানদণ্ড ছেড়ে ভারতীয় অপভ্রংশ নামে অপখ্যাত ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিচারে নেন, তাহলে নৃতত্ত্ব তথা

সাহিত্য শিল্পবিচার দুয়েরই লাভ। তাহলে গোন্ডী বা সাঁওতাল বা উরাওঁ কাব্যের মধ্যে সংস্কৃত প্রথাসিদ্ধ রূপবর্ণনা বা উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যাখ্যায় রহস্যের সাহায্য নিতে হয় না, কোনো কোনো আচার ব্যবহার বা দেহতত্ত্বঘটিত ধারণাও এই প্রসঙ্গে বোধ্য হয় অর্থাৎ সংলগ্ন হয়। এলউইনের অপূর্ব চিত্রসম্ভারেই প্রমাণ করে যে মহেনজোদারোর ব্রন্‌জ্ নর্তকী থেকে শুরু করে ভারতীয় পাথর বা ব্রন্‌জের মূর্তির শরীরবিন্যাস আদিবাসী সৌষ্ঠবেরই প্রতিবেশী। তাছাড়া পাথরের কাজ, কাঠের কাজ, সংসারের জন্য নানান হাতের কাজের বিস্ময়কর উৎকর্ষ প্রমাণ করে যে এই যন্ত্রের, টুলসের ব্যবহারে যারা অগ্রগত, তারা জাতিগত ভাবে পশ্চাৎবর্তী মাত্র নয়, ভৌগলিক ও গোষ্ঠীগত ব্যবধান সত্ত্বেও।

সেই জন্যই একটু অবাক লাগে যখন এঁরা দেবর-বৌদিদির রসিকতার সম্বন্ধ শুধু আদিবাসীজগতেই সীমাবদ্ধ মনে করেন বা যৌনজীবন সম্বন্ধে সুস্থ স্বাধীন ধারণা মনে করেন ভারতের আদিম জাতিদের এবং য়ুরোপের আধুনিক শিক্ষিতজনের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ। এলউইনের মুড়িয়া গোটুলের উপরে এই বিরাট গ্রন্থে আমরা আমাদের উপকারের দিকটা থেকে নতমস্তকই হব। মুড়িয়া গোটুলের বস্তুত যে আচার অনুষ্ঠান তা যে ব্যভিচার নয়, সেকথা বাংলা দেশে যেখানে সহজিয়াসাধনা একদা শক্তিশালী ছিল সেখানে মানা শক্ত হবে না। অথচ এই গোটুলের বিষয়ে এলউইন আশ্চর্য পরিশ্রমে তথ্য সংগ্রহের শেষে যে কারণ দেখিয়েছেন তা এক হিসাবে নাগরিক সভ্যতার অবক্ষয়েরই আভাস নয় কি? পিতামাতা যেখানে প্রজনন ক্রিয়াকে বলে লজ্জাকর আদিম কর্ম, সেখানে কি আদিবাসীর আদিত্ব অবিমিশ্র?

এদিক থেকে আর্চরের উরাওঁ কবিতা ও জীবনের বিষয়ে এই দ্বিতীয় মূল্যবান 'দি ডাভ অ্যান্ড দি লেপার্ড'-এর একটি বিশেষত্ব উল্লেখ করে আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে যাই। আর্চর কবিতাগুলির প্রতীকী রূপ আলোচনার প্রসঙ্গে যে দেশ-বিদেশের কবিতার তুলনা দিয়েছেন তা খুবই উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদও বটে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে উরাওঁ প্রতীকের তুল্য তিনি এলুয়ার, ডাইলান টমাস্ থেকে এলউইনের বৈগা, গোন্ডী অবধি খুঁজেছেন; তবু—আমার কথাটি ফুরোল নটে গাছটি মুড়োল—এ বাংলা ছড়ার সাদৃশ্য তিনি পান নি এই উরাওঁ কবিতাটিতে:

> ও রাখাল, কেন বাঁশী কাটিস্? গরু কেন আসে না? গরু, কেন আসিস্ না? ঘাস কেন গজায় না? ঘাস, কেন গজাস্ না? বৃষ্টি কেন পড়ে না? বৃষ্টি, কেন পড়িস না? ব্যাং কেন ডাকে না?—ইত্যাদি

জ্যোতিষবাবু দেখিয়েছেন আর্যেতর বাংলার স্থান কোথায় ছিল। এবং বাংলা এখানে বিহার থেকে আলাদা নয়। তৈর্থিকীয় বা ব্রহ্মণ্যবিরোধী বৌদ্ধ জৈন ধর্মবাদগুলির জন্ম এই অঙ্গবঙ্গেই। আবার পরের যুগে বৈষ্ণববাদ এবং ধর্ম, নাথ, চন্ডী, মনসা প্রভৃতি সংঘটিত লৌকিক ধর্মও এই সাধারণ জনেই উৎস ও শক্তি পেয়েছিল। বাংলার এই উদার পরিগ্রহীতা স্বভাবেই পরের যুগে হিন্দু ও মুসলিমের সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল। এই লৌকিক চাপের সঙ্গে সংস্কৃতের যোগাযোগের রাজধানী চম্পা, গৌড়, নদীয়া।

ঐতিহাসিক বিকাশের চর্চায় সামাজিক বা অর্থনৈতিক যেটুকু তথ্য আমরা

পাই, জ্যোতিষবাবু তাও অবহেলা করেন নি। কালাপানির কাছে বলেই, ব্যবসা-বাণিজ্যের চাপে গৌড় থেকে নেতৃত্বের ক্ষেত্র সমুদ্রের কাছে নবদ্বীপে দক্ষিণ এল। এই দ্বন্দ্বময় প্রগতি তিনি ধর্মবিচারে তথা সাহিত্যবিচারেও ভোলেন নি। বৈষ্ণবধর্মের নিহিত গতিহীনতার দিকটা তাই তিনি সম্যক আলোচনাই করেছেন যদিচ বাংলা দেশের জাতীয় জীবনে এই বৈষ্ণবপ্রভাবান্বিত পঞ্চদশ ষোড়শ শতককে তিনি রেনেসান্সেরই তুল্য বলেন। তারই পটে তিনি ইংরেজি আমলের খণ্ডিত নাগরিক মধ্যবিত্ত জাগরণের পরীক্ষায় তাঁর আলোচনা শেষ করেছেন।

হয়তো তিনি সংস্কৃত প্রভাব বিষয়ে সব জায়গায় সমান অবহিত থাকেন নি, যেমন বাংলা পদ্যের স্বভাব তিনি সংস্কৃত ছন্দের সমজাতি ভেবেছেন। কিন্তু মোটামুটি তিনি মূল সূত্রটি ঠিকই ব্যাখ্যা করেছেন : বাংলা সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির প্রথম বিকাশ লৌকিক জীবনযাত্রায় এবং ঐতিহাসিক তাৎকাল্য-বশত ধর্মবাদে—সহজিয়া, নাথ, মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ইত্যাদি পন্থায়। ছোট ক্ষেত্রে আরো লোক-পুরাণের উদ্ভব হয়েছে, যেমন দক্ষিণ রায়, সত্যপীর ইত্যাদি।

'They were the main power behind the resurgence of Hinduism in the 16th, 17th and 18th centuries, and they provided the subject matter of the bulk of Bengali literature in the Gaur and Nadiya periods. They were non-aryan, anti-brahminic, opposed to the caste system, and mainly prevalent among the lower sections of the population. They were called *laukik* or vulgar . . .'

বলা বাহুল্য এখানে লৌকিক-বিদ্বেষ শুধু ব্রাহ্মণেই সীমাবদ্ধ নয়, চাঁদ সদাগর বা ধনপতি বিত্তবান বণিক সমাজের মানুষ। অথচ এই লৌকিক সংস্কৃতির প্রসার ক্রমেই জাতিব্যাপী হয়ে দাঁড়াল। চৈতন্যভাগবতে তাই জানা যায় যে মনসা বা চণ্ডী পূজারীর রোজগার শুদ্ধতর ব্রাহ্মণের চেয়ে বেশিই হত। এ ব্যাপারেও পরিগ্রহণ ও রূপান্তর লক্ষণীয়, চাঁদ ধনপতিদের বংশধররাই অছুৎ দেবদেবীর পৃষ্ঠপোষক, মনসা কৌলীন্য পেয়ে গেলেন শিবের মেয়ে হয়ে, চণ্ডী হলেন শিবানী।

এ যুগের সংস্কৃতি মুখ্যত লোকসংস্কৃতি, যার উত্থান জনসাধারণের মধ্যে থেকে খানিকটা অসহায় বিশ্বাস কিন্তু খানিকটা প্রতিবাদেরই রূপায়ণে। মুসলিম যুগে এ লোকসংস্কৃতি শক্তি পেয়েছিল কারণ এটা সাধারণ হিন্দু ও মুসলিম জনগণের জীবনের মধ্যে একাকার ছিল এবং ভাষাও একই ছিল কি হিন্দু কি মুসলিম সাধারণ মানুষের। জ্যোতিষবাবুর ভাষায়—

'The difference which different religions impose on human beings vanish before the deep realities of communal life, and the lower sections of humanity have a natural tendency towards unity and uniformity. Until the disruption of Bengal's village life in British times, the basic unity of her Hindu and Muslim population was never disturbed.

The unity arose out of racial oneness, common economic interest, and the communal life of the village.'

পঞ্চদশ শতকের শেষের জাগরণকে তাই ব্রহ্মণ্যের বা প্রতাপ প্রতিপত্তির জয় ভাবলে ভুল হবে। এই রেনেসান্স ব্রাহ্মণঐতিহ্যে স্থান অর্জন এবং সংস্কৃতবিদ্যার প্রবর্তন করল, কিন্তু তাই বলে ভুললে চলবে না যে এই রেনেসান্সের চালনাশক্তি এল তলার থেকে, লৌকিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায়। এরই ভিত্তিতে বাংলার অনেকগুলি গণআন্দোলনের স্বরূপ বোঝা যায়, বৈষ্ণব আন্দোলন তারই মধ্যে বড়ো একটি।

জ্যোতিষবাবুর ভাষায় দেশজ জনগণসম্ভূত এই ধারাই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রাণ, যদিচ তার দৈহিক প্রয়োজন মিটেছে বার বার সংস্কৃত খাদ্যে। তারপরে উনিশ শতকে এল যুগান্তর বিপর্যয়, এল ইংরেজি প্রভাবের মধ্যবিত্ত জাতকের প্রচণ্ড কিন্তু সীমাবদ্ধ জাগরণ। আমাদের পিতামহেরা বল্লেন, ফিরে চলো সংস্কৃতে, ব্রহ্মণ্যের কালোত্তর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উপনিষদে আর এগিয়ে চলো কালকের য়ুরোপে। প্রাণ না হোক, খাদ্য মিলল কিছু। ঐতিহ্য হয়ে গেল খাপছাড়া, মধ্যপদলোপী, অথচ, জ্যোতিষবাবুর ভাষায়, যে য়ুরোপ এল সে এদিকে তৃতীয় শ্রেণীর বাজে মাল আর আবার অতিখর্বকায়, মুখ্যত শুধু উনিশশতকী এবং তাও ইংলন্ডাবদ্ধ। জ্যোতিষবাবু বলেছেন—

'Saratchandra Chattopadhay and his followers have imported them ready-made from third-rate European novels, and our present school of pseudo-realistic fiction is a glaring instance of the bastard culture that is an offspring of the meeting of the East and the West.'

অবশ্য জ্যোতিষবাবু এই দোটানায় সর্বদা তাঁর প্রশংসনীয় দৃষ্টিস্থিরতা রক্ষা করতে পারেন নি। হয়তো সংস্কৃত বা ইংরেজি পদ্যছন্দ কানে আছে বলেই বাংলা পয়ার বা ত্রিপদী তাঁর সমধিক একঘেয়ে লেগেছে। আটাশ পৃষ্ঠায় তিনি ঠিকই ধরেছেন যে পূর্বউনিশ শতকী বাংলা কাব্য সঙ্গীতধর্মী তাই তার বিচার-মান শুদ্ধ কাব্য বিচারের মান হলে দুর্বোধ্য হবে, কিন্তু তিনি কথ্য ভাষার ঝোঁক ও সম অসম মাত্রার কথাটা মনে রাখেন নি। সেইজন্যই তিনি, লৌকিক বাংলার ঐতিহ্যের আকর্ষণেই বোধ হয়, মাইকেলের বিষয়ে অবিচার করেছেন। কারণ মাইকেলের শব্দচয়নে অনভ্যস্তের হাতড়ানি যদিও থাকে, তাঁর ছন্দের নিহিত স্বভাব হচ্ছে দেশজ বাংলারই চালে, কথ্যরীতির বিন্যাসের ছন্দের গতিতেই। অথচ জ্যোতিষবাবুর মতো সংবেদ্য কান পণ্ডিত সমাজে বিরল। বিদ্যাসাগরের কীর্তিবিচারে জ্যোতিষবাবু তার চমৎকার প্রমাণ দিয়েছেন : বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যেই প্রথম বাংলা গদ্যছন্দের বিন্যাস এল।

কবিকঙ্কনের জীবনধর্মী সরস বস্তুতান্ত্রিকতা বা ভারতচন্দ্রের বৈদগ্ধ্য বিষয়ে জ্যোতিষবাবুর আলোচনা উপাদেয় কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার প্রথাসিদ্ধ আতিশয্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি মৃত অভ্যাসিক পরোক্ষতার যে উদাহরণটি দিয়েছেন, সেটি নেহাত তাঁর বিরূপতারই ভ্রান্তিবিলাস : প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ

মোর। সে যা হোক, জ্যোতিষবাবু এই গ্রন্থে বাংলার দুধারার দোটানায় পড়ে সম্পূর্ণভাবে সমগ্র ছবি দিতে না পারলেও, সততাসম্পন্ন জিজ্ঞাসু তাঁর গ্রন্থপাঠে প্রশ্নের সব উত্তর না পান, কিছুটা পাবেন, এবং অন্তত প্রশ্নের দেখা পাবেন। এবং আশা করা যায় দ্বিতীয় সংস্করণে এই অসমতা তিনি দূর করবেন। আপাতত তিনি যে আরম্ভ থেকে উনিশ শতক অবধি বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে উনিশ শতকের বাংলার বিচ্ছেদের লক্ষণ ধরেছেন ও বলেছেন তাই আমাদের উপকার। তাঁর টিপ্পনীর সারগর্ভতা বাংলা সংস্কৃতির অনুরাগী, বাঙালী মাত্রেই বোঝে :

'Bengali literature had a prevailing rustic character before the 19th century, it has since acquired a prevailing petty-bourgeois character.'

তার কারণ অবশ্য সাহিত্য ছাড়িয়ে, বাংলায় ইংরেজি শাসনের বুর্জোয়াসির অপূর্ণতায়। এবং যে কারণে আমাদের উপরতলা মূলত পেতিবুর্জোয়া, সেই কারণেই আমাদের মজুরেরা এখনও বস্তুত, নিদেন মানসে, গ্রামীন্। এই কারণেই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা পেয়েছি মূলত 'ম্যাস্-প্রোডিউস্‌ড্ ব্রিটিশ গুড্‌স্'।

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকাবলী জ্যোতিষবাবু অনবধানতাবশত প্রায় বিচারেই আনেন নি। কিন্তু বঙ্কিমের বিস্তৃত আলোচনা প্রচুর চিন্তার খোরাক জোগায়। তাঁর মতে বঙ্কিমের মূল্য বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক কারণে, তিনি একজন পুরোধা। কিন্তু সাহিত্যিক বিচারে বঙ্কিম নেহাতই সামান্য ঔপন্যাসিক। জ্যোতিষবাবু বঙ্কিমের আটটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বিচারে এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন যে তার একটিও ঐতিহাসিক পদবাচ্য নয়; আনন্দমঠ, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিশ্লেষণে তাই প্রমাণ হয়। সামাজিক উপন্যাসকার হিসেবে বঙ্কিমের সহানুভূতি অগভীর ও অপরিসর দুইই। বঙ্কিমের মধ্যে জ্যোতিষবাবুর মতে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসাও নেই, অথচ একটা ব্যাপক মানবিকতাও নেই। তাঁর অধিকাংশ পুরুষচরিত্র পেস্টবোর্ড এবং তাঁর মেয়েরা আরম্ভে প্রাণবান হলেও শেষটা একটা বেসুরে মিলিয়ে যায়। কারণ বঙ্কিমের পুরুষার্থ তৎকালীন ও তৎশ্রেণীর গয়ংগচ্ছ স্রোতে চলামাত্র। জ্যোতিষবাবু দীর্ঘ বিশ্লেষণের পরে বলেছেন যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সজাগ মানুষের যুগে বঙ্কিমের এই অভ্যাসিকতা তাঁর নিজেরই দুর্বলতা। জ্যোতিষবাবুকে বঙ্কিম-বিরোধী ভাবলে ভুল করা হবে, তিনি ইন্দিরার প্রশংসায় ন্যায্যতই পঞ্চমুখ। কিন্তু বঙ্কিমের রাজসমাজতাত্ত্বিক উপন্যাসের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিগুলি নগণ্য নয়। অবশ্য জ্যোতিষবাবু স্বীকার করেন যে বঙ্কিমের ইংরেজ আনীত সংস্কৃতি সম্ভাষণে কিছুটা সত্য আছে, যদিচ

'The view is too idealistic and ignores the economic and political aspect of British rule.'

তাছাড়া এ একচক্ষু মত বঙ্কিমের একার নয় :

'It runs through the synthesis between the East and the West made by Indian thinkers from Rammohan Roy to

Rabindranath Tagore. We should also note that except in the work of a small number of intellectuals, the best elements of European literature cannot be said to have arrived in Bengal or, having arrived, to have struck roots.'

তাই জ্যোতিষবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত

'imported from the West the sentimental languors of the Celtic Twilight, the affections of the fin de siecle aestheticism, and the misty vagueness of Maeterlinckian symbolism.'

কিন্তু জ্যোতিষবাবু তাঁর শেষ অধ্যায়. রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ে একটু হতাশই করেছেন। প্রথমত তাঁর শেষ পাতার উদ্ধৃতিটি : জানি গো জানি দিন যাবে : গানটি কবির শেষ দিকের রচনা বলেছেন নেহাৎ অসতর্কতায়। দ্বিতীয়ত তিনি গোরা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি উপন্যাসগুলির বিচারই করেননি। অথচ গোরা, বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই নয়, বাংলা জীবনের ও সংস্কৃতির দুধারার ব্যর্থ সমন্বয় চেষ্টায় আমাদের জাতীয় রূপকও বটে; তারপরে জীবন এগিয়েছে, ইতিহাস ও তার জ্ঞান এগিয়েছে কিন্তু এখনও গোরার স্থান নেবার ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়নি। এই দিক থেকে অবাক লাগে যখন কোনো সমালোচক গোরার সঙ্গে এবং গোরার চেয়েও সার্থক হিসেবে শেষের কবিতার সামাজিক রূপকান্বয় দেন, যদিও সাহিত্যবিষয়ে সচেষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই জানে যে শেষের কবিতা প্রতিভার খেলা মাত্র।

জ্যোতিষবাবু গীতিনাট্য প্রসঙ্গেও অসম্পূর্ণ। মায়ার খেলা ও বাল্মীকি-প্রতিভার নাম করে তিনি ক্ষান্ত অথচ তিনি কি জানেন না যে বিশ্বের শিল্পে চণ্ডালিকা ও চিত্রাঙ্গদা অপূর্ব সৃষ্টি? অধিকন্তু রবীন্দ্রনাথের আপাতলঘু ক্ষণিকা এবং শেষ কবিতার নগ্নকঠিন বইগুলি যদি তিনি উল্লেখ এবং তাদের যন্ত্রণা ও জিজ্ঞাসা বিচার করতেন, তাহলে তাঁর রবীন্দ্রনাথের অন্যথা গভীর বিশ্লেষণ সার্থক হত। তাহলেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত তার প্রকৃত ব্যাখ্যা ও নির্দেশ পেত :

'The lack of any deepseated conflict in his nature, while it gave him spontaneity and saved him from morbid introspection and self-analysis, was also responsible for many a facile sentiment and gilded platitude.'

শেষে শুধু একটা কথা বলা দরকার। ইংরেজি পাঠকের পক্ষে তথা অধিকাংশ বাঙালী পাঠকের পক্ষেও প্রত্যক্ষ বাংলাসাহিত্যের ক্রিয়াকাণ্ড স্পষ্ট হত যদি জ্যোতিষবাবু যাত্রা, কথকতা, কবিগান, কীর্তন, গাজন ইত্যাদির একটু বর্ণনা-মূলক উল্লেখ করতেন। যেমন স্পষ্ট হত তাঁর মূল তত্ত্ব : বাংলা সাহিত্যের মুখ্য লৌকিক ধারার শক্তির কথা, যদি তিনি রবীন্দ্রনাথের ছেলেভুলানো ছড়া এবং অবনীন্দ্রনাথের বাংলার ব্রত-র পথে লৌকিক মানসের এ দিকটার সন্ধান নিতেন ও দিতেন। রূপকথার উল্লেখ অবশ্য তিনি করেছেন। কিন্তু সে বিষয়েও

হয়তো আরো বিস্তৃত আলোচনা পেলে ভালো হত, কারণ আজও দেখা যায় কোনো কোনো সমালোচক পথনির্দেশের সংক্ষিপ্ত উৎসাহে উনিশশতকসর্বস্ব আবেগে লোকসাহিত্যের ধারায় ও নির্মাণে রূপকথার ব্যঞ্জনা জন-বৈরিতা ভাবেন।

৫

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

গত শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত বাঙালী আমরা পরম উৎসাহে নতুন শিক্ষায় মেতে-ছিলুম, তখন সে উৎসাহ ছিল স্বাভাবিক, একমাত্র সুস্থ পথ। সমাজ-ব্যবস্থায় মোড় ফেরার সময় তখন, নতুন শিক্ষায় ছিল জীবিকার ভরসা এবং নতুন জীবন-যাত্রার আশা। সে আশাভরসার চেহারা আজকে স্পষ্ট হয়েছে অনেক নৈরাশ্যের সংঘর্ষে। তার কারণ অবশ্য পূর্বজদের চেয়ে আমাদের বুদ্ধির আধিক্য নয়। সাহিত্যশিল্পের জগতে বিশেষ করে আমাদের ঐতিহাসিক বিনয় প্রয়োজন। কারণ সে জগতে কি গ্রাহ্য আর কি ত্যাজ্য, সে বিষয়ে সেকালের কবিরা আমাদের দৃষ্টান্ত হয়ে অনেক পণ্ডশ্রম থেকে বাঁচাতে পারেন।

আজকে আমাদের উত্তরাধিকার আবিষ্কার করতে হলে যাঁদের রচনাবলী বিচার করতে হবে, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিশেষ মর্যাদা। সে আবিষ্কারে বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের সহায়। বঙ্কিম গুপ্ত-কবির প্রতিভা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বঙ্কিমের মধ্যেও সেই দেশজ মনোবৃত্তির আভাস পাওয়া যায়, যে মনোবৃত্তি শিক্ষিত বাঙালী আর বাংলার জনসমাজের বিলীয়মান ভেদের সমাধানে আমাদের অবশ্য আলোচ্য। বঙ্কিমের ভাষায় 'মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি, ঈশ্বরগুপ্ত বাংলার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙালী কবি জন্মে না, জন্মিবার যো নাই, জন্মিয়া কাজ নাই।' কথাটি ঐতিহাসিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, কিন্তু ইতিমধ্যে শিক্ষিত বাঙালী আর খাঁটি বাঙালী দুই স্রোত অনেক দূর বয়ে গিয়েছে, দুর্লঙ্ঘ্য ভেদের ব্যবধানে দুই স্রোতই সমুদ্রে গিয়ে আজ একাকার। আজ আমরা শিক্ষিত শ্রেণীর বিড়ম্বিত কাব্য সাধনার চূড়ান্তে এসেছি। আমাদের সংস্কৃতির ক্ষুরধার চূড়ায় সামাজিক সমর্থনের আশ্রয় নেই অথচ সমাজ-জীবনের মরিয়া তাগিদ আমাদের ব্যক্তিস্বত্ববাদের দোরগোড়ায় হানা দিচ্ছে। আজকে তাই কবিকুলকে ভাবতে হচ্ছে বাংলার জনসমাজের চৈতন্যের সঙ্গে, দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধনের কথা। অবশ্যই এ একতা পারস্পরিক। এবং যেহেতু ব্যাপারটা যান্ত্রিক নয়, সেই হেতু এই সংগঠন সাহিত্যিক বক্তৃতায় বা বই পড়ে বা লিখেই হবে না। কিন্তু এলোমেলো সামাজিক সত্তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যেরও গৌণদান আছে এবং দেশজ ঐতিহ্যের সন্ধান আজকে তার প্রথম পর্ব।

এই ঐতিহ্য আমরা আজও লোকশিল্পে ও সাহিত্যে খুঁজে পাই। বঙ্কিম একে বলেছিলেন রিয়ালিজম। পাহাড়পুরের শিল্পনিদর্শন থেকে গ্রামশিল্পের যে সব লুপ্তপ্রায় নমুনা মেলায় আজও দেখা যায়, সে সবেই এই বহির্জগতের

বস্তু সম্বন্ধে সুস্থ মনোযোগের প্রমাণ। চণ্ডীকাব্যে, মঙ্গলকাব্যে, এমনকি বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই স্বাস্থ্য আমাদের আশ্চর্য করে। এই মনোবৃত্তি দেবদেবীর প্রতি মানুষের মহিমা আরোপ করে, সদাগরদের নাকাল করে, প্রেমের মধ্যে নিঃসঙ্কোচ সম্পূর্ণতা পায়। ইংরেজিতে একে মানবিকতা বলে। এই মানবিকতার বস্তুনির্ভরতা, বুদ্ধির উপরে আস্থা, ভাববিলাস এড়িয়ে অভীপ্সা ও প্রত্যক্ষের সমন্বয়—হয়তো বা একটু রসিকতার আমেজেই সমন্বয়—আজও বাংলা জনসমাজের অন্তরঙ্গ জীবনে দেখা যায়। শিক্ষিত বাঙালীর সান্নিধ্যে আমরা ভুলে যাই যে বাঙালীর বিখ্যাত ভাবালুতা সাম্প্রতিক এবং শিক্ষিত বাঙালীর বিশেষত্ব মাত্র। দেশের যে ঐতিহ্য ব্রিটিশপূর্ব শিল্পসাহিত্যের উৎস, সেই লোকমানসে বাচালতা থাকলেও অশ্রুজলের চর্চা নেই।

গত শতাব্দীর কণ্টকিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই ঐতিহ্য রক্ষায় এক দিক্‌পাল। সেখানে তাঁর কাজ শুধু উপভোগ্য লেখা নয়, তাঁর সাহিত্য-জীবন রূপকও বটে। পুরাতন ঐতিহ্যে বাঁধা তাঁর লেখনী নতুন সমাজের পটে যে আঁচড় কেটেছিল, সেটাই বিস্ময়কর ঘটনা। হয়তো সে আঁচড়ে মহাকাব্যের রূপ নেই, কিন্তু কবির লড়াই-এর কবি, প্রথাসিদ্ধ খাদ্যবর্ণনার কবি, প্রণয় বা পরমার্থের লেখক যে সংবাদপ্রভাকরের চক্ষুষ্মান সম্পাদক ছিলেন এ তথ্য আমাদের কাছে মূল্যবান।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা॥
আকাশের অকস্মাৎ আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট সুখদ স্বভাব॥

ইত্যাদির প্রথাসিদ্ধ লেখকই দুর্ভিক্ষ, নীলকর, শিখযুদ্ধ, বর্মাযুদ্ধ বিষয়ে অল্পবিস্তর জোরালো পদ্য লিখেছিলেন।

ঈশ্বরগুপ্তের ইংরেজি নববর্ষ নামক কবিতা থেকেই এই দ্বৈতধর্মী বস্তুবাদের মজাদার উদাহরণ আরম্ভ করি।

খৃষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যতো শ্বেত নর॥
সে উৎসবে : বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফোটে॥

পরে দেখি : বিবিজান চলে যান লবেজান করে।
শাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।
বেলাক নেটিভ লেডি শেম্‌ শেম্‌ শেম্‌॥
সিন্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি।
নসী, যশী, ক্ষেমী, রামী, যামী, শামী, গুল্কি॥

এদিকে কিন্তু এ বহিরাশ্রয়ীর চোখে ছদ্ম মিশনরীও কবিতার বিষয়, পৌষ পার্বণেও কবির প্রবল আগ্রহ। তপসীমাছ বা পাঁঠা কিছুতেই এ বস্তুবাদীর আপত্তি নেই—

রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥
তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান্।
তুমি সাধু সাধু তুমি ছাগীর সন্তান॥

কিংবা : কর্ষিত কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাড়ি তপস্বীর প্রায়॥
হায় রে তপস্বী, তোর তপস্যার কি জোর॥

আনারসকে তাই মনে হয়—

বন হতে এল এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায়॥
সকল নয়ন-মাঝে রক্ত আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥

শেষে : অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।
গালে এসে বাস কোরো মরণের কালে॥

এই প্রকৃত মনের বাস্তবিকতাতেই কবির সহানুভূতি রূপ পায় :

কিছুদিন মা! দয়া করি রপ্তানিটি বন্ধ রাখো,
ধনে প্রাণে হল কাঙালী
ভাত বিনে বাঁচিনে, আমরা ভেতো বাঙালী,
চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে চালের জাহাজ চেলো নাকো॥

কিংবা : হয় দুনিয়া ওলটপালট আর কিসে ভাই রক্ষে হবে।
পোড়া আকালেতে নাকাল করে, ডামাডোল পড়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেড়া শিক্ষে ধরে ভিক্ষে করে বেড়াই সবে।

সেকেলে কবির তাই ভরসা দূর সিংহাসনে :

ওগো মা ভিক্টোরিয়া,
কর গো মানা; যত তোর রাঙা ছেলে আর যেন মা
চোখ রাঙে না চোখ রাঙে না॥—

কিন্তু এ হিন্দুসভামন্য কাতর প্রার্থনাতেও অতিকথনের চটক, চাপা হাসির আভাস :

ও-মা! গো-হত্যাটি উঠিয়ে দে মা! অভয়পদে এই বাসনা।
মাগো, সকল গরু ফুরিয়ে গেলে দুগ্ধ খেতে আর পাব না॥

ওদিকে : এই ভারত কিসে রক্ষা হবে ভেব না মা, সে ভাবনা।
সে "তাঁতিয়া তোপির" মাথা কেটে আমরা ধরে দেব "নানা"॥

অবশ্য একথা মানতে হবে যে সমস্যাই শুধু ঈশ্বর গুপ্তকে উত্তেজিত করে,

সেইটুকুই তাঁর কৃতিত্ব। তিনি মুখ ফিরিয়ে কাব্য সাধনা করেননি এইটাই বড়ো কথা। সমাধান যেকালে ইতিহাসেই প্রায় দৃশ্য ছিল না, সেকালে একজন কবির মধ্যে সে দিব্যদৃষ্টি আশা করাই অন্যায়। তাই গুপ্ত-কবি তিক্ত দ্বিধায় সীমাবদ্ধ। ভিক্টোরিয়া-র ভক্ত তাই মার্শম্যানকে বিদায় দেন :

শুনিতেছি বাবাজান এই তব পণ।
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ বিলাতে গমন॥
জোড়করে পশুপতি করি নিবেদন।
সেখানে কোরো না গিয়ে প্রজার পীড়ন॥
ভূত প্রেত সঙ্গীগুলি সঙ্গে লয়ে যাও।
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও?
বাজাই বিজয়ী বাদ্য টম্ টম্ টম্
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙে বম্ বম্ বম্।

বিধবা-বিবাহ ঈশ্বর গুপ্তের পছন্দ হয় না, অথচ বিলাত থেকে সে আইন প্রত্যাহারের সম্ভাবনাও তাঁকে বিচলিত করে। এদিকে তিনি লেখেন :

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব।
একদিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেভিল খায় খানা।
পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র দেয় কেটে।
বাপ পুজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে।
বৃদ্ধ ধরে পশুভাব, জন্তুভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ, ছেলে বলে যিশু॥

ওদিকে ভাবী সমাজের চিত্রও তাঁকে সান্ত্বনা দেয় না :

লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল,
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া!
ঠাটঠমকে চালাক চতুর
সভ্য হবে থোড়া থোড়া!
আর কি এরা এমন করে
সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে?
আর কি এরা আদর করে
পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে?
পর্দা তুলে ঘোমটা খুলে
সেজে গুজে সভায় যাবে!
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠের হাওয়া খাবে।

আমরা কবিত্ব বলতে যা বুঝি, রোমান্টিক কাব্যের সে সংজ্ঞা গুপ্তকাব্যে

প্রযোজ্য না হলেও তার নিজস্ব মর্যাদা আছে। অনেকেরই ধারণা যে এ মেজাজ বা মননরীতিতে মহৎ কাব্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। কিন্তু সামাজিক পরিবেশে এ-প্রাকৃত মনোবৃত্তিও যে রোমান্টিক আবেগে দানা বাঁধতে পারে, তার প্রমাণ ইংরেজি কাব্যে চসর এবং আরো মহৎ প্রমাণ দান্তে। রোমান্টিক কাব্যধারায় যেটা মস্ত লাভের বিষয়, সেটা হচ্ছে কাব্যরূপ বা ফর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা। ঈশ্বর গুপ্ত সে জ্ঞানের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন নি, তার জন্যে অনেকটা দায়ী হয়তো তাঁর শৈশবের প্রতিকূল আবহাওয়া, শিক্ষার অভাব।

তাছাড়া, মনে রাখা দরকার যে তিনি যে যুগসন্ধির, সামাজিক দোটানার, শিক্ষার ও ঐতিহ্যের আপাতবিরোধের কবি, সে বিরোধে তিনি ঐতিহ্যের চেনা পক্ষই নিয়েছিলেন। দেশজ রীতি বা কনভেন্‌শনেই তাঁর কবিত্বের শক্তি এবং সে কনভেন্‌শনের সামাজিক কাঠামোতে তখন ভাঙন ধরেছে, আর সে রীতির লৌকিক স্বভাব এবং রোমান্টিক জ্ঞান-গরিমার সমন্বয় তাঁর আয়ত্তে ছিল না। তার কারণ যে শুধু তাঁর কবি-প্রতিভার সামান্যতা নয়, তার প্রমাণ পাই মাইকেল, হেমচন্দ্র একাধিক নামকরা কবিকীর্তিতে।

হেমচন্দ্র অবশ্য প্রায় ঈশ্বর গুপ্তের সমগোত্র ছিলেন কবিত্বের তুলাদণ্ডে। হেমচন্দ্র এদিকে রোমান্টিক স্বপ্নের অভীপ্সার আস্বাদে মাইকেলের অনুকারক, ওদিকে আবার গুপ্ত-কবির রীতিতে সাময়িক ঘটনা নিয়েও পদ্য লেখেন। কিন্তু দুটি ধারা তাঁর কবিস্বভাবে এক হয় না। ফলে দুটি ধারাই তির্যগ্‌গামী, ক্ষীণ। মাইকেলের প্রচণ্ড প্রতিভা এ-সমন্বয় প্রায় সম্ভব করে তুলেছিল। মেঘনাদবধের উদ্দাম কল্পনা চতুর্দশপদাবলীতে, ব্রজাঙ্গনায় অনেকটা সমাজবেদ্য, অনেকটা প্রাকৃত সমর্থনে সার্থক। তবু তাঁর কাব্যভাষার বাধা মাইকেল বাঁধতে পারেন নি। তাই বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ বা একেই কি বলে সভ্যতায় যে প্রাকৃত শুভ-বুদ্ধির সামাজিক দৃষ্টি, যে বস্তুনির্ভর দেশজরীতির সুস্থ মনোবিন্যাস পাই, তা তাঁর মিলটন-ঘেঁষা বায়রন-ঘেঁষা কাব্যে মূর্তি পায়নি। কবিতার চেয়ে নাট্যরূপ কেন এ-কাজে সহায় সে-কথা এ-প্রসঙ্গে বিচার্য। এই শুভবুদ্ধি, এই রীতি টেকচাঁদকে, কালীপ্রসন্নকে লুব্ধ করেছিল, দীনবন্ধু মিত্র এই মননের উৎসেই পান তাঁর অসামান্য সেক্সপীয়রীয় মানবিকতা। ঐতিহাসিক কারণে ও ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যে ঈশ্বর গুপ্ত এই রীতির সার্থকতা ও সীমাবদ্ধতা একাধারে দুয়েরই দৃষ্টান্ত। কিন্তু বাক্যবিন্যাসের দেশজ রীতি আজও আমরা ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে খুঁজতে পারি, যেমন পারি বস্তুনির্ভর সাধারণ সুস্থ বুদ্ধির সরসতা। অবশ্য কোনো-কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দেশী সাধনায় এই সন্ধানের মধ্যে একটা স্থূলতা দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরেও রুচির এই বিপরীত রূপ আমাদের মধ্যবিত্ত বিড়ম্বনাতেই সম্ভব। তার জন্যে চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কন থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা ঐতিহ্যের কবিরা দায়ী নন, দায়ী আমাদেরই ঐতি-হাসিক বোধের অভাব এবং মধ্যবিত্ত কুরুচি।

৬

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

আমাদের সভ্যতার ইতিহাসে দেশ ও কাল, টাইম ও স্পেস্ কি করে মানুষের মনে প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে, তার বিবরণ আজকাল পণ্ডিত ব্যক্তিরা দিচ্ছেন। বহির্জগতের সম্বন্ধসংঘাতে এই সব প্রত্যয় জাগে আমাদের মনে। সভ্যতার আর একটি বড় প্রত্যয় হচ্ছে ব্যক্তিত্ববোধ। কি করে সমাজ ও ব্যক্তিতে দ্বন্দ্বাশ্রয়ী সম্বন্ধের দীর্ঘ ইতিহাসে এই ব্যক্তির স্বরূপ মর্যাদা পেতে লাগল, তার ব্যাখ্যা সভ্যতারই ইতিহাস। বহির্জগতের বিরুদ্ধশক্তি, অন্ধপ্রকৃতি, জন্তু-জানোয়ার, হিংস্র গোষ্ঠীর দলাদলি যতদিন না মানুষের শুভবুদ্ধির কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা পেয়েছে, ততদিন ব্যক্তির এই মহিমা কবিদের মনেও আসেনি। বাল্মীকি বা হোমর গোষ্ঠীর রচনাই করেছেন, রবীন্দ্রনাথই বলতে পেরেছেন ব্যক্তির স্বকীয়তার কথা :

> বহুদিন মনে ছিল আশা
> ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে,
> ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
> করেছিনু আশা!
> গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
> ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা
> চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে
> ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
> তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
> ভরিয়া তুলিব ধীরে
> জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা,
> ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
> করেছিনু আশা।

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ে যে বোধ থেকে এই আশার জন্ম, সে বোধ মানব-সভ্যতার বিশেষ একটা পরিণতিতেই সম্ভব। কিন্তু এখনও সম্ভব নয় এই আশাকে সকলের পক্ষে সফল করা। ব্যক্তির এ স্বাধীনতা কোথায়, যেখানে অর্থের প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিত্বই পণ্যদ্রব্য মাত্র? বাণিজ্যচণ্ডীর তাড়নায় তাই রবীন্দ্র-নাথকেও বলতে হয়েছে :

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী,
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা!

সকল সচেতন মানুষের মধ্যেই তো অন্তরের ধ্যানখানি আপনার ভাষা খোঁজে। কিন্তু জীবনযাত্রার অমানুষিক রথচক্রঘর্ঘরে সে ভাষা ডুবে যায়, মন ভবিষ্যতে খুঁজে বেড়ায় তার সম্পূর্ণ বাণী।

ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে আমার মনে পড়ে ইংরেজি কবি এলিঅটের ধরতাই বুলি : অতীত ও ভবিষ্যৎ দুয়ের অঙ্গুলি-নির্দেশ একদিকে—এই বর্তমানে। বর্তমানের উৎসারিত স্বপ্নের সৃষ্টিই তো আমাদের ভবিষ্যতের ছবি—নানা স্বপ্নের ঐক্যতান, দুঃস্বপ্নেরও। বর্তমান যদি কিছুমাত্র সুস্থ হত, তাহলে হয়তো আমাদের স্বপ্নপ্রয়াণে সামঞ্জস্য থাকত! কিন্তু নানালোভে ক্রূরতায় আজ আমরা ক্ষতবিক্ষত। স্বেচ্ছাকৃত অভাবে যুদ্ধে প্রতিষেধ্য রোগে, অনাবশ্যক মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলিও ছত্রভঙ্গ। তাই ঐক্যতান ছিন্নভিন্ন অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায় গলিতে। কিন্তু জীবন তবু হার মানে না, তার শিকড় আমাদের মনের গভীরে, দুর্মর প্রাণ নৈর্ব্যক্তিক আবেগে নির্নিমেষ চোখ মেলে থাকে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দেশ, আসন্ন সমাজ কাঁপে চৈতন্যের সম্ভাবনায়, অবশ্যম্ভাবিতায় বীজ কম্প্র নীল অন্ধকারে বর্শার ফলার মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন। বিসম্বাদের মধ্যেই উজ্জীবনের সমাধান হেঁকে যায়, উদয়াচলে মেশে অস্তাচলের রক্তস্রোত, ভগ্নদূতের মুখে জাগে মিছিলের প্রবল আশা, প্রাণের কবি অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীকালের ভাষা!

ব্যাপারটা নিছক কবিত্ব নয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য এর পক্ষে। বিজ্ঞান এর সমর্থক। আর বিজ্ঞান আজ আমাদের সারা বিশ্বে বাহুবিস্তার করেছে, আজ আর বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে শেষ নয় বা স্বতন্ত্র পেশা বা বিশেষজ্ঞের জ্ঞানে আবদ্ধ নয়, আজ জীবনে তার ব্যাপ্তি প্রায় জীবনের মতই গভীর ও জটিল! কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই প্রচণ্ড ব্যাপ্তির মধ্যে বিশেষ ও নির্বিশেষে একতার বহুধা বন্ধন, বাহির ও ঘরের, দেহ ও মনের, ব্যক্তি ও সমাজের, বস্তু ও রূপের হরিহর আলিঙ্গন!

আর বিজ্ঞান বলতে এই ছবিই তো আমাদের মনে জাগে। ভবিষ্যতের স্বপ্নে এই বিজ্ঞানই, আধুনিক বিজ্ঞানই জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজ যেখানে মানুষ লোভে পড়ে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে না—পাছে মুনাফার হার কমে যায়, সেখানে বিজ্ঞানকে দূরে পরিহার করার ইচ্ছাটা আমার মতো লেখক শ্রেণীর অসহায় জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনীতির স্তরকে ছাড়িয়ে যখন আমরা মানুষের স্তরে পৌঁছতে চাইছি, তখন এ আশা অমূলক নয় যে জীববিদ্যায় মনোবিদ্যায় নির্মাণকার্য আরম্ভ হবে মানুষকে নিয়ে। জীবিকা বা জীবনযাত্রার শূলে চড়ানো আজকের মানুষ নয়, স্বাধীন জীবনের পটভূমিতে নিছক মানুষ। অর্থাৎ দুজন মানুষের মধ্যে প্রভেদটা কেন হবে অর্থনীতিগত কারণে, তাদের জীবনযাত্রার আবশ্যিক প্রভেদের জন্যে! কেন হবে না দুজন মানুষের শারীরিক মানসিক ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসের জন্যে, নিছক মানসিক কারণে?

অবশ্য সাহিত্যের আসল কারবার চিরকালই চলেছে মানুষকে নিয়ে, ব্যক্তিস্বরূপ বা পার্সন্যালিটিকে নিয়েই।—কিন্তু সে মানুষ প্রায়ই হয়েছে তার জীবনযাত্রার দাসানুদাস, ব্যক্তিস্বরূপ বিড়ম্বিত হয়েছে বহিঃসমাজের চাপে, আকস্মিকতায়।

ধরা যাক প্রেমঘটিত ঈর্ষ্যার কথা। ওথেলো নাটকের পরস্পরে বিশ্বাস বা আস্থা ঘটিত মুখ্য ভাব-বস্তু সম্ভবত চিরকাল নরনারীর সম্বন্ধে যন্ত্রণার উৎক্ষেপ আনবে, কিন্তু ঈর্ষ্যার যে বিশেষ চেহারা ঐ নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে ও তাদের কর্মধারার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তা হয়তো পরিবর্তনশীল। ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে ওথেলোর মুরিশ্ মত্ততা, ইয়াগোর কুটিল স্বার্থপরতা, ডেসডিমনার অসহায় অবলা ধরন ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ নিতে পারে ব্যক্তিত্বের ভিন্ন প্রতিষ্ঠায়। মধ্যযুগের দিকে তাকালেই আমরা এই ভিন্ন রূপের একটা আভাস পাই, দান্তের মুখে পাওলো ও ফ্রানচেসকার অবৈধ প্রেমের যে ভাষা, সে পুরুষার্থ মধ্যযুগের ধর্মের ছকে ফেলা সামাজিক জীবনেই শোভন। কিংবা ত্রুবাদুর কবি প্যের ভিদাল্‌কেই ধরি, বৈষ্ণব কবির মতো ত্রুবাদুর রীতিতে পরকীয়কে উপলক্ষ্য করে প্রেমের কাব্যসাধনা চলিত ছিল, কাউন্টেস লোবা তাই হেসেই প্যের ভিদালের কবিতা শুনতেন, ভিদালের আজগুবি খেয়ালে কাউন্টও কখনো বিচলিত হননি। এমন কি ভিদাল্ যখন আবেগে আত্মবিস্মৃত হন, এবং লোবা নিজেই কবির বিরুদ্ধে নালিশ জানান, তখনও কাউন্ট ব্যাপারটা হেসেই ওড়াতে চান, কারণ ত্রুবাদুর রীতিই যে প্যের ভিদালের এই আতিশয্যকে সম্ভব করেছিল। সেই রকম বলা যায় যে বিধবাবিবাহ যদি সত্যই সমাজে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তাহলে কি রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"র রূপ ভিন্ন হয়ে যাবে না? ছেলে-মেয়ের কাছে ভালোবাসার দাবি বৃদ্ধ মা-বাপের মনে বরাবর থাকবে; কিন্তু কিং লিয়ারের ট্রাজেডির মধ্যে কতোখানি অংশ জুড়েছে রাজত্বের ভাগবাটোয়ারা? এমন কি এড্‌মন্ডের মধ্যেও তো জারজ সন্তানের গ্লানি এবং পৈতৃক সম্পত্তির লোভটাই সবচেয়ে উগ্র আবেগ।

সাহিত্যের অবশ্য স্বায়ত্তশাসনের দিকে ঝোঁকটা দীর্ঘকালের. তাই এই সব বহির্জাত কারণকে, আকস্মিক সামাজিক হেতুকে সাহিত্যিকরা বরাবরই দাবিয়ে রেখেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন মানুষকে, ব্যক্তিকে। তাই আমাদের মনে থাকে না যে গোবিন্দলাল বা রোহিণীকে স্বাধীন মানুষ বলার চেয়ে লোভের পুতুল বলাই সঙ্গত। এই অসঙ্গতি এড়াবার জন্যেই সেকালের সাহিত্যে পৌরাণিক গল্পের মাহাত্ম্য থাকত, না হয় থাকত প্লটের মাহাত্ম্য। প্লটের সম্মোহনে আপাত-স্বাধীন মানুষও জীবনমৃত্যুর কাছে নিজেকে দিত বিকিয়ে। কিন্তু সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহাসিক বিকাশে ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল সাহিত্যের আত্মমর্যাদা। ফলে আধুনিক সাহিত্যে প্লট গৌণ, চরিত্র বা ব্যক্তি ও তার সঙ্গে জড়িত আবহাওয়াই মুখ্য। কিন্তু সমাজ এখনও সেই পুরোনো আর্থিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই চলেছে, ফলে এই আধুনিক সাহিত্যের স্বাধীন ব্যক্তিরা এতই স্বাধীন যে তাদের বাহির-রূপ প্রায় নেই বললেই চলে, আছে শুধু তাদের মনের অন্তরঙ্গ স্বাধীনতা।

সে স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় মনোবিজ্ঞানের অচেতন বা অব-চেতনে এবং সে নিরাকার জগতে রামশ্যামকে আলাদা করে চেনা শক্ত। ফলে ব্যক্তিত্বের নির্বিশেষ সন্ধানের শেষ দেখি ব্যক্তিত্বলোপে। কারণ সাহিত্যের

উপজীব্য শূন্যে ঝোলানো নিরালম্ব ব্যক্তিত্ব নয়। সে ব্যাপারটা বাস্তবে টেঁকেও না, নিরালম্ব ব্যক্তিত্ব একটা এবস্ট্র্যাকশন বা পরোক্ষনিদান, এবং সাহিত্যের কাজ প্রত্যক্ষ নিয়ে, বাস্তব নিয়ে। সাহিত্যে চৈতন্যের স্রোত বা স্ট্রিম অব্ কনশাসনেস-এর চর্চায় আমরা শিখেছি অনেক কিছুই, কিন্তু, সে পরীক্ষায় আর বিকাশের পথ রুদ্ধ।

বিকাশের পথ ব্যক্তিত্বের নব-নব উন্মেষে নতুন-নতুন বিস্তারে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে সম্বন্ধ যাতে আকস্মিকতা-দুষ্ট না হয়, যাতে মধ্যযুগের বৃত্তিতে সীমাবদ্ধ না হয়, যাতে একালের প্রতি-যোগিতামূলক জীবনযাত্রায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন না হয়, তার জন্যে চাই বিজ্ঞানশুদ্ধ মনুষ্যধর্ম। যে ধর্মে অর্থকরী বৃত্তির সুযোগ সকলের পক্ষে সমান, অবসর প্রচুর, সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিস্তৃত, ধনীদরিদ্রের, উন্নত-অনুন্নত জাতির ভেদ অবান্তর; মৌরসীপাট্টা জীবনযাত্রা নয়, জীবনই সেখানে মূল্যবান। টাকা সেখানে পুরুষার্থ নয়, প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ সেখানে চরম মর্যাদা পায়, বিজ্ঞান সেখানে জীবনের সঙ্গে একাকার। সমাজের সেই ভাবী গৌরবের দিনে শিল্প-সাহিত্যেরও পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত।

হেনুরি জেমসের উপন্যাসের ভূমিকাগুলিতে আমরা এই স্বাধীনতার অভাব ও জেমসের স্বকীয় সমাধানের চমৎকার ব্যাখ্যা পাই। লেখকের স্বকীয় সুরবিস্তার কাম্য যে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজের পটভূমিগত জটিলতায় ও ভেদাভেদে সে বিস্তার হয় বারংবার বিড়ম্বিত। রূপকথায় যে স্বাধীনতা দেখি সে কল্পনার বা রূপায়ণের মুক্তি হয় ব্যাহত। জেমসের অননুকরণীয় ভাষায় :

'Yet the fairy tale belongs mainly to either of two classes, the short and sharp and single, charged more or less with the compactness of anecdote (as to which let the familiars of our childhood, *Cinderella* and *Blue Beard* and *Hop O' My Thumb* and *Little Red Riding Hood* and many of the gems of the Brothers Grimm directly testify), or else the long and loose, the copious, the various, the endless, where dramatically speaking, roundness is quite sacrificed—sacrificed to fulness, sacrificed to exuberance, if one will; witness at hazard any one of the Arabian Nights. The charm of all these things for the distracted modern mind is in the clear field of experience, as I call it, over which we are thus led to roam. . .

'Nothing is so easy as improvisation, the running on and on of invention; it is sadly compromised, however, from the moment its stream breaks and bounds and gets into flood. . . To improvise with extreme freedom and yet at the same time without the possibility of ravage, without the hint of a flood, to keep the stream, in a word, on something like ideal terms with itself. . .'

অর্থাৎ : রূপকথাকে মোটামুটি দুটি ভাগ করা যায়; একটি হচ্ছে স্বল্পকায়, প্রখর অখণ্ড, খোসগল্পের বা কেচ্ছার মতো আঁটসাট (প্রমাণ শৈশবের চেনাশোনা সব রূপকথা : সিন্ডরেলা, ব্লু বিয়ার্ড ইত্যাদি)। আরেকটি হচ্ছে দীর্ঘ, শিথিল, অপর্যাপ্ত, বিচিত্র, অন্তহীন, যেখানে নিটোলতা বিসর্জন দেওয়া হয় উচ্ছলতায়; প্রমাণ আরব্যরজনীর যে-কোনো একটি। বিপর্যস্ত আধুনিক মনের কাছে এদের বাহার হচ্ছে অভিজ্ঞতার পরিচ্ছন্ন ক্ষেত্রে যেখানে আমরা বিচরণ করতে পারি...আলাপ বিস্তারের মতো সহজ আর কিছু নয়, নব-নব যোজনার একের পরে এক পরম্পরা; কিন্তু সেও বিড়ম্বিত হয়ে ওঠে যে মুহূর্তে ধারাটি পাড় ভেঙে বন্যা হয়ে ওঠে...সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় বিস্তার করে যাওয়া, অথচ কূল ভাঙবে না, বান ডাকবে না, এককথায় ধারাটিকে বস্তুবিশ্বে আত্মসম্পূর্ণ রাখা...

এই সুরবিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আজকের শ্রেণীগত জীবনযাত্রার বাহ্যরূপ, মানবেতর ভেদাভেদ, অহেতুক সম্ভব-অসম্ভবের মানদণ্ড। আমাদের ভবিষ্যতের ছবি তাই অর্থনীতির পরের স্তরের মানবজীবনে খুঁজি, যেখানে জীববিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান অর্থোত্তর নিছক মানবসমাজের পুরুষার্থ নির্মাণে কর্মঠ। সেখানেই রিলকের নিঃসঙ্গতা ও জীবনের ঘনিষ্ঠতা একাধারে সম্ভব, সেখানেই প্রুস্তের স্মৃতির ইমারৎ, জয়েসের ভায়ার বিহার ব্যক্তিগত চেষ্টার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান প্রত্যক্ষ জীবনের মুক্তিতে মনের গভীরতর সার্থকতা পায়। কাফ্‌কার মানসিক দ্বন্দ্ব সেখানে রূপকে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন মানে না। তখনই লরেন্সের আশ্চর্য কবিত্বের অখণ্ড সত্তার স্বপ্ন বাস্তবে সম্পূর্ণতা পাবে। তাইতে সোভিয়েট দেশের মানুষ অস্ত্রভস্কির জীবন এক হয়ে যায় বীরত্বের মহাকাহিনীতে।

এ কথাটা শুধু কাব্যউপন্যাসের বিষয়বস্তুর সীমা বিস্তৃত হবে বলেই বলছি না! লেখকে পাঠকে যোগ ঘনিষ্ঠ হওয়ায় লেখকের শিল্পচর্চারই স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাবে। কনটেন্টের সীমানা সেখানে জানা বলেই শিল্পী তদ্গত হতে পারবে ফর্মের ধ্যানধারণায়। তাছাড়া মানতে লজ্জা নেই, বই বিক্রির বা লেখকদের সমাদর যে ভবিষ্যতে কতখানি হতে পারে, সোভিয়েট ইয়ুনিয়নে আমরা এরই মধ্যে তার কিছু দেখতে পাই এবং সে বিষয়ে আমরা যে কিঞ্চিৎ আগ্রহান্বিত, সেটা স্বীকার্য। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা মানুষের সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বরূপ সম্বন্ধে আমরা পাব আরো ব্যাপক জ্ঞান, আরো গভীর অনুভবশক্তি। তাই আজ কবিরাও আপন গরজে সে দীপ্ত ভবিষ্যতের নির্মাণে মন দেয়।

'The play of one's mind gave one away, at the last, dreadfully in action, in the need for action, where simplicity was all...'

অর্থাৎ : আমাদের মনের মুক্তিই, শেষপর্যন্ত আমাদের নিয়ে যায় দারুণ সক্রিয়তার বা কর্মের জগতে, কর্মের প্রয়োজনে, যেখানে সরলতাই সব...

৭

বীরবল থেকে পরশুরাম

আমাদের অক্ষমতার অনেকটা যে ব্যক্তিগতের বাইরের কারণে, বাংলা সংস্কৃতির, সমাজের, দেশের জীবনে ছড়ানো, সে বিষয়ে মোটামুটি সবাই একমত। অন্তত দেশের দুর্ভোগের ছবিটা কমবেশি স্পষ্ট তার ব্যাখ্যা আপাতবহু হলেও। বাংলার মানচিত্রই তার স্থূলপ্রমাণ, ১৯০৫ থেকে ১৯৫০-এ। আর ভাগ্যবান মুষ্টিমেয় ছাড়া কে না জানি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার গ্লানি, অপমান, অভাব, অত্যাচার। কোথায় সেই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের, মাইকেল-দীনবন্ধুর, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের বাংলা, সেই-মানস, এমনকি সেই জীবনের পুরুষার্থ। তারই মধ্যে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির শিবসদাগরের দুরবস্থা। শুধু যে সাহিত্যের প্রসারে বা মূল্যস্বীকারে তা নয়, বুদ্ধির দুরবস্থায় আজ আমরা কেউ বা বিমূঢ় ব্যথিত কেউ বা একেবারে অন্ধ। অথচ আমাদের এই অতীতহীন চাকুরিজীবী ভদ্রলোকের ছোট্টো এবং অগভীর সংস্কৃতিতেও চর্চা ছিল, চেষ্টা ছিল, সময়ে সময়ে প্রতিভার রসায়নে মহান কীর্তিও হত সূচিত।

সেই চর্চার পটেই শুভবুদ্ধির মাহাত্ম্যে একাধিক মনীষী বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত সমাজেই দুর্লভ সভ্যমানুষের বৈদগ্ধ্য লক্ষণ অর্জন করেছিলেন।

সম্প্রতি বীরবলের হালখাতা পুনর্প্রকাশিত হয়েছে, ঐ উপভোগ্য বইটির শিক্ষণীয়তা আজও ঘোচেনি। (বীরবলের লিখননৈপুণ্যে শুধু নয়, তার মধ্যে বীরবলের যে লোকায়ত মানবতা, যে প্রত্যক্ষ ও যুক্তিসহ বিচারে আস্থা এবং সে বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রতিষ্ঠায় তাঁর আজীবন যে চেষ্টা তার প্রয়োজন আজও এতো বেশি বাস্তব যে মনে হয় বীরবলের সভ্যতাপ্রচার বাংলাদেশের দিক থেকে বুঝি বৃথায় গেছে। বীরবলের হালখাতা শোনা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি পাঠ্য নির্বাচিত হয়েছে বা হবে। সুখের কথা, কিন্তু তা কতোটা বীরবলের স্মৃতির পক্ষে তা বলা শক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যব্যবস্থা, পরীক্ষাব্যবস্থা, অন্যান্য বই নির্বাচন, সাহিত্য-সংস্কৃতির রুচি ও বিচারবুদ্ধির স্থান এসব দিক থেকে বীরবলের জ্ঞান ও রুচি, বুদ্ধিতে বিশ্বাস, তাঁর সন্ধানী মনীষা বিপরীতই বটে, ধোবার উঠানে তেজী তুরাণী ঘোড়ার মতই।) অবশ্য এ বিপরীত শক্তি, ভণ্ডুল-বৃত্তি বাংলায় বরাবরই প্রবল। এরই জোরে বংগাল সরকারও রবীন্দ্রসংস্কৃতির প্রসারে নয়, রবীন্দ্রস্মৃতি-পূজার উপহাসে মাতেন, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিককে পুরস্কার দেন, আমলাতন্ত্রের হাতে আবেদনের অপমান সইতে হয় প্রার্থীদের, কাগজে বিজ্ঞাপনের কদিনের মধ্যেই লটারির তারিখ শেষ হয়, বিচারকদের নাম শিক্ষিতসাধারণদের আগে তো নয়ই, পরেও জানানো হয় না।

বীরবলের প্রায় প্রতিটি রচনাই তার প্রতিবাদী সাক্ষ্য, যার জন্যে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় নাকি বাংলার অধ্যাপক পদের যোগ্য মনে করেনি—দীনেশ সেনের পরে।(দুর্বুদ্ধির বিপরীত শক্তির বিরুদ্ধে একদা বীরবলকে লিখতে হয়েছিল। "বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ," বঙ্কিমকে নামাতে হয়েছিল পৌরাণিক ভক্তির থেকে সমালোচনার মঞ্চে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা বিপিনচন্দ্র পালকে হাস্যের বলদচক্ষু হিসাবে ব্যবহার করতে হয়েছিল মুক্ত বুদ্ধির মানবিক তাগিদেই।)

বীরবল আমাদের সেই অত্যল্প কৃতবিদ্যদের একজন যিনি উনিশ শতকের বাইরে ইংরেজি সাহিত্যের অস্তিত্বের কথা জানতেন এবং ইংরেজির বাইরে একটা য়ুরোপীয় সাহিত্যের খবর রাখতেন। ফলে তাঁরই পক্ষে সম্ভব হয়েছিল আপাতবিরোধী হলেও বাংলার ইংরেজেতর, লৌকিক সাহিত্যের শিকড় সন্ধান। তাই তিনি পদাবলী, চণ্ডী, মঙ্গল কাব্য থেকে ভারতচন্দ্র অবধি ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে—বলাই বাহুল্য গুরুচণ্ডালী না করে—উপভোগ করেন। উপভোগ করেন শুধু বিলাসী ব্যক্তির আতিশয্যে নয়, সাহিত্যিকের, বাংলা সংস্কৃতি-কর্মীর প্রাণের গরজে, শিকড়ের সন্ধানে। রুচি ও অগ্রগতির মান ছিল তাঁর মানবতায় জাগ্রত, কাজেই শিবে বানরে গোলমাল তিনি করেননি। পরিবর্তনের আভাসইঙ্গিত, ইতিহাসের ধর্ম তিনি বুঝেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী তাঁর মতো বোদ্ধা খুব কমই মেলে, তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের কীর্তিতেই বাংলার আদিঅন্ত খোঁজেননি। নাৎসি জর্মানির কাউন্ট হেরমান কেইসেরলিঙের কথা তাঁর মনঃপূত হয়নি। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের যে উৎসে ও প্রসারে মুখ্যত ইংরেজিশিক্ষিত মুষ্টিমেয় কৃত্রিম মধ্যবিত্ত এবং সময়হিসাবে শুধুই উনিশশতকী সংস্কৃতি, তার সঙ্গে তাই যোগ খুঁজেছিলেন বিস্তৃত লৌকিক শিল্পসাহিত্যের ধারার, ব্যাপকতর অতীতের ও বর্তমানের। আমাদের আগের পুরুষের "প্রগতিরহস্য" তাই তাঁকে যন্ত্রণায় হাসিয়েছিল। তাই তিনি ভবিষ্যৎ ভেবে কাতর হননি, ইঙ্গবঙ্গের ব্যাপ্তিও চাননি, হিঁদুয়ানীও চাননি। তাঁর এই চোখখোলা কঠিন সাধনার আস্থা আজও আমাদের আত্মীয় লাগে।

সাধনা যে কঠিন তার প্রমাণ বীরবল বারবার দিয়েছেন। এমনকি পরিবেশের প্রভাব পরোক্ষে হয়তো তাঁর রচনাতেও স্পর্শেছে। তারই জন্যে হয়তো ব্যঙ্গের স্রোতে তাঁর লেখনী হয়ে ওঠে থেকে থেকে অতি চপল, হাস্য হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত স্ফীত, যেমন হয়েছে "আমরা ও তোমরা"-য়। অবশ্য তাঁর পরিবেশ ছিল পরাক্রান্ত; গ্রামভারী মূর্খতা, প্রাদেশিকতা, কূপমণ্ডূকতা, যুক্তিহীন বুলি, অন্ধ বিশ্বাসের নেকড়ের পালের মধ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র। তাঁর নৈঃসঙ্গ্যে প্রায় একমাত্র আশ্রয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, একমাত্র কিন্তু প্রবল, অলোকসামান্য প্রতিভার মহীরুহ। আম বা জামে হয়তো সে কীর্তির তুলনা নয়, কিন্তু বট বা পিপুলে বটে। এবং প্রমথ চৌধুরী তা জানতেন, বহুবিস্তৃত প্রতিভার শতঝুরি ছায়ায় তিনি নিশ্চিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর রচনাবলী ও ব্যক্তি-স্বরূপকে তিনি অর্ঘ্য দিয়েছেন কিন্তু অনুকরণ করেননি, রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পাশে প্রমথ চৌধুরীর মুক্তদৃষ্টি সত্তা তাই আজো বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বিষয়। তাঁর চেয়ে দুরন্থ ও দুর্বল অনেকেই ভেবেছেন ও ভাবছেন যে রবীন্দ্রনাথ অনুকরণীয়। ভেবেছেন ও ভাবছেন যে রবীন্দ্রনাথের বাংলাসাহিত্যে রূপকর্মের উত্তরাধিকার নয়, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তাও অনুসরণীয়। এ যে শুধু মদালসের

বিলাস তা নয়, এ নকলী মানবতার সৌকুমার্য, এর আন্তর্জাতিক আত্মিক মৈত্রীর বাণী চরিত্রের দিক থেকে মারাত্মক মিথ্যা।

কারণ সে প্রচণ্ড গতি অবসান, হিমালয় সংহতিতে একক। অথবা বলা যায়, সে জলধারা লঘুবায় তুষার দেশের স্বচ্ছ নীল হ্রদে আত্মস্থ। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পপ্রতিভার সঙ্গে মেলান তাঁর মানসশক্তির চূড়াপ্রাচীর, তাঁর সমাহিত শান্ত বিশ্বাস। বঙ্কিমের মতো অপেক্ষাকৃত স্থূল ও অসংহত ধর্মাশ্রয়ী বিশ্বাস নয়; সুকুমার, মার্জিত, আরো মৌলিক, কবিকর্মের দিক থেকে ঈস্থেটিক দিক থেকে আরো সমগ্র সংহত এক অধ্যাত্ম বিশ্বাস। এর প্রচণ্ড সত্য ও সততা রবীন্দ্রনাথের অনুপম জীবনের ও সাহিত্যের সৌন্দর্যে ব্যাপ্ত, মাঝে মাঝে সমাহিত একাত্মতা তাঁর ভেঙেছে, বহির্জগৎ এসে হানা দিয়েছে বসুন্ধরার বেশে, কন্যার বেশে—যেতে নাহি দিব বলে। শেষ বয়সের কবিতায় তিনি আবার রিক্ততার, ছলনার প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন রূপনারাণের কূলে, যেখানে ছলনাময়ীর মুখে মেলে না উত্তর। তবু মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের অচ্ছোদ মানসসরোবরের নীলিমায় মাটি লাগেনি। সেখানেই তাঁর সৌন্দর্যের অপূর্বতা; তাঁর ব্যক্তিগত সামাজিক নৈঃসঙ্গ্য আত্মিক নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণায়, নেতির দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়নি, সেই তাঁর বৈশিষ্ট্য; তাই তাঁর চারিত্র্য ইয়েটসেরও প্রণম্য।

এবং এই একাত্ম অধ্যাত্ম-বিবেকে তাঁর সাযুজ্যই তাঁকে করেছে সুন্দর ও সৌন্দর্যের অনুরাগী, প্রকৃতির প্রিয় ও প্রেমিকও। সেইজন্যেই তাঁর সুন্দরে মিলেছে সত্য ও মঙ্গল। তাঁর এই অধ্যাত্মসিদ্ধি ইংরেজ সৌখীন ঈসথিট্‌দের আয়ত্তের বাইরে। এর সম্পূর্ণতা ও বহুবিধ প্রকাশে বাংলাদেশে আমাদের হৃদবৃত্তি, সংবেদ্যতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎবিষয়ে অনুরাগ, প্রকৃতির সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতির আরম্ভ ও বিকাশ যেমন সত্য, তেমনি সত্য এর ভিত্তি অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাথের ঐ অধ্যাত্মসিদ্ধির অননুকরণীয়তা। তাছাড়া, আমরা কজনই বা ভাবলোকের নিত্যস্বর্গে বসবাসের ক্ষমতা বা ইচ্ছাই রাখি বা সে লোকোত্তর আস্তিক্য চাই? আর রবীন্দ্রপ্রতিভার কাব্যপরিক্রমায় তার দরকারই বা কি? প্রমথ চৌধুরী উদারতন্ত্রী অর্থাৎ আস্তিক্যহীন বুদ্ধিবাদী থেকেই তাঁর মানবতার সমরেখায় রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মোৎসারী কিন্তু টমাস মোরের মতোই প্রকৃত মানবতার প্রসাদ মিলিয়েছিলেন।

অনুকরণের এই সমস্যাতেই এক কবিসমালোচক লেখেন যে কবিমার্গের আদর্শ হওয়া উচিত মহাকবি দান্তে, কারণ তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ মর্ত্যের মার্গে, পদচারী মানুষের অনুসরণীয় কিন্তু মহাকবি শেক্সপিয়র অনুকরণের ঊর্ধ্বে, স্বকীয় প্রেরণায় আকাশচারী।

তাছাড়া, সমাহিতি কি আমাদের সাধ্যে? ত্রিশঙ্কুত্বে কি শেষে আমাদের পরিণাম? না, আমাদের বর্তমানে আমরা ভবিষ্যৎ চাই, পরিবর্তনে আমাদের আশ্বাস? যুক্তিতে, ন্যায়বুদ্ধির মুক্ত প্রাত্যহিক পদাতিক অভিযানে চেষ্টায় আয়ত্তে আনতে চাই সমাধানের অভাব, শান্তির অনটন, অন্যায় অনর্থ নিঃশেষ করতে চাই প্রাথমিক স্বীকারে নয়, উপসংহারে? দেখা যাচ্ছে এ বিষয়ে বাদবিবাদে ঝোঁক পড়ছে দুদিকেই একপেশে, একচক্ষু হরিণ শুধু শুধু ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের উত্তরাধিকার স্বীকার করতে গিয়ে তাঁকে লেনিনের সঙ্গে তুলনা বাহুল্য, বরং টলস্টয়ের বিচারের সঙ্গে খানিকটা তুল্য

তাঁর বিচার। আবার, তাঁর বিচিত্র দান সিপাহী-বিদ্রোহের অজ্ঞাত কাল্পনিক সাহিত্যে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও অর্থহীন। সমালোচনা আজও আমাদের একান্ত প্রয়োজন। প্রমথ চৌধুরীর সমসাময়িক আবহাওয়াতে যে চেষ্টা ছিল, তা আমরা আজকের বহুবিধ সুযোগে কেন সম্পূর্ণতর করা প্রয়োজন মনে করব না?

১৩১৪ সালে বঙ্গদর্শন-পত্রে এই রকম সমালোচনার একটি সুলিখিত উদাহরণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের অনুমতিতে প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ লেখককে ডেকে আলাপ করেন এবং এ প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের জবাবে বঙ্গদর্শনেই রবীন্দ্রনাথের দুঃখ নামে ওজস্বী লেখাটি বেরোয়। পাঠকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন, বহুকাল পরের বিখ্যাত কবিতা—যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলিতে এই প্রবন্ধের মূল প্রশ্নটি কবি আবার তুলেছেন।

বলাই বাহুল্য, শ্রদ্ধেয় লেখকের সমস্ত মতামত হয়তো আমাদের পক্ষে ঠিক ঐভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অক্ষয়বাবুর সতর্কবাণীর পুনরুক্তি করে, আবার বলা ভালো, মহাকবির সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ অবতারণায় তাঁর জীবনবেদ গ্রহণের কথা নেই; যেমন নেই বঙ্কিমের কোন সার্থক উক্তি উদ্ধৃতিতে বঙ্কিমকে সমালোচনা বর্জনের নীতি।

একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধ্যাত্মঅন্বয়ে সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁর পটভূমিতে, পারিবারিক ও সামাজিক। এবং পরোক্ষ সাহায্য পেয়েছেন উপনিষদের যে দিকটা কর্মকান্ডহীন আধ্যাত্মিক, ঈস্‌থেটিক, সেই উৎসে। বৈষ্ণবকাব্য ও বাউলসাধনা তাঁর সমন্বয়ে সহায় ছিল। কিন্তু তাঁর মূল সহায় ছিল প্রকৃতি, নিসর্গপ্রকৃতি। ঠিক ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের প্রকৃতি নয়, কারণ তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ স্বকীয় স্বতন্ত্র, কারণ বাংলাদেশে যন্ত্রবিপ্লব আঠারো শতকের শেষে ইংলন্ডের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কারণ ভারতীয় ধর্মসাধনা ইংলন্ডের গির্জাসাধনা নয়। কিন্তু সেইরকম প্রকৃতি-ঘটিত গভীর একটা অভিজ্ঞতাই, যার অঙ্কুর সদর স্ট্রীটেই কিন্তু বিকাশ পদ্মার চরে চরে। তাই তিনি বলেছিলেন শুধু সাহিত্যিক হলে হয় না, দাঁড়াতে হলে চাই আর কিছু আবেগ, একটা প্রিডমিনেটিং প্যাশন্‌, আমি কবি হিসাবে দাঁড়িয়ে গেলুম প্রকৃতিকে ভালোবেসে; মানুষকেও আমি ভালোবেসেছি, কিন্তু প্রকৃতিই আমাকে বাঁচিয়ে দিলে। এই অধিষ্ঠাতা আবেগ ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান; তাঁরই গানে কবিতায় গদ্যে প্রকৃতি এল আমাদের ইন্দ্রিয়বেদনে, নানারূপে, চোখে কানে হৃদয়ে চিন্তায়।

সে প্রকৃতি মুখ্যত হিংস্র নয়, হিংস্র হলেও শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধ নয়; তার কারণ এ নয় যে প্রকৃতি, এ প্রকৃতি পশ্চিম য়ুরোপের মতো মানুষের প্রায় পোষা প্রকৃতি, কারণ রবীন্দ্রনাথের এ প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত একাত্ম, ঈশ্বরেরই অর্থাৎ এক হিসাবে নির্বিশেষ মানুষেরই বাহির-রূপ। জীবন তাই তাঁর কাছে মৃত্যুর প্রতিবাদ নয়, পরিপূর্ণতা। তাই মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে ট্রাজেডি নয়, ট্রাজেডির ঊর্ধ্বে। ট্রাজিক দৃষ্টিতে জীবন বিরুদ্ধশক্তির সংঘাত, জয়পরাজয়। তাই ক্রিস্টোফর হিলই লিখতে পারেন : ইতিহাস তো ট্রাজেডির উত্তরণপরম্পরা। হ্যামলেটের মৃত্যুর পরেও ডেনমার্ক থাকে, দেশবাসী থাকে, ফর্টিনবাস থাকে, হোরেশিও-ও। অবশ্য ব্রহ্মণ্যচিন্তায় জীবনের উপমা ট্রাজেডিতে দুর্লভ, উপমা মেলে মাস্কে, প্যাজেন্ট্রিতে। জাতিভেদ, জন্মান্তর, কর্মফলের নিরাপত্তা ব্যবস্থায়

তাইতো সম্ভব। প্রতিবাদের প্রতিষেধকও আছে; কারণ সবই তো এক, পরমাত্মার অংশ, তোমার অনাহার ও আমার ভূরিভোজজনিত অজীর্ণ আখেরে অভিন্ন। যে আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণশূদ্র, কর্তা-দাস ব্যবস্থায় এই একাত্মদর্শনের অনীহার ভিত্তি, সে বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা চর্চা করবেন। অবশ্য সে চর্চায় সংক্ষেপে করায় বা সত্যের অপলাপে লাভ নেই, যার ফলে ডাঙ্গে-র বৈদিকযুগের উপর বইটি প্রশংসনীয় চেষ্টার নমুনা হলেও এঙ্গেলসের কথার যান্ত্রিক প্রয়োগের ফাঁকিতে স্থানকালপাত্রজ্ঞানের অর্থাৎ ইতিহাসের অভাবে বিপজ্জনক সরলীকরণ।

মুস্কিল হচ্ছে আমাদের ইতিহাস মোটেই সরল নয়, তাতে কালের ও নানা পাত্রের নানান জট, এবং সে জট খোলবার জ্ঞান সমধিক প্রয়োজনীয় হলেও তথ্য কম এবং পণ্ডিতদের ধৈর্যও দুর্লভ। তাই ডাঙ্গে বামের সোজাপথে চলে দিশাহারা, সমস্ত বৈদিক যুগটি তাঁর কাছে পরিবর্তন বা বিবর্তনহীন একটি স্থাবর মুহূর্ত, পুরন্দর ইন্দ্র গোষ্ঠীদেবতামাত্র, লোহা ও ঘোড়ার কোনো ঐতিহাসিক তাৎপর্য নেই, মুদ্রা বা যজমানপ্রথা বা বশিষ্ঠের জুয়াড়ীসমস্যা ডাঙ্গের পক্ষে ওঠেই না, অনার্য-আর্য সমস্যা তিনি সরল করেন অনার্যের প্রমাণ নেই বলে বাদ দিয়েই।

আমাদের কাছে ব্যাপারটা জরুরি হয়ে দাঁড়ায় যখন এবংবিধ আরোপ রচয়িতা বা সৃষ্টিশীল সাহিত্যে জারি করা হয়। এই সাহিত্যিক আরোপের তলাতেও ঐ সরলীকরণ, তা সে কি বঙ্কিম কি রবীন্দ্রনাথ আলোচনায়। কখনো বা এই সরলীকারী টোটকাপ্রয়োগের সঙ্গে মেশে আপাতজ্ঞানী তোতাবুলিও। কিন্তু তাতে গালন্দাজ ইচ্ছা পূরণ ছাড়া সাহিত্যে প্রগতির কিছু সুরাহা হয় না। কোনো বিশেষ লেখকের বিচারে কি দ্রষ্টব্য তাই এ সমালোচকরা অহমিকার ও থিওরির মিশ্রণে ভুলে যান এবং সাহিত্যের প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রে নিমেষপাতই করেন না। অথচ যেমন ইতিহাসে, তেমনি স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্যবিচারেও জট আমাদের খুলতে হবে, সঙ্গত দৃষ্টির ও আপেক্ষিক উক্তির জটিল ও ধৈর্যশীল পথেই আমাদের ভবিষ্যৎ, যান্ত্রিক প্রয়োগের লোভে বা ভাববিলাসের আশু-তৃপ্তিতে দক্ষিণ থেকে বাম, বাম থেকে দক্ষিণাচারে যেন আমরা না ভুলি।

তাঁর মূল্যবান মহাভারত ভূমিকায় রাজশেখর বসু বলেছেন : তাঁরা শ্মশান-বৈরাগ্য প্রচার করেননি, বিষয়ভোগও ছাড়তে বলেননি, শুধু এই অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়ম শান্ত চিত্তে মেনে নিতে বলেছেন।

> সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রায়াঃ।
> সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্॥

সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। মানুষ অদৃশ্যস্থান থেকে আসে, আবার অদৃশ্যস্থানেই চলে যায়, তারা আপনার না, আপনিও তাদের নন।

এই শান্ত কর্মৈষণাতেই আমাদের ভারতঅন্বেষার আরম্ভ, আমাদের ইতিহাস-সন্ধানের সূত্রপাত, পরিবর্তনের, দ্বন্দ্বের, বৈপরীত্যের গ্রহণে। অবশ্যই অধ্যাত্ম-সান্ত্বনাতেও মহাভারত জর্জর, তবু তাতে ধৃতরাষ্ট্রের টাইরেশিয়স্-শোভন বিলাপ আছে, গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র দর্শন আছে, যদুবংশ ধ্বংসের অপরূপ রূপক আছে। ট্র্যাজিক চরিত্রে ও নাট্যে মহাভারতের যে বিস্রস্ত ঐশ্বর্য তা সৌতি

ধোঁয়োরাও চাপা দিতে পারেননি। একাত্মসাধনার সঙ্গে সঙ্গে এই ভেদবিরোধ ও তার ফলে করুণ বিয়োগ আমরা মহাভারতে পাই। ঐ প্রথমটির প্রভাবেই তো অর্জুন স্টেটাস্ ক্যো-র বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কোনো সার্থকতা খুঁজে পাননি, তাই সে সংকটে আজগুবি উদ্ভব, একাত্ম সমাধির সঙ্গে অনেকাত্ম বাস্তবজীবনের বিরোধের, যুদ্ধের বর্ণসঙ্কর দর্শনের মহাকাব্য। যুদ্ধ অবশ্য হল, নির্বিত্ত পাণ্ডবের জয়ও, কিন্তু অর্জুন আবার ভুলে গেলেন গীতার উপদেশ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নির্বাহ তাহলে গীতার শুদ্ধ জ্ঞানে নয়, ক্ষাত্রস্বার্থের তাগিদেই গীতার সাময়িকতায়।

মহাভারতের মতোই আমাদের ঐতিহ্যের অনেক কিছুই মিশ্র। অনড় ঐতিহ্য বাস্তব হয়ে ওঠে আমাদেরই বিশিষ্ট অন্বেষায়, বিশিষ্ট উত্তরাধিকার ব্যবহারের নির্দিষ্ট প্রয়োজনে, প্রস্তুতিতে, বিন্যাসে। এবং সে বিন্যাসকে সরলী-করণের অঙ্গীকার জীবনের বাস্তবতায় নেই। এমনকি সাহিত্যিক সরলীকরণেও নয়। চণ্ডী বা আলাওল বা মঙ্গলকাব্যে যে দেশজ বাস্তবতা ধর্মের প্রলেপ এবং সংকেতিত মার্গ সত্ত্বেও পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের শিল্পোৎকর্ষের সঙ্গে বা প্রকৃতিপ্রেম বা আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে সমপর্যায়ে তার তুলনা অর্থহীন, কিন্তু ঐতিহ্যের নির্মাণে তার সন্ধানও দরকার। এমনকি ঐ ধর্ম ও সংকেতিত মার্গের মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায় লৌকিক মনের সৃষ্টিময় বিরোধের ইতিহাস, আপোষ কিন্তু সংঘাতের আর্তিতরও আভাস। ঐ বাস্তবতার মানসাধিকারই দীনবন্ধু মাইকেল কালীপ্রসন্নের রিয়ালিস্‌মের শিক্ষিত ধারার নিহিত দেশজ ফল্গু—আর্নল্ডের সেই আরাল হ্রদের অন্বেষায় বালুচড়া আমুদরিয়ার মতো, আজ যার স্রোত কাশ্যপসাগরে—ইলিনের ভাষায়, মানুষ আর পাহাড়ের মিলন-সংগঠনে। সে সংগঠনে বীরবল-প্রমথচৌধুরীর তীক্ষ্ম মনন মূল্যবান সহায়, সে কাজে যুক্তিবাদী পরশুরাম-রাজশেখরবসুর পরিমিত হাস্য ও পরিমিত জিজ্ঞাসাও আমাদের পথের খোরাক।

আমাদের এই সন্ধান দরকার, কারণ আমাদের দেশে য়ুরোপের পণ্যবিপ্লব হয়নি, বুর্জোয়াসির বিকাশও হয়নি, আমাদের জাগৃতি অসম্পূর্ণ, মৌলিক নয়, বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। তাইতো উপন্যাস আজও আমাদের সাহিত্যে ঠিক ভিৎ পাচ্ছে না, তাই আমাদের সঙ্গীত আজও একসুরাশ্রয়ী সরলরেখা, আমাদের চিত্রশিল্প দ্বিমাত্রিক, নগরস্থাপত্য অস্তিত্বহীন। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের মধ্যে কতো বড়ো প্রতিভার ব্যতিক্রম, তাতো আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, সাংস্কৃতিক সামাজিক জীবনের দিকে তাকালেই, ব্যক্তিগত স্থূলতার কথা ভাবলেই স্পষ্ট হয়ে যায়—আমাদের লজ্জায় ও গ্লানিতে।

অথচ আমরা ঠিক আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার আদিম মানুষ নই। দীর্ঘ ও জটিল ঐতিহ্যের দায়ভাগ আমাদের লৌকিক শিল্পসংস্কৃতিতে আজও মেলে। সে দায়ভাগের জোরে আমাদের জনপদনির্মাণ পশ্চিম য়ুরোপের অনুকারী না হলেও চলে। সেখানকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন এখানে যথার্থ নয়, আমাদের লোক-জীবনের দায়ভাগে রিয়ালিসম্ নেচারেলিসম্ সিম্‌বলিজম্ প্রভৃতির লড়াই অলীক। বাস্তবতা এবং প্রতীকমার্গ বা একস্ট্রাক্টরীতি আজও আমাদের সাধারণ মানুষ সহজেই মেলাতে পারে। সেই জন্যেই এলিক ওয়েস্টের মনে হয়েছে যে আমাদের সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতির পথ পশ্চিম য়ুরোপ থেকে ভিন্ন,

এক হিসাবে আরো সহজে সার্থক, কারণ আমরা রেনেসান্সের সম্পূর্ণ সুযোগ যেমন পাইনি, তেমনি লৌকিক শিকড় আমাদের একেবারে মরেনি। মরা-না-মরা অবশ্য আমাদেরই হাতে। কোনো কাল্পনিক দামোদরভ্যালি করপোরেশনের নয়। কিন্তু জলের সন্ধান ছেড়েও নয়।

৮

রাজায়-রাজায়

রাজায় রাজায় লড়াইয়ে মুস্কিল হয়েছে সাধারণ সাহিত্যিক ও সাধারণ পাঠকের, জনসাধারণের রুচিতে হয়েছে সমুদ্রমন্থন। সাহিত্য-সমালোচনায় বিশেষ বিশেষ রাজনীতির স্বকপোলপ্রযুক্ত মতবাদের বা ব্যক্তিগত কোনো নীতির মানদণ্ড পরিচালনা দেখে আমরা কমবেশি বিমূঢ়। প্রথমত, মতবাদগুলিতে যথেষ্ট বিজ্ঞানমূলক স্বচ্ছতা নেই, দ্বিতীয়ত, না সমাজ না সাহিত্য বিচারে বা উভয়তই এ বর্জন-নীতি ও অশ্রদ্ধা কোনো বিকাশের অনুকূলও নয়। এবং যে সমালোচনায় সাহিত্য-রচনার ধারা বা পাঠকমনের কোনো বিকাশে সাহায্য নেই, সে সমালোচনার ধারাও পুনর্বিবেচ্য।

উদাহরণ স্বরূপে এবং একটি উদাহরণ স্বরূপে বুদ্ধদেব বসুর ইংরেজ পাঠকের জন্যে লেখা আধুনিক বাংলাসাহিত্য বিষয়ে মূল্যবান বইটি ধরা যেতে পারে। বুদ্ধদেববাবুর দীর্ঘ সাহিত্যিক নিষ্ঠা ও সাহিত্যসৃষ্টি আমাদের শ্রদ্ধার বস্তু, তাঁকে অসম্মান করতে আমি অক্ষম। কিন্তু দলীয়তা ও রাজনীতির কল্পিত বিকারে ও প্রতিবিকারে তাঁর 'শুদ্ধ' সাহিত্যবাদও যে কিরকম ভারাক্রান্ত, তার লক্ষণাভাস দেওয়া যে সাহিত্যিক কর্তব্য, সেই বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রবীন্দ্রনাথেই বুদ্ধদেববাবুর 'এন একর অফ গ্রীন গ্রাস' আরম্ভ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আশ্চর্য সম্পূর্ণতার যে তিনি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন, তাতে যেমনি খুশি হয়েছি বুদ্ধদেববাবুর সাবেক ও পীড়াকর রবীন্দ্রবিরোধিতার প্রায়শ্চিত্তে, তেমনি খুশি হয়েছি স্বমতেরই সুষ্ঠু প্রকাশে। রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড প্রতিভা ও বিরাট বিকাশের সঙ্গে প্রাকৃতিক ঘটনা ছাড়া আর কিসের তুলনা করা যায়? কয়েক বছর আগে ভারতীয় প্রগতিলেখক সম্মেলনের জন্য আমিও তাই করেছিলুম। বুদ্ধদেববাবুর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও উন্নাসিক লেখকও সে কথা বলায় আত্মপ্রসাদ স্বাভাবিক। ইংরেজ কবি চসরের তুলনাটিও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মহত্ত্ব বুঝতে সাহায্য করে। ঐ প্রবন্ধে তার সঙ্গে আমি অবশ্য জর্মান্ গয়টের উপমাও পাঠকদের কাছে প্রস্তাবিত করি।

বুদ্ধদেববাবু ঠিকই বলেছেন যে বাংলার স্বল্পকায়—কিন্তু হয়তো গভীর—ঐতিহ্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের বিরাট আবির্ভাব একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। এ প্রচণ্ড আবিষ্কারে আমরা যদি দিশাহারা হই তো সে মার্জনীয়। আমার এ সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে এ প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসাধ্য, যদিও সাতবছর কেটে গেল সে প্রচণ্ড গতি অবসান। অথচ তাঁর তুলনা অন্য সাহিত্যেও ঠিক পাওয়া যায়

না। একদিকে চসর অন্যদিকে গয়টে বা হ্যুগো মিলিয়ে হয়তো খানিকটা ঐতিহাসিক তুল্যাভাস দিতে পারেন। তাঁর কীর্তিতে বাংলা সংস্কৃতির অপরিসর কিন্তু তীব্র সুরে এল অনেক বিন্যাস, তাঁর প্রতিটি বই টেকনিকের পদক্ষেপে স্পষ্ট প্রগতি ও বিষয়বস্তুর সীমান্ত বিস্তার। তাছাড়া তিনি আমাদের শেখালেন শালীনতা। মার্জিত রুচির এ উত্তরাধিকার অস্বীকার আর কোনো গোঁড়ামিতেই সম্ভব নয়। বাংলার প্রাদেশিকতায় তিনি আনলেন প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে বিশ্বের মানদণ্ড। কবি-রোমান্টিকের পরিবর্তন-অভীপ্সা ও রোমান্টিক বিদ্রোহের তেজ ও পুনর্নির্মাণের শক্তি, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম সৌকুমার্য ও পেলবতা তাঁরই দান। সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন যে নিছক সৌন্দর্যের চেতনা, সেই প্রাথমিক অঙ্গীকারও রবীন্দ্রনাথেই হল প্রথম প্রতিভাত। ভিক্টোরীয় চরিত্রের বলিষ্ঠ সততা, শিল্পকর্মের দায়িত্ববোধ ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধও রবীন্দ্রনাথের রচনা। ব্যক্তির যে স্বকীয়তাবোধ, সেনস্ অফ প্রাইভেসি, তাও রবীন্দ্রোত্তর সমাজেই বাংলার মানসে স্পষ্টতর। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যই ছিল তাঁর ব্যাপক কর্মক্ষেত্র, তবু তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ ও কীর্তির তুলনা নদীর ক্ষেত-ভাসানো স্রোত নয়, সংহতসত্তা একক হিমালয়ের হ্রদেই তাঁর উপমা, যেখান থেকে অবশ্য খাল বয়ানো যায়, বিদ্যুতের নিয়ন্ত্রণঘর গড়া যায়।

বুদ্ধদেববাবু চমৎকার বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের তৃপ্তিহীন প্রাণময়তার অশীতিবর্ষব্যাপী সমগ্রতা। এই প্রাণময় অগ্নিতেই টেকনিকের নবনববিকাশে বিষয়ের দুর্বার প্রসার, এই দীপ্তগীতে একা একা সে অগ্নিতে সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন—শেষটা তিনি চরম স্বচ্ছতায় তাঁর পটভূমি প্রায় পিছনে ফেলে আমাদের আধুনিক জীবনের মহত্তম কবি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাংলার মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় আপন মহত্ত্বে বারবার বাহু নামালেও মূলত তা বহু ঊর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ—প্রায় যেন কোনো প্রাকৃতিক মাহাত্ম্যের মতো।

রবীন্দ্রনাথের কীর্তিবিবেচনায় তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য স্বীকারে তাই আসলে তাঁকে শ্রদ্ধাই হয় সম্পূর্ণ। বাংলার ঐতিহ্য ও তাঁর প্রতিভা দুইই এ সংজ্ঞাসম্পূরণে অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য হয়। বুদ্ধদেববাবু যে কবিত্বশোভন বাক্যে বলেছেন যে, 'তিনি সৃষ্টি করলেন ভাষা, গদ্য ও পদ্য দুইই।' সেটা নিশ্চয়ই তাঁর পৌরাণিক অসতর্কতা, যেমন তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চসর, সেক্সপীয়র, ড্রাইডেন, বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদকবৃন্দ, ওয়্যাট্, সারে, স্পেন্সর, মার্লো, শেলি, সুইনবর্ন থেকে তরুণ বয়সের এজ্রা পাউন্ড অবধি। নিশ্চয়ই তিনি মার্লোর ও সেক্সপীয়রের দুর্ধর্ষ গ্লানি ও উল্লাসের ঝঞ্ঝামত্ত নাম অসাবধানেই জুড়ে দিয়েছেন? নাহলে স্কটের সঙ্গে তুলনায় ক্ষান্ত না হয়ে তিনি কি করে রবীন্দ্রনাথের 'মোর অ্যাবানডান্ট্' শিশুকাব্যে ব্লেকের ইনোসেন্স্—শুধু ইনোসেন্স্ নয়, ব্লেকের ইনোসেন্স্ মিশ্রিত পেলেন 'উইথ অ্যান অলমোস্ট্ সফিস্টিকেটেড হিউমর'-এ?

আসলে বুদ্ধদেববাবু সর্বদাই কাব্যরচনায় ন্যায্য অতিকথনের ভক্ত কিন্তু আজকাল ঐতিহাসিক তথ্য নিয়েও তিনি আকুল। তাইতো তিনি বঙ্কিমের নিজেরই গদ্যের ক্রমবিকাশের তথ্যটা চেপে গিয়ে বঙ্কিমের 'স্টিফ ফর্মালিজ্ম্' বলে দুটি শব্দে তাঁর বিচার সারেন, রবীন্দ্রনাথের গদ্যকর্মেডিকে বলেন, 'আরলি

শেক্‌সপীরিয়ন ইন টেম্‌পার' অথচ মাইকেল দীনবন্ধুর যে প্রাক-শেক্‌সপীয়রীয় মেজাজ কমবেশি বাংলা নাটকে চলেছিল, সে বিষয়ে একবারও ভাবেন না। শুধু রবীন্দ্ররচনাবলীতেই তিনি পান এলিজাবিথান্‌ 'মাল্‌টিপ্লিসিটি'—ইরাস্‌মস্‌, মুর্‌, ড্রেক্‌, রলে, বেকন, হুকর-মুখর, সেনেকো,, মনটেন, মাকিয়াভেলি, মিরাকল্‌, মরালিটি-আন্দোলিত; ব্যারন্‌ ব্যবসায়ী সমুদ্রযাত্রী এলিজাবিথান্‌-দের বহুধাবৈচিত্র্য। কিন্তু সেই নব্য য়ুরোপের বহুমুখিতাকে আবার তিনি দেখেন রবীন্দ্ররচনাবলীতে 'ইউনিফায়েড' এবং কিসে একীকৃত? না ধর্মে। তাই কি তিনি পান রবীন্দ্রনাথে শুধু 'সুইট ওঅর্‌ম্‌থ্‌'? অবশ্য বুদ্ধদেববাবু মিষ্টির ভক্ত, তিনি আরনল্ডে-র গদ্যে পান 'সুইটনেস অফ্‌ স্টাইল' এবং মণীন্দ্রলাল বসুতে পান 'এ সুইট ল্যাঙ্গুইউ অ্যাটমস্‌ফিয়র'।

কিন্তু এ ভুল শুধু বুদ্ধদেববাবুর একার স্বেচ্ছাচার ভাবলে ভুল করা হবে; হিসটরিক্যালি, হি ইস আওয়ার এলিজাবিথান রেনেসান্স,' বুদ্ধদেববাবুর একথা তিনি যাদের সাহিত্যের কুলে প্রহ্লাদ মনে করেন, সেই বঙ্গীয় বামপন্থীরা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, কোন জাগরণের পুনরুত্থান? কোন ঐতিহ্যের রেনেসান্স? ইংরেজি শিক্ষা কতোখানি জাগাল আমাদের কোন অতীতটিকে? কতোখানি কিভাবে জাগাল আমাদের সভ্যতার ছকের ঐতিহাসিক উপলব্ধি? আমাদের মুষ্টিমেয় খণ্ডিত ও ত্বরাগ্রস্ত জীবনযাত্রায় যে মুখ্যত চাকরিঘটিত পরিবর্তন এল তা কি য়ুরোপের সামুদ্রিক ব্যবসায় ও যন্ত্রশিল্পমূলক সভ্যতার তিন শতাব্দীব্যাপী বিকাশের সঙ্গে তুলনীয়?

এইসব প্রশ্নের সম্ভাবনাও যদি মনে না আসে তাহলে অবশ্য উত্তর পাবার জন্যে চিন্তাও ওঠে না। এবং ফলে বাংলা বিচার ও ঐতিহাসিক তথ্যসন্ধান অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ফলে মনে হয় যে দশ-এগারো শতক থেকে অষ্টাদশ উনিশের অর্ধেক অবধি বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যও ছিল না, বাংলাদেশও ছিল কি না সন্দেহ। তাই বুদ্ধদেববাবু রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর একক প্রতিভায় দোসর খোঁজেন এবং ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, দীনবন্ধু কিয়দংশ বঙ্কিমেরও লোকায়ত দান অস্বীকার করেন, শেষোক্ত তিনজনের সাহিত্যিক বিচার না হয় ছেড়েই দিলুম।

শুধু চসরের সঙ্গে তুলনাটিই যদি তিনি আরো মনোযোগ দিয়ে চর্চা করতেন, তাহলে হয়তো ইংরেজি সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটে অধিকতর সুলভ জ্ঞানে বাংলার পটেও তিনি কল্পিত আরোপ থেকে বিরত হতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চসরের মুক্তি যেমন ইংরেজি কাব্যে একান্ত সত্য, তেমনি সত্য সে মুক্তির ফরাসী ইতালীয় আকাশ, তেমনি সত্য তার নির্বিরোধ গতানুগতিকের পরিগ্রহণ। আবার অন্তর্লীন ইংরেজি মেজাজের—গাওয়েন এন্ড্‌ দি গ্রীন্‌ নাইট ও পার্লের লেখক বা ল্যাংল্যাণ্ড যার ব্যর্থ অর্থাৎ আংশিক কিন্তু প্রকৃত উদাহরণ—পরিপাকও তখন পরিণতির পথে অর্থাৎ চসরের প্রতিভার পক্ষে অনুকূল ও অন্যোন্যসম্পূরক। বুদ্ধদেববাবু চসরের এই সার্থকতা ও সীমার উভয়মুখিতা বিষয়ে একচক্ষু। ফলে তিনি ভাষাতত্ত্বেরও পক্ষে হাস্যকর উক্তি করে বসেন—

'Rabindranath is the most metaphorical writer in a highly

metaphorical language... Bengali is partial to this habit of thought, but English, in spite of Shelley and Swinburne (!) is different; it is a level language, moving in logical sequences.'

অথচ তিনিই অন্যত্র বাংলায় ক্রিয়ার দুর্বলতা ও দারিদ্র্য আলোচনা করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে ইংরেজি ক্রিয়ার অফুরন্ত ঐশ্বর্যে ইংরেজিই উৎপ্রেক্ষাময় ভাষা, চসর্-পূর্ব ইংরেজিতে সন্ধির অভ্যাস, প্যারালেলিসম্ ইত্যাদির প্রাচুর্যের ধারাও ইংরেজির উৎপ্রেক্ষাময়তার একটা কারণ। সম্ভবত বুদ্ধদেববাবু উৎপ্রেক্ষা ও উপমায় প্রভেদ দেখেন না, তাছাড়া ইতিহাস তাঁর হাতে কলের পুতুল মাত্র। তাই বাংলা গদ্যের বিষয়ে যে গদ্য প্রথম পৃষ্ঠায় দেখি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন তার বিষয়ে তিনি কাল ও পাত্রের পূর্বাপরহীন এই মন্তব্য করেন—

'Midwifed by Rammohan Roy, nursed by Iswarchandra Vidyasagar, baptised so to say, by the morning-memorable (as we say in Bengali) Serampore missionaries...'

সেইজন্যেই বোধহয় অবনীন্দ্রনাথের শিশুগল্প ও অন্যজাতীয় রচনার অসামান্য প্রতিভা যে বাংলা গদ্যে কি ঐশ্বর্য দিয়েছে, সে বিষয়ে তিনি অতর্কিত। অথচ ঐতিহাসিক মনোভঙ্গী বুদ্ধদেববাবু প্রকাশ করেছেন বারবার। তিনি ইংলণ্ড ও বাংলার সম্বন্ধনির্ণয়ে লেখেন—

'Bengal alone, not the whole of India, nor any other part of it... The rest of India, in those early days of disorder, was hostile, cold, crustaceous, only Bengal absorbed Europe with a speed and thoroughness that should be marked as a record in human relations.'

তিনি সাম্রাজ্যপত্তনের এই দশের মধ্যে একের গভীর প্রেমের কারণও দেখিয়েছেন :

'The truth of the matter seems to be that the Bengali and the English, severe strangers in appearance have an inner *congenital affinity*... the minds of the *two peoples,* the Bengali and the English, moved to the same rhythmic pattern.'

শেষের উক্তিটি বুদ্ধদেববাবু সজ্ঞানেই করেছেন নিশ্চয়ই; হয়তো তাঁর মতবাদ তাঁকে এই ইঙ্গবঙ্গীয় বিলাপে, ইংলণ্ডস্ ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া-র এই বিলম্বিত নবভাষ্যে প্রেরণা দিয়েছে। মতবাদের বিপদই এই, সেইজন্যেই তো মার্ক্স-এঙ্গেলস্ মতবাদের শূন্যাচারিতা বা যান্ত্রিকতার প্রবণতার বিষয়ে ছিলেন অতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি। মতবাদঘটিত এবংবিধ স্বপ্নপ্রয়াণ অন্যত্রও দেখা যায়। যেমন

কিছুকাল আগে অসামান্য কুশলী শিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেন যে তাঁদের সঙ্ঘে যোগ না দিলে নাকি প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা অসম্ভব। মাণিকবাবুদের কথাতেও দেখি এই স্বপ্নাদ্য ধারণা, তফাৎ এই যে মাণিকবাবুরা ভাবেন যে বাঙালী ও সোভিয়েট মন আজই একই ছন্দে চলেছে। ইতিহাস নিশ্চয়ই অন্য কথা বলে, মাণিকবাবুও কি আর সজাগ মুহূর্তে জানেন না যে বাংলাদেশ ও সোভিয়েট য়ুনিয়নে জীবন ঠিক এক নয় তথা সোভিয়েট সঙ্ঘ ও মাণিকবাবুর সঙ্ঘও তুল্যমূল্য নয়?

মতবাদের উগ্রতায় অবশ্য সত্যমিথ্যা হয়ে যায় একাকার, এঙ্গেল্‌সের আণ্টি-ডুএরিঙের শেষ কথায় বাকি থাকে 'মেনট্যাল ইনকম্‌পিটেনস্‌ ডিউ টু মেগালোম্যানিয়া'। এ আত্মসর্বস্ব উগ্রতায় সাহিত্যবিচার তো ব্যাহত হবেই,

'As for the aesthetic side of education, Herr Duhring will have to fashion it all anew. The poetry of the past is worthless... Let him not tarry with it! The economic commune can achieve the conquest of the world only when it comes in at the double in Alexandrine rhythm, reconciled with reason.'

এবং এ উগ্রতার তাল কখনো ডাইনে কখনো বামে। মিলটা এখানে কম নয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত হাকিমের কাজ করেন এ নিয়ে মাণিকবাবু যেমন তাঁর ডুএরিঙ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে যৌনবিকার বিষয়ে বহু অপ্রাসঙ্গিক ও অশোভন আলাপ করেছেন, তেমনি বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন যে, অচিন্ত্যবাবুর সাহিত্য-বিচারে একটা ত্রুটি দ্রষ্টব্য—'দি ওব্‌লিগেসন্‌স্‌ অব এ গভর্নমেন্ট অ্যাপয়ন্টমেন্ট,' যার জন্যে তাঁকে মফস্বলে থাকতে হয়। বুদ্ধদেববাবু মাণিকবাবুর বিষয়েও লিখেছেন—স্বল্পকায় বইয়ের পক্ষে সর্মাধক মাত্রায়, পুরো দুপৃষ্ঠা ধরে—

'Like the great quantities of verse and fiction (if we must call them so,) being written in Bengal at the moment merely to illustrate some particular political doctrine.'

মাণিকবাবুর গত কয়বছরের রচনাবলী নাকি ভীষণ বিকৃত! মাণিকবাবু নাকি আজকাল নিউরটিক ও সেক্‌সুয়াল পারভার্টস্‌ ছাড়া আর লেখেনই না। এ ভাইরস মাণিকবাবু প্রতিভাবলে দূর করবেন, বুদ্ধদেববাবু নাকি এ আশা করেছিলেন কিন্তু মাণিকবাবু বোধহয় 'প্রিডিসপোসড্‌ টু দি ডিস্‌ইজ' ইত্যাদি এবং উপসংহারে

'Now it is a maniac instead of a moron, libertine instead of a lout, criminality instead of imbecility...'

যে উগ্রতায় মাণিকবাবুর বিষয়ে এই নির্বিচার উষ্মা সেটা নিছক সাহিত্যিক ভাবতে বিশ্বাস হয় না। এই উগ্রতার জন্যেই বোধহয় বুদ্ধদেববাবুর নাতিহ্রস্ব কবিদের তালিকায় অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র

রায়, মঙ্গলা চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য বাতিল? যেমন গল্পের তালিকায় ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমেশ সেন, নরেন্দ্র মিত্র, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা প্রভৃতি অপাংক্তেয় কিম্বা নাটকে বিজন ভট্টাচার্যের নাম অনুচ্চার্য। সেই জন্যেই কি জ্যোতির্ময় রায়ের গল্পের বিষয়ে তিনি দুটি শব্দ 'ব্লান্ট্ ভিগার' পেলেন এবং তাঁর হালকা প্রবন্ধের বিশিষ্ট স্থান উল্লেখই করলেন না? তাই কি বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধায় নামাবলীতে স্থান পাননি?

এই যে দলীয় বা রাজনীতিগত রোষদুষ্ট জাতিবিচার এ বুদ্ধদেববাবু কি করে তথাকথিত বামপন্থী সমালোচনার প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করেন? তবে তথ্যের উপরে অবজ্ঞা তাঁর মধ্যে মধ্যে মাণিকববাবুর মতোই প্রবল। মাণিকবাবুর পক্ষে লিখতে কোনই দ্বিধা হয়নি যে অচিন্ত্যকুমারের কলম নাকি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল মধ্যে, তারপরে হাকিমীর আকস্মিকে পূর্ববঙ্গে গিয়েই নাকি তাঁর কলম গেল খুলে। বুদ্ধদেববাবুও অনুরূপ উদ্ভাবনীশক্তির নমুনা দিয়েছেন। মাণিকবাবু যেমন তাঁর কল্পিত প্রতিপক্ষের গোর্কিবিষয়ক বুর্জোয়া বাক্য সম্পূর্ণভাবে, দুর্নীতিমূলকভাবে বিকৃত করে তাকে উদ্ধৃতির চেহারা দিতে পারেন, বুদ্ধদেববাবুও প্রায় তেমনি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে আজকাল কবিতা লেখেন না, তার কারণ তাঁর বিশেষ রাজনীতি, একথা অম্লানমুখে লিখতে পারেন—যদিও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কয় বছরের নীরবতার বিষয়ে তিনি শোভনভাবেই নীরব।

এই দুই উগ্র মতবাদই সাহিত্যের স্বাধীনতার প্রতিকূল। হয়তো এ সব মতবাদ 'মতবাদ' মাত্র, ব্যক্তিগত রুচি-অভিরুচি বন্ধুত্ব বা দলাদলির ভাবকল্পলীলা বা পরলোকিকতত্ত্ব। যে বৃহৎ অর্থে সমাজ সাহিত্যে বিবেচ্য সে সম্পূর্ণতা যেমন এসব লীলায় দুর্লভ, তেমনি ব্যক্তিগত খবরের চুটকি এখানে অহেতুক মূল্য পায়।

আশা করি বুদ্ধদেববাবু উপরের বিনীত নিবেদনে ভুল বুঝবেন না। আমি জানি তাঁর শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা, তবু যে সামান্য বক্তব্য বলতে পারলুম, সে সাহসের কারণ তিনি আর প্রেরণায় বিশ্বাস করেন না। আমার ভরসা তাঁরই কথা :

'nothing remains for us but hard work, the discipline of selfconsciousness.'

বলাই বাহুল্য, এতদিন পরে বুদ্ধদেববাবুর এ কথায় বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেই আনন্দিতই হবেন, যেমন হবেন মাণিকবাবুর মতপরিবর্তনেও। মাণিকবাবুও সম্প্রতি মনে করেন না যে অন্যের বই পাঠে স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য তাঁর এ ধারণাও হয়েছে যে আমাদের এই শতকরা পাঁচজন সাহিত্যপাঠকের দেশে অসহায় জনগণ নামক এবস্ট্রাকশন শুধু তাঁর ও তাঁর সঙ্ঘবদ্ধ বন্ধুদের সম্পত্তি।

বুদ্ধদেববাবু কিন্তু এই বইয়ে কঠিন পরিশ্রম বিশেষ করেছেন বলে মনে হয় না, এবং যে আত্মসচেতনতায় তিনি অনন্যবোধে কাতর, সে আত্মসচেতনতার কথা নিশ্চয়ই মারিত্যা পিকাসোর বিষয়ে বা এলিঅট আধুনিক কাব্যের প্রসঙ্গে বলেননি। যে বয়সে অমিত রায়কে মনে হয় আদর্শ, এ আত্মসচেতনতা

কি সেই বয়সেরই নয়? বুদ্ধদেববাবু তাই মনে হয় কৈশোরক কিন্তু অকপট উচ্ছ্বাসে অনেক সময়েই কষ্ট করে তথ্যসংগ্রহ না করে বা পাতা না উল্টেই তাঁর নিজের স্মৃতিশক্তির উপরে নির্ভর করেছেন তথ্যোন্মোচনে। তাঁর বাক্যরচনা ও শব্দব্যবহারও সময়ে সময়ে অসতর্ক ও অস্পষ্ট।

ইংরেজি ও বাংলা গীতাঞ্জলির তফাৎ দেখিয়ে বুদ্ধদেববাবুর আলোচনা উৎকৃষ্ট তুলনামূলক সমালোচনা হতে হতেও তাই হল না, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও বাংলার তফাৎ দেখাতে বুদ্ধদেববাবু নিজে আবার যথাযথ অনুবাদ দিয়েছেন। কিন্তু শ্রাবণ ঘন গহন-মোহে গানের 'নিলাজ নীল,' কি ঠিক 'ইংমডেস্ট্ ব্লু'? নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে—কি

'Have hope, O my heart, hope day and night, for it will be, it will be?'

কিম্বা 'মাধুর্যের মালা' কি 'গার্ল্যান্ড অব্ সুইটেনস্'? তিনি মিষ্টির অনুরাগী কিন্তু মাধুর্য কি বরঞ্চ 'গ্রেস্'এর আত্মীয় নয় বা মাধুর্যের মালা 'এ টেনডার গার্ল্যান্ড'। তাঁর মন্তব্যে বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদে 'স্বর্ণথালা' হয়েছে 'গোল্ডেন বাসকেট' এবং এ উন্নতির বুদ্ধদেবদত্ত কারণটি অদ্ভুত :

'Basket is a better visual image than the garland on the plate.'

—তাই কি? বাজারের বাস্কেট, টিফিনবাস্কেট, ফলের বাস্কেট, ফুলের বাস্কেট, কি সঠিক ইমেজ কিছু? তাছাড়া 'গার্ল্যান্ড অন দি প্লেট' এল কোথা থেকে?

'সেথা ঊষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা, নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা'—ইমেজটিতো সোনার থালা ঊষার ডান হাতে। কিন্তু সবচেয়ে মজার বুদ্ধদেববাবুর ইংরেজি উৎকর্ষের বিষয়ে এই মন্তব্য : 'রাইটহ্যান্ড সাউন্ডস বেটার দ্যান হ্যাট'—ইংরেজপ্রীতির এ মাত্রা কি এলিঅট কথিত 'আইসোলেটেড সুপিরিঅরিটির'-র এ দেশী সাধনার অঙ্গ?

তাছাড়া কেন যে বুদ্ধদেববাবু ইংরেজি মেঘকে, আষাঢ় বা আশ্বিন নয়, শুধু বাংলা শ্রাবণের মেঘের সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে I wandered lonely as a cloud বা I bring fresh showers for thirsting flowers (the thirsting flowers নিশ্চয়ই?)—বাংলা বর্ষার কাব্য হতে পারে না, তাও বোঝা শক্ত। অনুবাদতত্ত্ব আলোচনায় তিনি ঠিকই বলেছেন যে মাইনর কবিতা অনুবাদ্য, দুঃখ করেছেন যে 'দি ইন্ডিয়ান সেরিনেড' ও 'ল বেল দা সাঁ মেরসি'র বাংলা অনুবাদ বালালোল মাত্র, কিন্তু তারপরেই যখন তিনি একনিশ্বাসে বলেন :

We have, however, very good translations from Heine, Hugo, Stevenson, D. H. Lawrence, from Noguchi and Chinese Anthology (!)

তখন নামগুলির অসম্বন্ধ পারম্পর্য, মাইনর কবি পংক্তিতে লরেন্স, হাইনে ও হুগোর নামগুলি অবাক করে।

কিন্তু এসব কথায় বুদ্ধদেববাবুর প্রাদেশিকতা প্রমাণ নয়, শুধু সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার উদ্দেশ্য। এখানে বুদ্ধদেববাবুর বইটি আমি উপস্থিত করেছি আমাদের সাহিত্যিক সমস্যার একটি উদাহরণ, একটি জলে-কুমীর হিসাবেই। বলা বাহুল্য, তাঁর সঙ্গে বহুবিষয়ে অন্যেও একমত হবেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও গদ্য বিষয়ে যে বুদ্ধদেববাবু এতকাল পরে যে কারণেই হোক তাঁর অনীহা ও অশ্রদ্ধা দূর করতে পেরেছেন, তাতে আমরা খুশি। বা ছকে ফেলে সাহিত্যরচনার মারাত্মক অভ্যাসের বিরুদ্ধে বা যান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদও আমাদের সশ্রদ্ধ বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু তাঁরও মতবাদ আছে, প্রচ্ছন্ন রাজনীতি আছে—এবং সেইখানেই তাঁর সমালোচকদের ডাঙায় বাঘেদের তিনি সমর্থন জোগান। আঁদ্রে জিদের ভাষায়, বুদ্ধদেববাবু জিদের কথায় ক্ষুব্ধ হতে পারেন না বলেই, বলা যায় :

'Leon Blum's thought has lost all interest for me, it has merely become a subtle instrument that he lends to the demands of his cause.' (*Journals, I*)

অথচ বুদ্ধদেববাবু তাঁর কজ্ বা এই সট্ল্ ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহারেও যথেষ্ট অবহিত নন। নাগরিক উচ্চশিক্ষার অভিমানে তিনি উচ্চকিত। অচিন্ত্যকুমার চাকরি ব্যপদেশে কলকাতায় থাকতে পারেন না এই ভেবে তাঁর করুণা অশ্রুময়, নজরুল ইস্লাম নাকি অপরিণত চিরকিশোর এ আলোচনায় তাঁর কণ্ঠস্বরের পরকীয় গাম্ভীর্য প্রায় এলিঅটের চেয়েও বেশি ইংরেজি প্রাপ্তবয়স্ক। এবং তারাশঙ্কর যে কি পরিমাণে প্রাদেশিকতাদুষ্ট, নাগরিক বৈদগ্ধ্যহীন—কারণ তিনি বুদ্ধদেববাবুর মতো হয়তো কলকাতায় এসে কলকাতাকে উপজীব্য করেন না তাঁর গল্পোপন্যাসে, যদিচ তাঁর একটি সাধারণ উপন্যাস "মন্বন্তরে"ই কলকাতার পাড়ার যে প্রত্যক্ষ আবহাওয়া ফুটেছে, তা কলকাতামার্কা সাহিত্যে দুর্লভ—সে বিজয়ী আবিষ্কারে বুদ্ধদেববাবু হিরণ সান্ন্যালের মতোই মাত্রা হারান। তারাশঙ্করের কোনো সরল চরিত্র নাকি একবার কাসাবিয়াঙ্কার মতো গ্রাম্যকবিতা আবৃত্তি করে ফেলেছে! প্রথমত জীবনানুগতার দিক থেকে এটা খুবই যথাযথ, যে দেশে হাইনে হুগো স্টীভনশন্ নোগুচি সমোচ্চার্য সেই দেশে বিশেষ করে। তাছাড়া বুদ্ধদেববাবুর তুলনায় এ মতানুসারে রবীন্দ্রনাথও ঘোর অশিক্ষিত, কারণ 'গোরা'য় তাঁর চরিত্র আবৃত্তি করেছে 'লাইফ ইস রিয়াল' লাইফ ইস আরনেস্ট' ইত্যাদি, এমনকি তার বাংলাও দেওয়া আছে। তার উপরে বুদ্ধদেববাবুর মৌল আবিষ্কার হচ্ছে যে তারাশঙ্করের গল্পোপন্যাসে নাকি নরনারীর প্রেম একেবারে নেই। তারাশঙ্করের ত্রুটি নিশ্চয়ই তাঁর রচনাশৈথিল্য, শিল্পের চেয়ে জীবনের স্রোতেই গা ভাসানোয়, কিন্তু তাঁর জীবনের একটা নির্বিচার হলেও বৃহৎ বোধ অনস্বীকার্য। অন্য সাহিত্যিকসাধারণের সঙ্গে সামান্য একাত্মবোধ থাকলেও বুদ্ধদেববাবু সেটা মানতেন। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু মূলত একেশ্বরবাদী, সেই সোহং-হেগেলের গল্পের মতো, যদিচ তিনি থেকে থেকে দশাবতারকেও নামান—অন্তত নয়, সাড়ে নয়জনকে।

প্রত্যক্ষ জীবনের যে একাত্ম বিন্যাসে ও কিছুটা হয়তো রাশ্যান জীবন ধারায় স্টালিনের কথা রাশ্যায় সার্থক, সেই আত্মপক্ষে সমালোচনার রীতি যে মুক্তিরই এক পরিবর্তনীয় সীমান্ত, সে স্বাধীনতা বুদ্ধদেববাবুর আজ কল্পনাতীত, তাঁর সমালোচনা তাই বৈরী বিধর্মীকে ছায়াময় আক্রমণ মাত্র। সেইরকমই কয়েকবছর ধরে, 'পরিচয়' ও কয়েকজন প্রগতি লেখকদের মধ্যে মাঝে মাঝে যে অসহিষ্ণু দলীয়তা দেখে এসেছি, তার যতোই দার্শনিক সমর্থন তাঁরা করে থাকুন সেও একটা লাসালী ভ্রম : তাঁরাই নাকি জনসাধারণ, তাঁরাই প্রগতি, আর সবাই এক বিরাট প্রতিক্রিয়াশীল পিণ্ড। গটা-প্রোগ্রামের সমালোচনায় এ ভ্রান্তি স্বচ্ছ হয়ে যায়। এঙ্গেলস্‌ও লেখেন :

'The real weakness is the childish notion of the coming revolution which is supposed to begin by the whole world dividing itself into armies; we here, the 'one reactionary mass' there. That means that the revolution has to begin with the *fifth act* and not with the first.'

লেনিনের কথায়

'To imagine that means repudiating social revolution... whoever expects a "pure" social revolution will never live to see it. Such a person pays lipservice to revolution.'

আমাদের কোনো কোনো বামপন্থী সমালোচনা পড়েই তাই মনে হয় মার্কসের কথা :

'For a theatrically vain nature like Lasalle it was a most tempting thought: an act directly on behalf of the proletariat and executed by Ferdinand Lasalle.'

বিশেষ করে এ সতর্কবাণী প্রযোজ্য শিল্পসাহিত্যে, কারণ প্রথমত শিল্পসাহিত্যের নিজস্ব ইতিহাস একেবারে ভুলে বৃহত্তর ইতিহাসের নামে এক কল্পিত ছকে ফেলবার প্রবণতা আমাদের সহজ। আর দ্বিতীয়ত আমরা ভুলে যাই যে সাহিত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্যই হল যে স্তরে জীবনের রূপান্তর, সে রূপান্তরের স্তরে অনেক সময়ে এসে যায় আপাতবৈপরীত্য। বালজাকের প্রতিক্রিয়াশীল মতামত এবং তাঁরই সাহিত্যসৃষ্টিতে তার গভীরতর খণ্ডন তাই মার্কসিস্‌মের পুরোধাই দেখান। ছোটো ক্ষেত্রে নেমে এলেও আমরা এ সত্যের প্রমাণ পাই, যেমন এলিঅটের জীবনবিতৃষ্ণ অস্পষ্ট মতামত প্রকাশ পায় যে নিহিত ছন্দে, তা একরকম জীবনেরই অঙ্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ। শেক্সপীয়রের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব কি মহত্ত্ব লাভ করেছিল, তার বিচার নানা দিক থেকে অনেক সমালোচক করেছেন; মধ্যযুগের দায়ভাগও তাঁর উপরে বড়ো কম ছিল না। চসরের কাব্যের প্রগতি ও জীবনদর্শনের প্রথাগত সামান্যতা এবং ল্যাংল্যান্ডের কাব্যের পশ্চাদ্‌গতি ও জীবনদর্শনের চাষীবিদ্রোহমূলক প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্বও এই রূপান্তরের স্তরপর্যায়েই বিবেচ্য। এইখানেই পরিশ্রমের, তথ্যানুসন্ধানের

প্রশ্ন, এইজন্যেই শিল্পসাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক বিচার জটিল। এ বিচারে সরলীকরণের চেষ্টা স্বাভাবিক, কল্পনাবিলাসের আশ্রয়ও হয়তো তাই নিতে হয়। টমাস মানের সঙ্গে র'ম্যা রলাঁর তুলনায় তাই বোধহয় বলতে ইচ্ছা করে রলাঁর (ব্যক্তিগতরুচিসাপেক্ষ) শ্রেষ্ঠতরতার কথা, এমনকি রলাঁকে কম্যুনিস্ট্ আখ্যা দেওয়া হয় তার প্রমাণ হিসাবে, যদিও রলাঁর বিষয়ে যে কথাটা সত্য নয়, তার সাক্ষ্য লা প'সে-তে মর্লাঁ-র ঐ বিষয়ে প্রবন্ধটি। গোর্কি'র বিষয়েও এই রকম, তিনি কম্যুনিস্ট এ বিশ্বাসঘটিত ভ্রান্ত ধারণা যুক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সাহিত্যের দিকে এরকম মতামতে ক্ষতিই হয়, রচনার ও পাঠের রুচির মান এতে নীচেই নামানো হয়। কারণ এ মনোভাব শুধু বিদেশী মহাজনেই আবদ্ধ থাকে না। সাহিত্য যে 'লেজিসলেটরস্ অব ম্যানকাইন্ড' এ আদর্শ-বাদেরই জোরে এ'রা মনে করেন যে সমালোচকরা 'লেজিসলেটরস্ অব লিটরেচর' এবং বাংলাসাহিত্যের ক্ষুদ্র কমলবনেও এ'রা হানা দিয়ে বেড়ান। এইদিক থেকেই সুকান্ত-কাব্য সম্বন্ধে সঙ্ঘবদ্ধ অতিকথন অনর্থ-দুষ্ট, প্রায় প্রতিপক্ষ বুদ্ধদেববাবুর অতিকথনেরই মতো : সুকান্ত-কাব্যকে পাঁচ নম্বর না হয় ছয় নম্বর দেবেন সে বিষয়ে কবিতা-পত্রে বুদ্ধদেববাবু ঘোর দুশ্চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এবং সে ঐশ্বরিক চিন্তার শেষে তাঁর ইংরেজি বইটিতে তাই সুকান্তর উল্লেখই করেননি। তারাশঙ্করের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'র সমালোচনায় তাই নীতিসম্পন্ন নাক কুঞ্চিত হয়ে ওঠে 'রঙের' ব্যাপার দেখে, তারপরে সমালোচককে জাতীয় জীবন নামক বস্তুর মনগড়া ছবিতে সংখ্যাতত্ত্বের খেয়ালী ব্যাখ্যায় বলতে হয় যে কাহার-রা যেহেতু সংখ্যায় কম, সেহেতু তাদের গল্পজাতীয় সাহিত্য হতে পারে না, যেমনটি হতে পারে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (বলাই বাহুল্য, মাণিকবাবুর চমৎকার সুলিখিত উপন্যাস)। কাহার-রা নাকি শুধু হতে পারে ভেরিঅর্ এল্উইনের নৃতত্ত্বের রসালো বিষয়। ভারতবর্ষে এই জাতীয়বাদী সমালোচনা! যেখানে কোটি-কোটি লোক ভদ্রলোক হতে পারেনি, ইংরেজি শেখেনি, ইংরেজিশিক্ষিতের সামাজিক বা ধর্ম আন্দোলনে অংশ পায়নি! নৃতত্ত্ব-বিষয়ে ভ্রান্তিবিলাস না হয় মার্জনীয়ই মানলুম।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠাট্টার বিষয় নয়। সমালোচনার মানবিকার সাহিত্যের এবং কিছুটা জীবনের পরিধিতে ব্যাপ্ত। প্রেরণাবাদের অভ্যাসিকতা এই আলাদ্দীনের ম্যাজিকযন্ত্রচালিত প্রদীপোজ্জ্বল স্বপ্নময় স্বর্গরাজ্যবাদেও বর্তমান। শেষোক্ত ধর্মও 'সমাজের ভাবী গঠন বিষয়ে একরকমের কল্পনার খেলা'—কারণ

> 'Naturally Utopianism, which before the time of materialist critical socialism concealed the germs of the latter within itself, coming now after the event can only be silly; *silly, stale* and basically reactionary.' (*Engels*)

অর্গ্যানিক প্রকৃতির প্রক্রিয়াবিশেষের উপরে যন্ত্রবিজ্ঞানের পদ্ধতির প্রয়োগে কি বিপদ, 'ফয়েরবাখে' তা সুস্পষ্ট দেখানো হয়েছে। অথচ আমাদের সমালোচকেরা প্রায়ই উদোর পিণ্ডি চাপান বুদোর ঘাড়ে, কবিতায় চান গল্প গল্পে চান সংবাদ, রাজনীতির কর্মক্ষেত্রের বিবেচ্য করেন প্রাথমিক দাবি গল্পবিচারে, অর্থনীতির তত্ত্বের বর্ষফল খোঁজেন কাব্যের মিলে, আমাদের

সমাজের জীবনের মনোলোল্যো খোঁজেন সোভিয়েট সমাজের প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা। বলাই বাহুল্য মার্ক্সবাদে এই সহজপথের সমর্থন নেই,

'because no philosophy recognises the emergence of levels of organisation better than dialectical materialism, and the individuals of which the human social collectivity is built up are themselves the most complicated organisms in the living world.'

শিল্পসাহিত্য রচনায় আজও তাই ব্যক্তিরচয়িতাই প্রাথমিক, এই অনেক মানুষের পথে তাই আজও ওঅন-ওয়ে-ট্রাফিকের নিয়ম চলে না—কি দক্ষিণে, কি বামে।

অধিকন্তু, শিল্পসাহিত্যে—যেখানে মানসজীবন মূলত আর্থিক সামাজিক ও জৈব অবস্থানিচয়ের রূপান্তর হলেও খানিকটা আবার স্বতই নিয়ন্ত্রণ ও চালনাশক্তি পায় (গারোদি : সমাজতন্ত্রবাদ ও মানসনীতি : organisateur et moteur), সেখানে তাই স্তরগত সত্তাকে অস্বীকার শিল্পসৃষ্টি বা রচনার পরিপন্থী। মাণিকবাবু যদি বলেন, তাঁর সঙ্ঘের বাইরে এই নিয়ন্ত্রণের স্তর অগোচর, তাহলে তাঁর পুনর্বাদ হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞানবহির্ভূত, মরমীয়া।

'of an obscurantist character, since it was supposed that the organising relations were themselves the anima and as such inscrutable to scientific analysis.'

বিশেষত বিজ্ঞান তথা সমালোচনার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ঐ বিশেষ স্তরের প্রক্রিয়ায় যে বিশেষ ফর্ম, তাই পর্যবেক্ষণ করা। অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে আছে বৃহত্তর সম্বন্ধের ঐক্য কিন্তু তার প্রকাশ হয়

'in qualitatively different forms of whose distinctive characters one should never lose sight of.'

এবং ফর্ম ও ম্যাটার সমতুল্য বা অভিন্ন (ডায়ালেক্‌টিক্স অফ নেচার)। এই পর্যবেক্ষণে, এই অভিন্নতার বিচারে অবশ্যই ফর্ম বাধ্যত খানিকটা পরোক্ষ নিদান হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ফর্মের পরিবর্তনের জ্ঞান সম্ভব ফর্মের প্রাথমিক জ্ঞানে এবং তার উৎসের জ্ঞানেই। এবং এ পরিবর্তন তো নিত্য ও সর্বব্যাপী, পুরাতন ও নতুনের, জীর্ণ ও নবজাতকের দোহারই বিবর্তনের প্রক্রিয়ার অন্তর্লীন আতত বিষয়বস্তু। এঙ্গেলস্‌ তাই লেখেন :

'We all, that is to say, laid and were bound to lay the main emphasis at first on the derivation of political, juridical and other ideological notions from basic economic facts. But in so doing we neglected the formal side—*the way in which these notions come about,* for the sake of the content.'

নন্দনতত্ত্বে বা শিল্পসাহিত্য বিচারে শেষোক্তটিই মুখ্য বিচার।

'It is the old story: form is always neglected at first for content. As I say, I have done that too, and the mistake has always struck me later.'

এই ন্যায়বিশ্বের আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন বা এই স্তরের ভিন্নতার উপরে নজর দেবার প্রয়োজন মার্কস্ তাই বিবৃত করেন ক্রিটিক্ অফ্ পলিটিক্যাল ইকনমির ভূমিকায়। আইডিওলজিক্যাল ফর্মগুলিকে উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন তিনি বলেননি, বলেন 'রূপান্তর'। তিনি বলেন যে আমাদের ভাবজগৎ, চিন্তাজগতের সূত্রপাত 'প্রথমে' বাস্তব কর্মপদ্ধতি ও মানুষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে জড়িত (জর্মান আইডিওলজি)। আবার

'From the start the "spirit" is afflicted with the curse of being "burdened" with matter which here makes its appearance in the form of agitated layers of air, sounds, in short, of language.'

কর্মের তাগিদে বা কর্মীর আত্মপ্রসাদে আমরা ভাষার এই উভয়মুখিতা ছাঁটাই করি, ভাষাকে সঙ্ঘবদ্ধ হাতুড়ি ভেবে ফেলি কিম্বা ঐ 'আত্মা'কে বা মানসকে হুকুম দিই প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে মাটিতে ফেলে সাম্যবাদী সমাজের রিয়ালিসমের আকাশে উড্ডীন হতে। শিল্পসাহিত্যেরও যে একটা ইতিহাস আছে, একটা বেগতত্ত্বও আছে, তা আদর্শবাদীর আবেগে ভোলা স্বাভাবিক নিশ্চয়ই। কিন্তু স্রষ্টাশিল্পের কর্ম ঠিক সিস্টেম বা মেটাফিসিকস্ তো নয়, প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্রও নয়—শিল্পীদের সঙ্ঘ অবশ্যই তা হতে পারে। নৈঃসঙ্গের অসংলগ্ন চর্চাও সমানই অসহিষ্ণুতার লক্ষণ। কারণ তাতেও সরলীকরণ, তাতেও ব্যক্তিসমাজের প্রাণময় আর্তি অস্বীকৃত—অধিকন্তু অবশ্য তাতে আশুপ্রয়োজন সামাজিক উন্নতি অস্বীকৃত।

তাছাড়া শিল্পকর্ম যে এখনও কিছুটা আদিম, সে কথা ভুললে চলে কি করে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিল্পগুলি এবং বিশেষ করে আমাদের সমাজ-জীবনে। সিনেমা, বালে, নাট্যমঞ্চ ও পোস্টার ছাড়া যৌথ শিল্প কৈ আর? অধিকাংশ আদিম শিল্প যথা সাহিত্য বা স্টুডিওচিত্র আজও ব্যক্তির হাতে গড়া,

and therefore of necessity, small, dwarfish, circumscribed. But for this very reason, they belonged as a rule to the producer himself.

তাই এখনো শিল্পকে, এই ইন্দ্রিয়-গত মানবিক কর্মপ্রক্রিয়াকে শুধুই যৌথ সামাজিক পণ্যদ্রব্য ভাবাটা মার্কসবাদের পরিপন্থী। সেইজন্যেই ফরাসী কম্যুনিস্ট নেতা এরভে ও গারোদি বলেন যে শিল্পবিচারে কোনো পার্টিলাইন বা মার্কসীয় নিয়মকানুন প্রযোজ্য নয়। মার্কস্ কারুশিল্পী বিষয়ে যা লেখেন, তাও এ প্রসঙ্গে তুলনায় চিন্তনীয়—

'There is found with mediaeval craftsmen an interest in

their special work and in their proficiency in it which was capable of rising to a narrow artistic sense. For this very reason, however, every mediaeval craftsman was completely absorbed in his work...and to which he was subjected to a far greater extent than the modern worker, whose work is a matter of indifference to him.'

এই দৃষ্টিতে একদিকে বুদ্ধদেবের 'ইন্‌কোরাপ্‌টিব্‌ল্‌ রোল্‌ অব দি পোয়েট'এর বিলাস অর্থহীন, অন্যদিকে স্বয়ম্ভর তথাকথিত মার্কস্‌বাদীর ফাঁকিও মারাত্মক হয়ে ওঠে। তাঁরা কেউ কেউ দ্রুত সমাধানের তাগিদে আরম্ভ করেন বর্জননীতি। সামাজিক সম্বন্ধপাতে এবং উৎপাদন শক্তিসমূহে বিরোধিতা লক্ষ্য করে তাঁরা আধুনিক শিল্পসাহিত্যকে বিসর্জন দিয়ে একবার কাঁদেন মানবসমাজের প্রথম সারল্যের দিকে ফিরে, একবার হাহুতাশ করেন ভাবীস্বপ্নের সুখময় কোলে—

'this antagonism between the productive forces and the social relations of our epoch is a fact. Some may wail over it; others may wish to get rid of modern arts, in order to get rid of modern conflicts.' (*Engels*)

মার্কস্‌ও মন্তব্য করেন এই অসমতার বিষয়ে তাঁর ক্রিটিক্‌ অব পলিটিক্যাল ইকনমির ভূমিকায়। অধিকন্তু,

'As to the realms of ideology which soar still higher in the air, religion, philosophy etc., these have a prehistoric stock.'

সুতরাং

'All one can reasonably do, however, is (1) to try to discover the method of division to be used *at the beginning* and (2) to try to find *the general tendency* in which the further development will proceed.'

এবং তার জন্যে

'all history must be studied *afresh,* the conditions of existence of the different formations of society must be individually examined.'

এবং সাহিত্যবিচারে তাই যেমন সাহিত্যবস্তুই প্রধান বিবেচ্য—কে হাকিম বা হাকিমপুত্র, কার চরিত্র কি রকম সে শুধু পরে এবং জীবনীর স্তরেই বিবেচ্য—তেমনি ঐ ব্যাপক ও গভীর সমাজেতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেতিহাসও গ্রাহ্য—সাহিত্যবিচারে।

অবশ্য এসব কথার জবাবও তিনি সহজেই দিতে পারেন তথাকথিত মার্ক্সিস্‌মের যাদুকাঠি যাঁর হাতে। চরম সত্য এবং একমাত্র নিখুঁত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি তাঁদের মুঠিতে যাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের পক্ষে অবজ্ঞা ও বর্জননীতি স্বাভাবিক—হের্‌ ডুএরিঙের মতোই। তাছাড়া

'as in economics it is assumed that every consumer is a real specialist on all the commodities he has occasion to buy for his maintenance—so similar assumptions are now to be made in science.'

এঙ্গেলস্‌ এই মনোবৃত্তিকে বলেছেন শিশুরোগ। হাঁ-বা-না মার্কা ধর্মপরায়ণ এই ব্যক্তিদের কাছে স্বকীয় ইতি-ও-নেতির বাইরে সব কিছুই মন্দ, পাপবিদ্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল, এমনকি 'ফ্যাসিবাদী'ও। তাঁরা ভুলে যান তাঁদের একেশ্বরাবেগে যে দ্বন্দ্ব ও স্তরের বিভেদগুলির মূল্য আপেক্ষিক, যে তাঁদের কল্পিত ভাগাভাগির কাঠিন্য এবং এক ও অদ্বিতীয় পুরুষার্থ তাঁদেরই মানসিক দান এবং একথা ভুললে ডায়ালেক্‌টিক্স অচল।

এরকম বিস্মরণে বিপদ খুব বেশি, অন্তত আমাদের তাই বিবেচ্য, শিল্পসাহিত্যে। রীতিমতো ধর্মেতিহাসেও দেখা যায় যে ঈশ্বরকে আত্মা বা সর্বস্বদানের চরম পরিণতি হচ্ছে অবাঙ্‌মনসোগোচরের যে অতীন্দ্রিয়তা, তাতে শিল্পসাহিত্যে যে গোচরেরই জয়গান তা বিধর্মের নামান্তর। যে পরিমাণে গির্জা বা মন্দির শিল্প ঐহিক, যে পরিমাণে কৈবল্যে আত্মদান অসম্পূর্ণ, সেই পরিমাণেই সেই শিল্পের প্রাণৈশ্বর্য, সেই সাহিত্যের প্রত্যক্ষ জীবনের উৎসে বারংবার প্রাণসংগ্রহ। রবীন্দ্ররচনাবলীতে আমরা এই দ্বৈতাদ্বৈতের আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ পাই।

পরোক্ষ মার্গে জীবনাভিজ্ঞাঘটিত কোনো ইস্‌থেটিক বা সংবেদ্য কর্মচর্চা ঐতিহাসিক বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়, এমনকি শিল্পবস্তু-বিশেষের উৎকর্ষও হয়তো তাতে তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত। তাই তো এঙ্গেলস্‌ লেখেন যে যবের চারা ও আনন্তিক কলন দুইই নেতির নেতিকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ জ্ঞান থাকলেও যবের চাষ বা অঙ্কের উত্তর সঠিক হয় না, তারের স্থূলতার পরিমাণে শব্দের ওজন কি তা জানলেও হয় না বেহালা বাজাবার ক্ষমতা। তাছাড়া চিরসত্য হয়তো অঙ্কে প্রযোজ্য কিন্তু ইতিহাসে বা জীবনের অভিজ্ঞায় সত্যকে হতে হয় বারবার আবিষ্কারে প্রত্যক্ষে প্রতিভাত। মানুষের ইতিহাসে যেমন কয়েকটা মোটা পুরুষার্থ প্রায় চরম মূল্য পেয়ে গেছে তেমনি আবার সে পুরুষার্থের বিশেষ রূপ ও প্রয়োগ কালনির্ভর—যদিও মানবিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান জীববিদ্যার চেয়েও পিছিয়ে আছে (এঙ্গেলস্‌)।

সাহিত্যের পক্ষে আর একটা গৌণ বিপদ হচ্ছে এই জীবনে পুরুষার্থজড়িত ভাববিলাস। ভাববিলাস সর্বদাই বিপজ্জনক, অসংহত কল্পিত নৈঃসঙ্গ্যে বা শিল্পরচনার প্রয়োজনীয় অবকাশ বা নৈঃসঙ্গ্যহীন সঙ্ঘে যেখানেই হোক, কিন্তু তার বিপদ আরো বেশি, যখন তার পিছনে বিজ্ঞানের ছাপমারা সমর্থনের রং চড়ে। উদাহরণত সাহিত্যের একটা বড়ো উপজীব্য প্রেমই ধরা যাক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর আলোচনা মনে পড়েছে। শ্রেণীহীন সমাজে শুনেছি সে

গৌরবশশীর জন্যে কাতর কবিকে প্রলাপ কইতে হবে না, যেন শ্রেণীর বন্ধন উন্মোচিত হলেই বিশেষ নর-নারীর সম্বন্ধ-সমস্যা জলবৎ সহজ হয়ে যাবে, বা উঠবেই না। এই ধারণারই পরিণতি সেই প্রমাদ লেনিন যাকে বলেছিলেন জলের গ্লাসের মতবাদ। এই দৃষ্টিতেই বলা হয় যে ভবিষ্যৎ সমাজে বিবাহ বা বর্তমান বিপ্লবীর বিবাহ যৌনবিবাহ নয়, বৈপ্লবিক বিবাহ! কারণ ডুএরিঙের নির্দেশে প্রেমিককে হতে হবে অমানুষিক—

'The first thing that he must do is to cast off brutality and stupidity now rife in the sphere of sexual union and selection.'

এই একই কারণে তো শিল্পসাহিত্যজগতে এঁদের বর্জননীতির এতো দৌরাত্ম্য, ডুএরিঙের মতোই। এদিকে মনে মনে ডুএরিঙের মতোই আছে বাক্‌প্রধান কবিগৌরব। অবশ্য মাণিকবাবুরা বলতে পারেন যে তিনি শ্রেণীমুক্ত মানবসমাজের কথাই ভাবেন ও বলেন, যেমন বুদ্ধদেববাবু শ্রেণীহীন ও সমাজ-হীন মানুষের কথা। কিন্তু শ্রেণীসমাজেও

'there has been on the whole progress in morality, as in all other branches of human knowledge ... we have not yet passed beyond class morality. A really human morality which transcends class antagonisms and their legacies in thought becomes possible only at a stage of society which has not only overcome class contradictions but has even forgotten them in practical life.'

তাছাড়া, প্রগতিবিচারেও রুচির ব্যক্তিগত সমস্যা থেকেই যায়, মায়াকফ্‌স্কির সেই উটের আর ঘোড়ার মতো :

উটের দিকে তাকায় ঘোড়া,
চেঁচিয়ে বলে, একি বেয়াড়া বাপমাছাড়া ঘোড়ারে!
উট এদিকে জানায়, তুমি তো ঘোড়া নও হে
তুমি চিম্‌সে বেঁটে উট বটে।

এক ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই
নক্ষত্রখচিত এই বিরাট ভুবনে জানে না
যে এরা দুটি
স্বতন্ত্র ধরনের দুটি জীব।

৯

আরাগঁ

আরাগঁর বই মাত্রেই সাহিত্যজগতে ঘটনা। দ্রষ্টব্য হচ্ছে আরাগঁর বিশেষ বইর উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কবিপরিণতির স্বাক্ষর। কারণ আরাগঁর কবিজীবন দাদা-বাদ থেকে সাম্যবাদের দীর্ঘ কিন্তু প্রাণবান এক বিস্ময়কর বিকাশের উদাহরণ। একনম্বর নরখাদক নামক পুস্তিকায় তিনিই এই কবিতাটি লিখেছিলেন : আত্মহত্যা

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W
X Y Z

দারুণ রসিকতা নিঃসন্দেহ, সাবেক ফরাসী অর্থে, বুর্জোয়াদের ক্ষেপাবার জন্যই। কিন্তু এই অক্ষরমালার মধ্যে তৃতীয়টি 'সে' নিয়ে তাঁর বিখ্যাত প্রতিরোধ-কাব্যের একটি জোরালো কবিতাও যে লিখিত, সেটা কি সম্পূর্ণই আকস্মিক প্রেরণা ?

দাদাবাদের আরম্ভ ত্রিস্তাঁ ৎসারা, পল্ এলুয়ার, লুই আরাগঁ প্রভৃতি আজকের অনেক শ্রদ্ধেয় কবিদের তারুণ্যে; এর ভিত্তি হল জুগুপ্সা বা বীভৎসায়, অস্পষ্ট লক্ষ্য এবং একটু চালিয়াৎও হয়তো, কিন্তু প্রকৃত বিরাগে। অবশ্য তাঁদের মুক্ত লিরিকবাদের তত্ত্বও কার্যকর ছিল না, তা সত্ত্বেও ফরাসীকাব্যের ইতিহাসে দাদার একটা স্থান আছে, অবশ্যব্যর্থ পরীক্ষা হিসেবে, বিদ্রোহের একটা প্রাথমিক খেয়াল হিসেবে। এঁদের মতে শতাধিক বছর ধরে লেখকরা সাহিত্যকে ভেবে এসেছেন নিজেদের একটা বহিরূপায়ণ বলে। এঁদের মতে ধ্রুপদী লেখকদের এ ধারণা ছিল না। তাঁরা তাঁদের শিল্পকর্তৃত্বের ব্যবহারে কল্পনার দ্বারা চেষ্টা করতেন যে প্রত্যক্ষকে যে বাস্তবকে সবাই দেখে তাকেই প্রতিভাত করতে, রূপান্তরিত করতে। উনিশ শতক ব্যেপে এই বিষয়গত বা অবজেকটিভ এষণ ক্ষীয়মাণ। রোমান্টিকবাদের সময় থেকে লেখকদের ধারণা হল যে তাঁদের সৃজনশক্তি তাঁদের বোধ বা গ্রহণশক্তির আগে। ঈশ্বর হলেন তাঁদের আদর্শ আর জেনেসিস তাঁদের লক্ষ্য। তাই ফ্লোবেয়র তাঁর আপাত-বিষয়ানুগত্য সত্ত্বেও আসলে তাঁর কল্পনার ছায়ামূর্তিদেরই মূর্তিকার। সিম্বলিস্ট্ বা প্রতীকবাদীরা উল্টে সব আদর্শ বা মডেল বিসর্জন দিলেন

এবং নিজেদের ব্যক্তিস্বরূপের একটা ডেপুটি বা প্রতিনিধি করলেন তাঁদের কাব্যকে। একালের যুবকদের কাছে তাই র‍্যাঁবোর কীর্তি সূচিত হল তিনি যে এই শিল্পরচনায় প্রতিনিধিত্ব বা প্রতিকৃতির দাবিকে উড়িয়ে দেন, তাতেই। র‍্যাঁবোর দাম তিনি যে শান্ত আত্মপ্রত্যয়ে—আত্মচিত্রনে নয়, কাব্যের সত্তায় ঝাঁপ দিলেন, তাতেই। র‍্যাঁবোর রচনা তিনি নিজেকে যে একটা রূপ দিলেন তাতেই সম্পূর্ণ। তিনি, কথাটার চলিত অর্থে বলা যায়, লেখেন নি, তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। সাহিত্যিক কিউবিস্‌ম্—আপলিনেয়র, মাক্‌স্ জাকব্, প্রতীকবাদেরই উত্তর পর্ব, অর্থাৎ আত্মবহিষ্করণই। দাদার ঐতিহাসিক মূল্য এইখানে—এঁরা দেখালেন যে আত্ম-উপলব্ধিতে কিছুই উপলব্ধ হয় না, নিজেকে শুদ্ধভাবে বহির্‌রূপায়ণ মানেই লেখকের কাজ শূন্যে অবসিত করা।

দাদাবাদী যখন অতিবাস্তববাদী হয়ে উঠলেন, তখনও তাঁদের মুখ্যত একই চিন্তা, যদিচ তাঁরা বিরক্ত হয়ে এবারে স্বপ্নজগতের অবচেতনের প্রকৃত কিন্তু অনির্দিষ্ট জগতের মাহাত্ম্যে মাতলেন। আওয়াজ দেওয়া হল : জীবনের বড়ো সমস্যাসমূহের সমাধানে স্বপ্নজগৎই সারথি। অতিবাস্তববাদ থমকে দাঁড়াল পরিণতির সেই প্রাণময় মোড়ে, যেখানে শিল্পসাহিত্যের জায়গায় এসে পড়ে বাস্তবজীবন, যেখানে মানুষের কল্পনা শব্দ বা রংরেখার চেয়ে আরো প্রত্যক্ষ বস্তুগত প্রকাশ চায়। অর্থাৎ অতিবাস্তবের আন্দোলন আর সাহিত্যিকগণ্ডিতে থাকে না, জীবনেরই রূপান্তরে তার পরিণতির সততা। লেখককংগ্রেসে তাই ব্রেত' বলেছিলেন : জগৎকে বদলে দাও, মার্কস বললেন : জীবনকে পালটাও, র‍্যাঁবোর কথা ; আমাদের পক্ষে এ দুটি আদেশবাক্য একই নির্দেশ। এ নির্দেশ আরাগঁই মানেন প্রথম, তিনিই এঁদের প্রথম কম্যুনিস্ট কবি।

তাই ৎসারা তাঁর নতুন বই 'অতিবাস্তববাদ ও যুদ্ধোত্তর যুগ'-এ বলেছেন : 'কাব্য তো ইতিহাসে আকণ্ঠমগ্ন। তাই তাঁর দেসন-র মৃত্যুগাথা বা লরকাকে উদ্দিষ্ট কবিতা কাব্যের জিজ্ঞাসাও, দেকুরের হত্যার উপরে এলুয়ারের কবিতার মতোই। সৎকাব্য মাত্রেই তো মৌলিক কাব্যজিজ্ঞাসাও বটে।'

ইতিহাসে আকণ্ঠমগ্ন কাব্য, ইতিহাসমগ্ন মানুষ—তার প্রতি আনুগত্যের ফলে স্থাবর স্বত্বরক্ষা অচল। বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়েও দ্রষ্টব্য কিভাবে চালু স্বত্ব অস্বীকারে, চল্‌তি রীতির বর্জনে এলুয়ার আরাগঁ এবং ৎসারা স্বপ্নকার্যের অপেক্ষাকৃত উর্বর জমিতে গিয়ে পড়লেন, কিভাবে উর্বর অবচেতন তাঁদের ডুবিয়ে দিলে জীবনে, প্রথমে কিছুটা অনির্দিষ্ট গতিতে হয়তো ; বেঁধে দিলে সবচেয়ে বড় মূলধন যে মানুষ তারই মাটিতে, সীজারকে তাঁর প্রাপ্য না চুকিয়ে।

ৎসারার কবিতা তাই গায় : ফেলে দাও তোমার অহঙ্কার, কান মেলে রাখো শ্রবণ কোঠায়। কারণ সৎকবির শ্রেষ্ঠ পুঁজি কাব্য নয়, মানুষ ; নাহলে জোটে নিরক্ত দাসত্ব, ভবিষ্যৎহীন, আনন্দের দীপ্ত ভবিষ্যৎ। ৎসারা বলেন : আধুনিক কবিতা যা তা সে হত না, যদি না স্পানিশ যুদ্ধ তার উপর দিয়ে ছুরির মত চলে যেত, যদি না মিউনিক্ তাকে সেই লালে রাঙাত, যে লাল সবচেয়ে গরীয়ান রং, যদি না ভিশি...অতিবাস্তববাদের সীমানা বহুদূর চলে যায়। ৎসারা তাই আধুনিক কবিকুলকে ভাগ করেন ত্রিধা : কোনো কোনো কবি বলেন ফিরে চলো অতীতের সত্যযুগে, ফলে দুঃখকষ্ট অত্যাচারের কথা

ভুলে যাওয়া যায়। কেউ কেউ ত্রিকালের এক নির্যাস বানিয়ে বর্তমানে গেঁথে বসেন, যাতে কিছু পরিবর্তন আর ভাবা যায় না; আর আছেন তাঁরা যে কবিরা অতীতোত্তর বর্তমানে দেখেন সেই ভবিষ্যতের প্রস্তুতি যেখানে মানুষোচিত, তাঁদের সম্ভ্রমসঙ্গত এক জগতের প্রত্যক্ষ প্রতিমাই মানুষের অবিশ্রাম জ্ঞান-সাধনার লক্ষ্য।

অতিবাস্তববাদী অনেক কবিদের হল এই তৃতীয় দলে বিকাশ। এই সাহিত্যিক পৌরবাদ পুষ্টতা পেতে লাগল অযৌক্তিকতা বা অচালিত চিন্তার মতবাদ বিসর্জনে; নিয়ন্ত্রিত চিন্তা, দ্বন্দ্ব-সমাহিত যুক্তিবাদে অর্থাৎ মার্ক্সবাদে পরিণতি পেয়ে। প্রকৃত ~~ব্রা সৎকাব্য যার~~ শিকড় চেতন ও অবচেতনের মাটি ও জলে, নিজের স্বকীয় যুক্তিতে সে নির্ভর। অবশ্য সে যুক্তি কষ্ট করে জানতে হয়, কাব্যের স্বকীয় ডায়ালেকটিক্ খুঁজতে হয় তার নিহিত থেকে প্রকাশিতের মধ্যে, রূপহীন থেকে রূপায়িতের প্রক্রিয়ায়। যথার্থ কাব্যের মজ্জাগত এই যে-কোনো সততাবান কবিকে নিজের মধ্যে এবং যুধ্যমান জগতের সঙ্গে সম্বন্ধপাতে এনে ফেলে। ই, ফরাসী সাম্যসুধীর ভাষায় কাব্য আজকে সামগ্রিক অর্থাৎ প্রগতিশীল মানবিকতার দিশারী।

ফরাসী কাব্যজিজ্ঞাসার এই পটেই আরাগঁ'র কাব্যের মহত্ত্ব উপলব্ধ। গত যুদ্ধের অন্ধকারে তাঁর কবিতা স্বদেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের ব্যাপকভাবে উদ্বোধিত করেছিল। সে কাব্যে আঁদ্রে জিদ-কে বলতে হয়েছিল যে এই বুঝি ফরাসী কাব্যের রেনেসান্সের সূত্রপাত, বায়ুবিহারী ইংরেজ মর্টিমার কনোলিদেরও জয়ধ্বনি করতে হয়েছিল প্রচুর—যদিচ রাজনীতি এবং সাম্যবাদের রাজনীতিই এই রেনেসান্সের বনিয়াদ, যা আরাগঁ-রই গদ্য রচনাতে স্পষ্ট। এই সব দেশপ্রেম তথা কলাকৌশলে সমধিক অবহিত কবিতা পাঠের তৃপ্তি ধ্রুপদী কাব্যপাঠের সমতুল্য, যদিচ সেগুলি তখন মুখে-মুখে আইন এড়িয়ে ফ্রান্সে ঘুরত।

এই একাধারে সাধারণ ও বিদগ্ধের কাছে সফলতা বোধ হয় ফরাসী বিপ্লবোত্তর ফরাসী জীবন ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণেই সম্ভব। ইংলন্ডের মতো ভদ্রলোক-মার্কা দেশে বা অন্যপক্ষে ভারতবর্ষের মতো বিক্ষিপ্ত ভঙ্গুর জীবনে এ বোধ হয় সম্ভব নয়। এখানে ভাঙন এখনো জোড়া দেওয়া বাকি, শিক্ষাগত ভেদাভেদ এখনো বড়ই তীব্র, সংস্কৃতিগত ঝোঁক বড়ই একপেশে—কি এদিকে কি ওদিকে। ফরাসী জীবন ও সংস্কৃতির সচল ধারাতেই আরাগঁ-র কবিত্বের সাবালক বিকাশ। যদিচ ভিক্টর হুগো থেকে রম্যাঁ রলাঁর বিপ্লবী ঐতিহ্য তাঁর চোখে, যদিচ রাসীন্ থেকে বদলেয়রের ধ্রুপদী ছন্দরণনও তাঁর কাব্যে প্রসাদ আনে, তবু তাঁরই সাক্ষ্যে আমরা জানি যে ফরাসী কাব্যের মধ্যযুগের ধারা এবং দেশজরীতি তাঁর অন্বিষ্ট, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল চর্চা তাঁর শিক্ষার অঙ্গ, সিম্বলিস্ট্, সুররেয়ালিস্ট্ তথা তাঁর মধ্যযুগের পথপ্রদর্শক আপলিনেয়র পর্যন্ত। ফরাসী কাব্যে যে স্বদেশপ্রেমের স্রোত বয়ে গিয়েছে, তাতেও আরাগঁ মুক্তিস্নানে ভয় পাননি, অথচ পেগ্যী সাম্যবাদী নন, যেমন নন আপলিনেয়র বা জাকব, যদিচ শেষোক্ত কবি একাধিক নাৎসীনিহত কাথলিক কবিদের একজন।

একে বিদগ্ধজনের বহুপল্লবগ্রাহিতা ভাবলে ভুল হবে, বরং মার্কসবাদের মানসেই এই গ্রহণবর্জনসৃজনের সম্যক সমর্থন পাওয়া যায়—মতবাদ ও কর্ম-

প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত। বলাই বাহুল্য এ ক্ষেত্রে কর্মের উদ্দেশ্যটাই প্রধান বিবেচ্য এবং তার ক্ষেত্রনির্দেশ। আরাগঁ, বলাই বাহুল্য মধ্যযুগে পলাতক নন, আপলিনেয়র বা পেগ্যীকে তিনি অবশ্যই তোরেস্ বা কাসানোভার সঙ্গে একাসনে বসান না। সাহিত্যের পুষ্টি তাঁর কাছে রাজনীতির থেকে, অঙ্গাঙ্গি হলেও স্বতন্ত্র। হেগেলের দুরন্ত প্রতিক্রিয়া বর্জন করে যেমন একদা তাঁর ডায়ালেকটিক্ গ্রাহ্য হয়েছিল, রিকার্ডো বা স্যাঁ-সিমোঁর ঋণ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে; আরাগঁ তেমনি ফরাসী কাব্যের দেশজ ঐতিহ্য সন্ধান করেছেন তাঁর কাব্যের উৎসে জলসিঞ্চনে। ফরাসী মননজীবীদের কংগ্রেসে গোর্কির উপরে তাঁর ভাষণে আরাগঁ তাই বলেন : গোর্কির ছিল কাব্যে জাতীয় সত্তার একটা বোধ, সুদূর জাতীয় অতীত থেকে অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারের চেতনা।......যখন বোগাতিরদের আক্রমণ করে রুশ রঙ্গমঞ্চে পরিহাস যোগানো হচ্ছিল, যে পরিহাসে বোগাতিররা কিম্ভূত ও বর্বর ফিউডাল যোদ্ধা বলে, প্রায় এস্ এস্-এর পূর্বাভাস বলে চিত্রিত, তখন গোর্কির কাছ থেকেই বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা তাঁদের সমালোচনার সূত্র পান; ফলে সে নাটক রাশিয়াকে অপমান হিসাবেই স্টেজ থেকে বিদায় নিলে। আরাগঁ ওই ভাষণে তারপরে বলেন, আমায় যাঁরা জানেন, তাঁদের জানা আছে ওই চিন্তাস্রোত আমার পক্ষে কি মূল্যবান। গোর্কির এবং আরাগঁর এই মতেরই সমর্থন লেনিন করেন যখন তিনি ১৯২০ সালে লুনাচারস্কির সংস্কৃতি সম্মেলনের ভাষণের দ্রুত প্রতিবাদ লেখেন (১০নং নুভেল ক্রিতিক-এ লেখাটির অনুবাদ প্রকাশিত) : মার্কসবাদ বিশ্বেতিহাসে গুরুত্ব অর্জন করেছে যেহেতু বৈপ্লবিক প্রোলেটারিএটের এই মতবাদ বুর্জোয়া যুগের বহুমূল্য জয়মাল্যগুলি বর্জন তো করেই নি বরঞ্চ দু'হাজার বৎসরব্যাপী মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির দীর্ঘ বিকাশের সব কটি বস্তুত পরিগ্রহণ করেছে রূপান্তরের মধ্যে। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যের মার্কসবাদী আলোচনাতেও দেখা যাচ্ছে ঐ নির্দেশের আভাস। আরো বেশি আলোচনায় ও অবহিত সাহিত্য-পাঠে নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণতা কেটে যাবে। এতদিন মুখ্যত একপেশে শিক্ষার প্রভাবে, আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ইংরেজ শাসনব্যবসার সৃষ্টি মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংস্কৃতির অপরিসর চলনবিলেই মার্কসবাদের সংস্কৃতি চিন্তা মোটামুটি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অথচ বোঝা যাচ্ছিল জলাশয় আরো আছে, স্রোতগ জলধারাও। কারণ ওই সংস্কৃতি যে শুধু মুষ্টিমেয়ের তা নয়, মাত্র উনিশ শতকের যে তা নয়; তার চেয়ে বড়ো কথা, ওই শিক্ষা সংস্কৃতির যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরে ভিৎ সে শ্রেণী বিদেশী শাসকের ব্যবসায়ীর ক্রীড়নক মাত্র, শাসকও নয়, উৎপাদক ব্যবসায়ীও নয়। বুর্জোয়া সমাজের উদারনীতিক অসম্পূর্ণ সভ্যতাও তাই তো আমরা সত্যই পাইনি। পশ্চিম য়ুরোপের রেনেসান্স বা আধুনিকতার বিকাশ আমরা বাঁকা আয়নায় পেয়েছি বেঁকেচুরে। আমরা গ্রাম হয়তো ভেঙে এসেছি, কিন্তু গেঁয়ো থেকে গিয়েই।

সম্প্রতি এ বিষয়ে শোনা যাচ্ছে দৃষ্টিপাতের আলোচনা। ফলে দেশজ সাহিত্যের দিকে মন যাচ্ছে, যেমন চেষ্টা হচ্ছে আমাদের কুটিল ইতিহাসের জট খুলতে। আঠারো বা উনিশ শতকের বহু বিদ্রোহমূলক আন্দোলন আজকাল তাই স্বদেশপ্রেমের ও প্রগতিমূলক শ্রেণীবিন্যাসের চেষ্টার পর্যায়ে ফেলা হচ্ছে; সন্ন্যাসীফকির থেকে সিপাহী বিদ্রোহকে মনে হচ্ছে স্বাধীনতার প্রথম অসম্পূর্ণ

চেষ্টা। অবশ্য এখনো হয়তো অনবহিত ভুলত্রুটি ঘটছে, অতি-কথনের ঝোঁকও হয়ত প্রতিবাদের উৎসাহে কিছু বেশি হয়ে যাচ্ছে, হয়তো সব বিষয়ে সমান জ্ঞান বা বোধের বিনয়হীন অভাব থেকে যাচ্ছে। হয়তো এখনো য়ুরোপের পুনরাবৃত্তি খোঁজবার সহজ ইচ্ছায় মনে হচ্ছে সাঁওতাল বিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ—সরাসরি কৃষক-বুর্জোয়া অভ্যুত্থান, অথচ কৃষক অভ্যুত্থান যে ভারতের ছিন্নভিন্ন সামন্তিক স্বার্থের শেষ কামড়ের সঙ্গেও অবস্থাচক্রে হাত মেলাতে পারে, মার্কসবাদীর পক্ষেই এই জটিল বিচার সম্ভব, যেমন সম্ভব রামমোহন রবীন্দ্রনাথের জলধারাকে হ্রদ সংজ্ঞায় সীমানির্দিষ্ট করা অথচ তার নির্দিষ্ট খণ্ড প্রগতিমূলক মূল্য নিরূপণ : একদিকে ভারতের বুর্জোয়া বিকাশ বিদেশী শাসনব্যবস্থার চাপে খণ্ডিত, তাই ভারতের আধুনিক পর্ব ও ঐক্যবন্ধন বিড়ম্বিত অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর; অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে প্রাচীন সামন্তিক প্রতিক্রিয়া এবং সেই বিচ্ছিন্ন স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে জাগরূক জনআন্দোলনের চেষ্টার দোটানা :

'In as much as this *process* was a reflection of a colossal development of productive forces, in as much as it helped to destroy national isolation and the contradiction between the interests of the various peoples, it was and is a progressive *process,* for it is creating the material conditions for a future world socialist economic system.'

আবার একই সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় বলতে হচ্ছে :

'In as much as the latter *tendency* implied a revolt of the oppressed masses against imperialist forms of amalgamation, in as much as it demanded the amalgamation of peoples on the basis of collaboration and voluntary union, it was and is a progressive *tendency,* for it is creating the psychological conditions for the future world socialist economic system.'
—*Stalin*

এই ডায়ালেকটিক্স্ ও তাৎকাল্য ভুলে পোক্রভস্কির মতো আমাদেরও ইতিহাসসন্ধানে বর্তমানের চোখে অতীতকে দেখতে গিয়ে ইতিহাস বিকৃত করার সম্ভাবনা বর্তমান, যার বিরুদ্ধে রাশিয়ায় স্টালিন, জদানভ ও কিরভ্কে লড়তে হয়েছিল।

মুস্কিলটা আরো বেশি হয়ে পড়ে যখন এই একপেশে মার্কসবাদের প্রয়োগ হয় সাহিত্যবিচারে। তখন পোক্রভস্কি-পেরেভেরজেভের মতো মনে হয় :

'There is no individual in literature. To understand Byron we must take a description of English aristocratic society, for the person of Byron does not exist. Neither does Pushkin.'

এ বিচারে ব্যাপক ইতিহাসের সংক্ষেপ বিকার ছাড়াও বিশেষ শিল্প-
াহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধানুরাগ, বোধ বা যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবও প্রায় দেখা যায়।
লে রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভার বহুধাকীর্তির অনস্বীকার্য দান বাদ পড়ে
য়। গ্রীক সাহিত্য, দান্তে, সেক্সপীয়র, গয়টে, বালজাক থেকে প্লাটেন, বয়রনে,
াউটস্কি, হারনেস্, ইবসেন প্রভৃতির আলোচনায় মার্কস এঙ্গেলস অসহিষ্ণু
ালোচনার বিরুদ্ধে বহু প্রামাণ্য উদাহরণই দিয়ে গেছেন, যেমন লেনিন
য়েছেন টলস্টয় বিষয়ে তাঁর আলোচনাগুলিতে। পিতৃস্বরূপ নির্দেশের অর্থ
িতৃত্ব অস্বীকার নয়, এমনকি মাতৃতন্ত্রেও।

গয়টে বা বয়রনের আলোচনা থেকে শিক্ষণীয় বিশেষ করে সাহিত্য বিচারের
দ্ধতি। প্রথমত সামাজিক রাজনৈতিক পটবিচার না করে সাহিত্যের ব্যাপক
িচার অসম্পূর্ণ, আবার যদি পটবিচারের মূল্য নিরূপণের সঙ্গে সাহিত্যিক
ূল্য নিরূপণ না মেলে, তাহলে তা মেলাতে হয় সংক্ষেপে নয়, পুনর্জিজ্ঞাসায়,
িল্প-সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসের পটে মিলিয়ে এবং সাহিত্য শিল্পের
্রিয়াগত রূপান্তরগত নিজস্ব সার্থকতা বা মানবিচারের মর্যাদা রেখে। অনেক
ময়ে হয়তো ঐ শেষোক্ত অর্থাৎ সাহিত্যিক বিচারণা থেকেই সমাজ
াজনীতিগত পুনর্বিচারের সূত্রপাত। কিন্তু মুখ্যত সমাজ রাজনীতির দিক
থকে বিচারে এ সংক্ষেপের বিপদও সম্ভব, যেমন অন্যপক্ষে সম্ভব সাহিত্যিক
ত্বরক্ষার গণ্ডিতে ঘুরে ঘুরে বিকাশের পথরোধ করা। রবীন্দ্রনাথকে বাংলা
ংস্কৃতির আদি-অন্ত ভাবাও যেমন শেষের দলের বিলাস, তেমনি রবীন্দ্রনাথকে
ালীপ্রসন্ন দীনবন্ধু থেকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা এবং অতঃপর বর্জনীয় বলাও
াহিত্যিক দিক থেকে অত্যুক্তি। ঈশ্বর গুপ্তের মানস ও লিখন রীতি এবং
মাজোৎসারী কিছুটা উদভ্রান্ত ব্যঙ্গের মেজাজ আমাদের দ্রষ্টব্য নিশ্চয়ই বাংলা
াব্যের ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে, কিন্তু তাই বলে গুপ্তকবির রচনার
াহিত্যিক মূল্য মাইকেল বা অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় নয়।
ার্কসবাদী এদিক থেকে এখনও অসতর্ক মনে হয় কারণ তিনি দীনবন্ধু বিচারে
ীলদর্পণই মুখ্য নাটক ধরেন, সধবার একাদশী বিচারেই আনেন না, যদিও শেষ
াটকটি দীনবন্ধুর তো বটেই, বাংলা ভাষায় বোধহয় শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক।
সই জন্যই তাঁরা রবীন্দ্রপ্রতিভার পুতুল খেলা শেষের কবিতা বা অন্যপক্ষে
ম্প্রতি আবার বৌঠাকুরাণীর হাটের মহিমা কীর্তন করেন, গোরা বা চতুরঙ্গ
া গল্পগুচ্ছ অবজ্ঞেয় রেখে। ঈশ্বর গুপ্ত, টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু বা
াইকেলের বিচারেও সাহিত্যিক মান নমিত করার দরকার নেই, তাঁদের
ঐতিহাসিক মর্যাদা, এমনকি বিশেষ সাহিত্যিক গুণাগুণ উপভোগে বা
আলোচনায়। শিল্পসাহিত্যে একেশ্বর নেই, ইতিহাসেরই মতো।

এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর একজন বিশিষ্ট দিক্‌পাল। তাঁর মানবিকতার মার্গে
ইংরেজি শিক্ষার অপেক্ষাকৃত সার্থকতা, অথচ এবং তার ফলেই তাঁর দেশজ
জীবনের বোধ। নিরাপদ ধর্মনির্মাণে ঋষি মুনিদের দিকে সন্ধানও তাঁর নেই,
আবার দেশছাড়া সাহেবিয়ানাও তিনি করেননি; তাঁর সমাজ-সংস্কারের পিছনে
ছিল তাঁর যুক্তিসঙ্গত শুদ্ধ মানবিক হৃদয়বত্তাই—এ সবই এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য এবং
হয়তো বিবেচ্য তাঁর নিঃসঙ্গতা, তাঁর প্রবীণ বয়সের নৈরাশ, কলকাতা ছেড়ে
কর্মাতাড়ে সাঁওতালদের মধ্যে ফেরার যাত্রার ঐতিহাসিক রূপক।

আশা করা যায় মার্কসবাদীর আলোচনায় দেখা যাবে কিভাবে দেশজ রীতি, দেশজ বিন্যাস, বর্তমান বিশ্বব্যাপ্ত চেতনায় হাত মেলাবে, কিভাবে একই শ্রেণী সমাজের মোটামুটি একই শ্রেণী থেকে বিদ্যাসাগর, হুতোমও আসেন, শশধর বিনয়কৃষ্ণও আসেন, বিরাট বহুধাভক্ত রবীন্দ্রনাথও আসেন—যিনি, মার্কসবাদীর হঠাৎ মনে হতে পারে সাভারকরের গুরু, যিনি আবার ব্যাপকভাবে কখনো বা মার্কসবাদীরও তো গুরু। মার্কসবাদী এখনও সাহিত্যনিষ্ঠার পরিচয় হয়তো দেননি, কবিতা তিনি অসম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করেন, রূপকথার জগৎ তাঁর ছক থেকে বাদ দেন, এবং এক্‌-এক্‌ কামানের গানের শ্লোকে জঙ্গীকর্মীকে না পেয়ে হতাশ হন। নিকৃষ্ট মার্কসবাদীরা আবার আলোচনায় নেমে, কটুকাটব্য গালিগালাজকে ভাবেন ডায়ালেকটিক্স, বাক্যের অপব্যাখ্যা করেন, প্রতিপক্ষকে অসম্পূর্ণভাবে বা মিথ্যাভাবেই উদ্ধৃত করেন, বোধের ও জ্ঞানের অভাবকে ঢাকেন অন্ধের আত্মম্ভরিতায়। তবু এই শিকড়ের অন্বেষার চর্চায় সাহিত্যিক লাভ হবে শেষ পর্যন্ত এ আশা কি করা যায় না? তখন হয়তো আর রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য এবং তাঁর সমগ্র কবিস্বভাব বাদ দিয়ে তাঁর গদ্য মতামতের থেকে ইচ্ছামত উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কসবাদী প্রমাণ করতে যাবেন না তিনি কতখানি সাম্প্রদায়িক বা কতখানি ইংরেজভক্ত—বা অন্যপক্ষে, সাম্যবাদের প্রায় পুরোধা। ...থের বিরাট রচনাবলী থেকে অবশ্য সবরকম মতবাদেরই সমর্থন কম-বেশি বার করা যায়। কিন্তু সমগ্র কবিসত্তাই কবিবিচারে মূল বিবেচ্য, কবিজনোচিত স্বভাবগুণে কবিদের মতবাদ প্রায়ই অস্পষ্ট থাকে, আরো আমাদের উনিশ-বিশ শতকের সমাজের অস্পষ্ট গোঁজামিল অবস্থার জন্যে সে হাওয়ায় হাওয়ায় যে-কোনো সতত কবি দোদুল্যমান বা গতিশীল হতে বাধ্য কবির স্বাভাবিক মতবাদোত্তর মানসের তালে তালে, খানিকটা গয়টের মতো 'ইন্‌ এ ডব্‌ল্‌ রিলেশন টু দি জার্মান সোসাইটি অব হিজ্‌ টাইম'—যদিচ বলা ভালো, রবীন্দ্রনাথ গয়টে নন, বাংলা জার্মানি নয়, এবং রবীন্দ্রনাথের বাংলার দ্বিধা সম্পর্ক গয়টে-জার্মানির দ্বিধা সম্পর্ক নয়, তার তুলনামাত্র। এমনকি, দেখা যায় গদ্য ভাষণের স্পষ্ট মতবাদ থাকে একরকম এবং কবিক্রিয়ার রূপান্তর ঘটনে সৃষ্ট রচনার পুরুষার্থ হয়ে ওঠে আপাত বিপরীত। কাব্যে প্রগতিশীল সংসারী নিরাপদ চসর ও চাষী বিদ্রোহের প্রতিভূ সাত্ত্বিক কিন্তু মৃতপ্রায় কাব্যের উজ্জীবক ল্যাংল্যান্ডের মধ্যে এর একটি প্রকাশ দ্রষ্টব্য। অবশ্য দ্বিতীয় দফায় নিশ্চয়ই কোনো সাহিত্যিকের বিচারে তাঁর মতামত, তাঁর প্রকাশ্য মতামত, এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের তথ্যও কাজে লাগে; কিন্তু প্রাথমিক আক্রমণ হওয়া চাই সাহিত্যগত। অবশ্য তার জন্যে প্রাথমিক দরকার সৌন্দর্যের বোধ ও জ্ঞান, যার কথা মার্কস বলেছিলেন,

'hence man also creates according to the laws of beauty.'

এবং যার জন্যে প্রথম প্রয়োজন বোধশক্তি :

'as music awakens only man's musical sense, and as the finest music has no meaning for an unmusical ear.'

তারপরে আসে সমাজে প্রতিফলনের অন্বেষণ। এখানেও মার্কসবাদী

ক সংক্ষেপ নেই, তাছাড়া এখানেও আপাতবৈপরীত্যের সম্ভাবনা আছে :

'It is wellknown that certain periods of highest development of art stand have no direct connection with the general velopment of society, nor with the material basis and the eleton structure of its organisation.'—A Contribution to the tique of Political Economy.

অধিকন্তু অনেক সময়ে আমরা ভুলে যাই যে এক সমাজের প্রতিফলন মূলত বিশেষ করে সমাজ প্রভাব বিশ্লেষণের দিক থেকে, অর্থাৎ বুর্জোয়া জের গোটা প্রতিফলনের ভুক্তভোগী শুধু লর্ড বাইরন বা শেলি নয়, বের ছেলে কীটস্ও। বুর্জোয়া সমাজের শ্রমিক কাব্যও শ্রেণীহীন সমাজের য় নয়, বুর্জোয়া সমাজেরই একটা বিশেষ প্রতিবাদী প্রতিফলন। যার জন্যে লস বলেছিলেন :

'This poetry of past revolutions seldom has a revolunary impact in later periods, because in order to affect the asses it must also give the mass prejudices of the period.'

একদা মার্কসবাদীর মনে হয় শেষের কবিতাকে মূল্যবান কারণ তাতে ীর দ্বন্দ্বে প্রেম ব্যর্থ অর্থাৎ অমিত রে ব্যারিস্টার উচ্চশ্রেণী এবং লাবণ্য াপক কন্যা নিম্নশ্রেণী, এমনিতর একটা সাহিত্য তথা শ্রেণী ব্যাখ্যার বিলাস, আবার মার্কসবাদীরই লেখায় মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাম দীনবন্ধু মাইকেলের প্রভেদটা সাহিত্যগত নয়, শুধু শ্রেণীগত। দেশজ তের লৌকিক যে সাহিত্যধর্ম, যে চাল কিছুটা হয়তো দীনবন্ধু মাইকেল গুপ্তদের মধ্যস্থতায় পেয়েছিলেন, যেটা হয়তো মহর্ষির সংস্কৃত সংসারে ন্দ্রনাথ পাননি (৫ নম্বরে অবনীন্দ্রনাথ কিছু পেয়েছিলেন), সে সাহিত্যিক শক্তি মার্কসবাদীরাও চর্চা করবেন। তখন রবীন্দ্রনাথকে, ধর্মবিশ্বাসী জি যুগের রবীন্দ্রনাথকেই বাদ না দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারীদের ষ্ঠ কীর্তিমান তরুণ সুকান্তর বিচার হবে—বিশেষ করে সুকান্তর পরিণত রাবীন্দ্রিক কবিতাগুলির।

আরাগঁ সে চর্চার বিফলগামিতার বিরুদ্ধে সাহায্য করতে পারেন তাঁর জর কাব্যচর্চার উদাহরণে। তাঁর স্বদেশসংক্রান্ত অর্থাৎ কর্মজগৎ সংলগ্ন কাব্যে াগঁ কখনও জনসাধারণ বলে কিছু কল্পনা করে 'নেমে' লেখেননি নিজের গ থেকেই সোজা লিখেছেন, যে লেখার ভিতে আছে তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর নীতি, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক ধ্যানধারণার দীর্ঘ ও জটিল সাধনা। তিনি সুররেয়ালিস্ট আভাসে ইঙ্গিতে আইন উড়িয়ে ফ্রান্সের কথা বলেন, প্রেমের কথাও। এল্সার কথা, মায়াকফস্কির আত্মীয়া বান্ধবী, নিজে যিনি খকাও স্বামীর মতোই। তাঁর এই প্রেম এবং তাঁর কাব্য কলাকৌশলের াচিন্তা যে আক্রান্ত হয়নি, তা নয়। তিনি নিজেই তার জবাব দেন : তার র চেয়ে কবির পক্ষে আরো ভালো, উপযুক্ত বিষয় আর কি আছে। তিনি ন : আশা করি সেদিন আসবে যখন লোকে এই আমাদের অন্ধকার রাত্রির

দিকে পিছু ফিরে দেখবে এই অগ্নিশিখা। আর কোন্ শিখা আমি জেব
ধরতে পারি যদি না ধরি আমার ভিতরের এই আলোই? তাই ভবিষ্যতের আ
কি ভাবনা, যদি সবচেয়ে বেশি ঘৃণার সময়ে এই শোষিত দেশকে আমি একবার
দেখাতে পারি আমার প্রেমের ভাস্বর মুখখানি?

ভগ্নহৃদয় নামক বইতে প্রথম কবিতায় বলেন : হে আমার প্রেয়সী, প্রেয়স
আমার, তুমি শুধু আছ......পরের বইতে এল্সার চোখের অনুপ্রেরণায় আ
ত্রুবাদুর-শোভন জটিল কুশলী গীতি। অথচ আরাগ'র জগৎ বিশ্বব্যাপ্ত, শু
তো ফ্রান্স নয়, স্পেনও আরাগ'কে ডাকে, তিনি বিশ্বের রেডিও শোনেন কা
ক্রুসেডে যান "ওদের" সুলতান সালাদিনের বিরুদ্ধে। কেবল উপমা উৎপ্রেক্ষ
নয়, ইতিহাসের ও সাহিত্যের নানান অনুরূপ অবস্থা ও আবেগের বিন্যাস
আরাগ'র কাব্যের ইমারৎ। রোমিও ফিরে আসে স্বদেশী ফরাসী কাব
হ্যামলেটের পুনরুত্থান বিস্তৃত হয় তাঁর কবিতায়। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতী
রিচার্ড-এর চাল্শের বিষয়ে শ্লেষার্থক একটি কবিতা আরাগ'র নিজেরই কাহি
১৯৪০-এ তাঁর তেতাল্লিশ বছরে চাল্শের দশায় ফ্রান্সের দুর্দশায় :

স্বদেশ আমার নৌকা নোঙরহীন
হালে আর তার মাল্লারা কেউ নেই
আমি যেন সেই রাজা অসহায় দীন
দুঃখের চেয়ে দুঃখী ছিল গো যেই
মহা দুঃখের সিংহাসনে আসীন।

কিন্তু তারপরে তাঁর মনে পড়ে যায় ভোক্ল্যারে জাঁন দার্ককে, জাগে প্রতি
রোধের আশা। 'স্বাধীন এল'কা'তে আছে সেই লাইনগুলি যা বহুলক্ষ মু
হয়েছিল গুঞ্জিত এবং যা জিদকে গভীর নাড়া দিয়েছিল :

প্রেয়সী ছিলাম তোমার আলিঙ্গনে
বাইরে গাইল অস্ফুট গুঞ্জনে
কে এক পুরাণো ফরাসী দেশের গান
যন্ত্রণা থেকে খসল ছদ্মবেশ
নগ্ন পদধ্বনির তড়িৎ রেশ
স্পন্দিত করে মৌন হরিতে প্রাণ।

এসে পড়ি আমরা আকিতেনের এলেওনোরের জগতে, ত্রুবাদুর অ
রাজা গীওমের মেয়ে, ত্রুবাদুরদের কাব্যলক্ষ্মী, সেই রূপসী কবিপ্রেয়সী হ
ওঠেন জাতীয় গাথার প্রিয়া স্বাধীনতা। বই শেষ হয়—এল্সা, আমি তোমা
ভালোবাসি—এই স্বীকারোক্তিতে।

দ্বিতীয় বইটির আরম্ভ এল্সার চোখ নিয়ে, যা কবির কাছে তাঁর পে
তাঁর গোলকুণ্ডা, তাঁর হিন্দুস্তান। এই বইতেই আছে একান্ত মূল্যবান ভূমি
যাতে আরাগ' গভীরভাবে কলাকৌশলের আলোচনা করেছেন, আত্মসম
করেছেন মতবাদের বিরুদ্ধে, অজ্ঞান ও বোধহীনতার বিরুদ্ধে। ভূমিকাটি থে
বোঝা যায় কেন তাঁর কাব্যের ডায়ালেকটিকে ঐতিহ্যের ক্রমাগত কিন্তু তা
নবরূপায়ণে। ভাষার বিষয়ে তাঁর উক্তিও শ্রোতব্য : ভাষার গভীর পর্যালোচ

জেবং প্রতিপদে ভাষার পুনরাবিষ্কার ছাড়া কাব্যচর্চা অচল। এবং তার জন্যে র আষার স্থির গণ্ডি, ব্যাকরণের নিয়ম, কথনের কানুন ভাঙ্গতে হয়। এইতেই কবারবিরা স্বাধীনতার পথে এত অগ্রসর হয়েছেন এবং এই স্বাধীনতাতেই সম্ভব য়েছে আমার পক্ষে যথাযথ হবার চেষ্টা করা, এই খুবই বাস্তব স্বাধীনতায়।

প্রেয়স আরাগ'র নতুন ভগ্নহৃদয় নামক বইটির উল্লেখে কবিবিকাশের সংক্ষিপ্ত র আরিচয় শেষ করি। পরিণতির প্রক্রিয়া এই শেষ বইটিতেও স্পষ্ট, হয়তো এতে য়, শব্দকনিক বা আবেগবস্তুর দিক থেকে চমকপ্রদ কিছু নেই, সেদিক থেকে হয়তো ন কাছে বই চংক্রমণ খানিকটা। হয়তো বিদেশী ফাসিস্তকে প্রতিরোধের যে আবেগ উৎপ্রেআরাগ'কে ও ফ্রান্সের বেশিরভাগ লোককে নাড়া দিয়েছিল, সে আবেগের রূপ বিন্যাস মাত্রা ফ্রান্সের বর্তমানে ঘরোয়া দৈনন্দিন চেষ্টার অবস্থায়, অন্তর্বিরোধের কাধারণ্যে সম্ভব নয়, কবি ও জনসাধারণ বোধহয় সে ভাবে ও সে উন্মাদনায় দ্বিতীজকে একসূত্রে গ্রথিত নন। কিন্তু তাই বলে হুকুমজারি করে লাভ নেই, লাভ কাহিনই এক কবির কাছে আরেক কবির রচনারীতি দাবি করায়, কারণ কবিতা : ক্তির সত্তাসাপেক্ষ, যন্ত্রপণ্য নয়, তাইতো মার্কসকে বলতে হয়েছিল :

'My property is form, it is my spiritual individuality. The style is the man.' প্রতিবাদ করে বলতে হয়েছিল : 'You admire the delightful variety, the inexhaustible wealth of nature. You do not demand that a rose should have the same scent as a violet, but the richest of all, the spirit, is to be allowed to exist in only one form?'

গে প্রা
নক্ষ মা বহুকর্মী আরাগ'র কাব্য প্রশস্তি শেষ করি অন্যতম ফরাসী কবি এলুয়ারের ষণ থেকে কিছু উদ্ধৃতি করে। স-সোয়ার নামক সান্ধ্যপত্রে ধর্মঘটী খনি-মীদের উপরে সেনেগালী শান্ত্রীদের অত্যাচারের প্রতিবাদের জন্যে পরিচালক রাগ' দণ্ডিত হন বলে তাঁর বন্ধুরা গত ৮ই অক্টোবর এক সভা ডাকেন, য়ারের লেখাটি সেই সভার জন্যে লেখা : সেই সব কবি যাঁদের আমি নি : আমার বন্ধু আরাগ'র মধ্যে মানুষ জানতে পেল আত্মপ্রকাশ

তাদের সীমার মধ্যে
এবং তাদের সীমার বাইরে
তাদের গণ্ডির মধ্যে
আর তাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে

গণ্ডি কথাটা একচোখো কথা
মানুষের তো দুইচোখ সারা বিশ্বে খোলা

তাঁর পে যতো কবি আমি জেনেছি সবার মধ্যে আরাগ'ই সেই কবি যাঁর আছে বান ভূমিকায়ে ন্যায়শক্তি দানবদের বিরুদ্ধে যাবার ন্যায়শক্তি—এবং একদা আমার আত্মসমক্ষেও। তিনি আমার কাছে উদ্ঘাটিত করেছিলেন সত্যের পথ, আজ আবার কাটি পেশ উদ্ঘাটিত করলেন সবার কাছেই যারা বোঝে না যে অন্যায় অবিচারের কিন্তু আদ্ধে লড়াই নিজেদেরই জীবনের লড়াই, আশায় প্রস্ফুট জীবনের জন্যে, পর্যালোকের প্রতি ভালোবাসার জন্যে।

১০

পরিবর্তমান এই বিশ্বে

বতনের সাক্ষ্য আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতার নানা স্তরে। সে পরিবর্তন যেমনি দ্রুত আর তেমনি জটিল ও গভীর। শিল্প-সাহিত্যেও এ অভিজ্ঞতা সক্রিয়। সেখানে বরং ব্যাপারটা আরো অসরল, কারণ শিল্প-সাহিত্যের নিজস্ব স্বভাব ও ঐতিহ্যের গুণে অভিজ্ঞতা বিশেষ বিশেষ রূপ পায়।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই প্রচণ্ড ব্যাপ্তির মধ্যে বিশেষ ও নির্বিশেষে একতার আভাস। বিপরীত হয়ে উঠেছে আত্মীয়, ঘর বাহির, পর আপন। আশ্রমবাসী মৃগসুকুমার সিম্‌বলিস্ট পরিণতি পাচ্ছে মার্ক্সিসমে। তাছাড়া, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের, ন্যায়বিশ্বের ঘনসন্নিবেশ। এই প্রতিবেশিত্বের দৃষ্টান্ত মেলে সদ্যমৃত সুররেয়ালিস্‌মের কাব্যেচিত্রে, শোএন্‌-বর্গের বা হাবার সঙ্গীতে। সিম্‌বলিস্ট্‌ কাব্যে, সেজানের চিত্রে ও. দ্যবুসি থেকে রুসেল অবধি ফরাসী সঙ্গীতেও এই গ্রাম-সম্পর্কের আত্মীয়তা। পিকাসো যে কবিতা লেখেন ও স্ত্রাভিনস্কি যে তাঁর বন্ধু, সেটা আকস্মিক নয়, যেমন নয় তাঁর ফ্যাসিস্টবিদ্বেষ। এস. গীডিঅন্‌ যে ('স্পেস্‌ টাইম এন্ড আর্কিটেকচর'-এ) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তা যথার্থ। যদি কারো শুধু আধুনিক সঙ্গীত ভালো লাগে অথচ আধুনিক কাব্য বা চিত্র অসহ্য মনে হয়, তাহলে তাঁর সততায় বা তাঁর স্বভাবের সমগ্রতায় সন্দেহ স্বাভাবিক; বা কারো যদি শুধু আধুনিক সমাজ বা রাজনীতি পছন্দ হয়, কিন্তু বিজ্ঞান নয় বা শিল্পসাহিত্য নয়।

মার্কস্‌ থেকে বিকশিত সমগ্রতার পটেই কি বার্টকের হারমনির সুরেলা এবং দেশজ ছন্দে বিস্তৃত আধুনিকতা সুবোধ্য নয়? রুথ্‌ বা ওঅল্‌টনের বেলায় এই কথাই কি ভিন্নভাবে প্রযোজ্য নয়? চিত্রে কিউবিস্‌মের মতো সঙ্গীতে জ্যাজ্‌ পরিপ্রেক্ষিতের অচলায়তন ভেঙেছে বলেই কি রয়হ্যারিস বা কিছু সোভিয়েট সঙ্গীতের বর্তুল শব্দলহরীর তীব্র ঐক্যতান? আইসেনস্টাইনের আশ্চর্য শিল্পতত্ত্বের বই 'দি ফিল্‌ম্‌ সেন্‌স্‌' থেকে একটি উদ্ধৃতি হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

'Modern Aesthetics is built upon the disunion of elements, heightening the contrast of each other: repetition of identical elements, which serves to strengthen the intensity of contrast... Repetition may well perform two functions.

One function is to facilitate the creation of an organic whole. Another function of repetition is to serve as a means of developing that mounting intensity...'

বৈজ্ঞানিকও এ অভিজ্ঞতার প্রকৃতি সমর্থন করেন। গেস্টাল্ট্ ও আইডেটিক্স্ মনোবিজ্ঞান পদার্থবিদের সুরে তাল মিলিয়ে বলে যে সমগ্র অংশগুলির যোগফল মাত্র নয়। কারণ প্রোসেস বা পরিণতি যোগফলে নয়, সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ ক্ষেপেই অর্থের উদ্ভাস। আধুনিক বিজ্ঞানের সাধারণ তাৎপর্য ঐখানেই।

আর বিজ্ঞানের আধুনিকতা শুধু নব্যতা নয়। প্রকৃতি ও মানুষের ব্যাপক ও সূক্ষ্ম যে জ্ঞান গত তিরিশ বছরে অর্জিত, সারা ইতিহাসের জ্ঞানসংগ্রহের চেয়ে পরিমাণ তার বেশি। কিন্তু এই বৃহত্তর জ্ঞানের উপলব্ধি সমাজে কমেছে আর তার প্রয়োগ হয়েছে দুষ্ট। শুধু বিজ্ঞান আজকাল জটিলতর বলে নয়, বিজ্ঞান আজ পেশা হয়েছে বলেও। বোঝাই যাদের পেশা, বুঝুক তারাই, বিজ্ঞান তো আজ প্রায় পণ্যদ্রব্য। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগে জগচ্চিত্র দেখতে ও গড়তে যদি হয়, তাহলে কপালে আছে গত অষ্টাদশ বছরের মতো অনেক দুঃখ, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, প্রতিষেধ্য রোগে মৃত্যু, নানা বঞ্চনা।

দ্রুত পরিবর্তনে উদ্‌ভ্রান্ত বিশ্বে তাল কেটেছে বস্তুর নব নব উন্নতি আর সমাজমনের মধ্যেও। যারা বোঝে না এই পরিবর্তনের তাৎপর্য, তারাই সাজে হর্তাকর্তা। বিজ্ঞান বা অর্থনীতি নয়, বহু দেশেই কর্তৃত্বের চাবি শুধু বর্ধিষ্ণু ও বৃদ্ধের হাতে। ফ্যাসিস্ট দেশে এঁদেরই অল্পবয়স্ক জ্ঞাতিকুটুম্বরা জ্ঞানের তোয়াক্কা না রাখলেও তার ব্যবহারে তৎপর, সৃষ্টির ব্যবহারে নয়, ধ্বংসের কলাকৌশলে।

শোচনীয় ব্যাপার হচ্ছে এই। বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে সম্ভব আজ সকলের হাতে খাদ্য দেওয়া আর সম্ভব কাজ, ভবিষ্যৎ ভরসা, স্বাধীনতা। কিন্তু পাতে শুধু পড়ছে নানা দুর্ভোগ, রক্তপাত. অনাহার আর অত্যাচার। বিজ্ঞানের সাহায্যে ঠিক বাস্তবে কতখানি পরিবর্তন সম্ভব তার বোধ যতো বিস্তার পাবে, বর্তমানে ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে ততো বেশি, কপালফেরের ক্ষমতা ও ইচ্ছা বৃদ্ধি পাবে।

ব্যর্নালের মতে বিজ্ঞানের বিদ্যালয়প্রচলিত চিত্রটির স্থান বৈজ্ঞানিকের যাদুঘরে। নিরালম্ব শূন্যে সত্যের সাধনা, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জানে, রজ্জুভ্রম।

তবু দ্রুতগতির জন্য দুর্বোধ্যতার অভিযোগ মানতে হয়। বিংশ শতাব্দীর বিকাশের মাত্রায় অষ্টাদশ অতিবিলম্বিত। ধরা যাক কোয়ান্টাম্‌তত্ত্ব, যাতে অণু ও অণুকণার গঠন ও প্রক্রিয়ার ধরন বোঝা যায়। তার ফলে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের জাতিভেদ ঘুচে গেছে। জীবনরসায়নের আরম্ভে আরেক পরিবর্তন নিহিত, প্রাণবন্ত সব কিছুর রসায়নিক ভিত্তি; ক্রোমসোমে উত্তরাধিকারের জড়গত অস্তিত্ব; তারপরে আছে জন্তু ও মানুষের আচারের বিজ্ঞান, যার জন্যে শক্তিমদগর্বিত পরাবিদ্যার শেষ তুরুপ—মনের স্বাধীন বিভাগও আজ অচল।

বিজ্ঞানের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন আমূল ও দ্রুত পরিবর্তন আগে কখনো দেখা যায়নি। অবশ্যই শরীর ও মনের বিচ্ছিন্নতা আজ অস্বীকৃত। তাই প্রয়োজন হয়েছে পরিবর্তিত মানস, গ্রীক আমলের দীর্ঘ দায়ভাগ পিছনে

ফেলে। প্রাচীন বৈয়াকরণিক ন্যায়ের স্টেটাস্‌কো-তে আপেক্ষিকতা বা কোয়ান্টাম্‌তত্ত্ব পাগলের প্রলাপ কিন্তু অণুকণা আর নক্ষত্রবিশ্বসমূহের আচার-ব্যবহার দেখতে গেলে এরাই সত্য। এইখানেই আধুনিক বিজ্ঞানে ও শিল্প-সাহিত্যে মিল, স্থূলযুক্তির ব্যাকরণে এ'রা বিশ্বের চিত্র মনগড়া করেন না। সরলতা নয়, সততাই লক্ষ্য।

আরেকটা অগ্রগতির চিহ্ন নানাক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। জীবন্ত কি মৃত যে-কোনো ব্যবস্থাধারায় সমগ্রের মধ্যে এমন সব বিশেষত্ব ফোটে যা স্বতন্ত্রভাবে অংশবিশেষে প্রকাশিত নয়। এক স্তরে যা আকস্মিক ঘটনা মনে হয়, আরেক স্তরে তাই সংখ্যা-বিজ্ঞানের নিয়মে স্বয়ম্প্রকাশ। নিউটনীয় বিজ্ঞানের অসংলগ্নতা ও স্বাধীনতার অতিমাত্রা আজকাল গোষ্ঠীগত যৌথ ঘটনাবলীর পর্যালোচনায় রূপান্তরিত। মার্কস্‌ ও এঙ্গেল্‌সের চিন্তাধারা এই বিকাশের পথ দেখিয়েছিল, শতাব্দী পরে তার উপলব্ধি হচ্ছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ আজ কাছাকাছি এসে মিলছে। বিজ্ঞানের বিলিব্যবস্থায় তাই নতুন সমস্যা, নতুন যোগাযোগের প্রশ্ন। বিশেষজ্ঞের স্বাতন্ত্র্য ভেঙে যাচ্ছে সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজনে। ফলে বিজ্ঞানের বাইরের জগতে নির্ভর করতে হচ্ছে বেশি। বিজ্ঞানকর্মীর সংখ্যা আজ লক্ষ লক্ষ ও ব্যবসাবাণিজ্যে উৎপাদনশিল্পে বিজ্ঞানকর্মীর প্রয়োগ ব্যাপক ও গভীর। টাকাও আসে ইন্‌ডাস্ট্রি থেকে য়ুনিভার্সিটির চেয়ে ঢের বেশি। তবু কেন বিজ্ঞান জনগণমন-অধিনায়ক দুঃখত্রাতার আসনে নেই? থাকা উচিত, সে কথা পুরানো, কিন্তু তবু চি'ড়ে ভেজেনি। কারণটা নগণ্য নয়, এবং আজও অতিকায় জন্তুর মতো কারণটা বর্তমান আমাদের মানবসমাজে। এটা বুঝলেই তবে এটা দূর করা সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিকও তাই আজ সমাজকে বোঝায় মন দিচ্ছে, কেন সমাজকে উন্নত করায় শক্তিশালীর আপত্তি। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও সাহিত্যিকদের বা রাজনীতিকদের মতো নানান ঝোঁক। একদল ঘাড় ফিরিয়ে চান সেকালকে, ধর্ম, দেশাচার, পারিবারিক পরমার্থ। নাৎসিরা এই কথা স্বজ্ঞানে বলত, অসহায় পেতাঁ্যার মুখে এর প্রতিধ্বনি শোনা যেত, ইংলণ্ডে আমেরিকায় ভারতবর্ষে কণ্ঠের চাষ করে যাঁরা খান, তাঁরা একথা প্রায়ই বলে থাকেন। কিন্তু আত্মসম্পূর্ণ বঞ্চিত চাষীদের খণ্ডখণ্ড গণ্ডগ্রামের সামাজিক ভঙ্গী আজ কোনো যুক্তিতেই মানায় না।

বৈজ্ঞানিক আরেকদল, বলা যায়, উদারনীতিক ছুঁৎমার্গে বিশ্বাস করেন। এ'রা একাকিত্বের স্তব্ধতায়, নিরালম্ব সত্যে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানের ঐতিহ্যের গায়ে তার সামাজিক উৎসের গন্ধ আজও ধুয়ে যায়নি। ক্যাপিট্যালিস্‌মের একক ব্যক্তিমাহাত্ম্য এবং বুদ্ধির স্বাধীন খেলা তাই এখানেও তার প্রভাব রেখেছে। এই যুদ্ধের সর্বজাতিব্যাপী প্রস্তুতিতে অবশ্য লিবরাল এ বিজ্ঞানমূর্তিটি ভেঙেছে। যুদ্ধকালীন এই প্রসার শান্তির মহত্তর প্রস্তুতিতে চলবে এবং তাতে বৈজ্ঞানিকের খাঁটি জ্ঞানচরিত্র নষ্ট হবে না, এটা কি দুরাশা? সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশ-ত্রিশ বছর ধরে তো এ আশা দেখা গেছে বাস্তবে সফল।

অবশ্য জীবনযাত্রায় যে দল নেতৃস্থানীয়, সেই নেতৃত্ব বিজ্ঞানের কর্মধারাও প্রচ্ছন্নভাবে নির্দেশ করে। সমুদ্রযাত্রী ব্যবসায়ীর যুগ সপ্তদশ শতকে তাই বিজ্ঞান মাথা ঘামিয়েছিল দিগদর্শন ও বন্দুক জড়িত বিষয়ে। অষ্টাদশের শেষে কলকারখানার ইশারায় হল রসায়নের চর্চা ও তাপমানের সাধনা। ঊনবিংশে

এল বিদ্যুৎশক্তির নেতৃত্ব। আজ শুধু একটা নতুন পুরুষার্থ এসেছে, অজ্ঞান নেতৃত্ব আজ স্বজ্ঞানে ব্যবহার্য। আণবিকশক্তি শুধু মানবিকস্বার্থে প্রযোজ্য।

বিজ্ঞানের জড়বাদে আর মন ও বস্তুজগৎ, রস ও রূপ, ম্যাটার ও ফর্মের আত্মচেতন দ্বিধা নেই। নীডহ্যাম্ বলেছেন ভালো: গ্রীকরা, বিশেষত আরিস্টটল সব কিছুই দেখতেন গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ শিল্পের ভাষায়। ভাস্কর্যে প্রতিভাত হত একপক্ষে বস্তু, শৃঙ্খলাহীন, নিরাকার মর্মর পাথর কি মাটি; অন্যপক্ষে রূপ, আকার। সুন্দর পুরুষ কি মেয়ের রূপ যা শিল্পীর মন থেকে আনতে হয় বর্বর পাথরের মধ্যে প্রচণ্ড প্রহারের ঘায়ে। রূপাকার তাই রূপবস্তুর চেয়ে মূল্যবান, প্রায় স্বয়ম্ভু। ভারতীয় শিল্পকলাতেও ভাস্কর্যের উৎকর্ষ আর ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রেও তাই প্রেরণা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ আর শুদ্ধ রূপ আর্কেটাইপ বা ফর্ম দৈবত, অলিম্পীয় বা কৈলাসভাবনা। টমিস্ট দর্শনেও দেবদূতরা এ কাজের ভার নেন। ভাববাদীর সমস্যার আরম্ভ এখানেই। ক্রোচের ভাববাদী অপিচ প্রশংসনীয় দ্বিধা-সন্ধির চেষ্টা আংশিক সমাধান হলেও আধুনিক—ব্রানকূসি বা হেনরি মুরের শিল্পে এ সমস্যা নেই, আকার ও বস্তু সেখানে দ্বৈতাদ্বৈত।

কিন্তু গ্রীকদের এই রূপবিলাসে হয়েছিল জীববিদ্যার লাভ। চোখের সাহায্যে তারা এনেছিল শ্রেণীকরণের ক্ষমতা যদিও ব্যাখ্যা হয়তো প্রায় হত ভ্রান্ত। ১৬৪০-এর আগে অবধি আরিস্টটলের ব্যাখ্যাই য়ুরোপে চলত—গর্ভস্থ ভ্রূণের বিকাশ নাকি প্রায় মর্মরমূর্তিরই পরিণতি, বস্ত হচ্ছে রক্ত, রূপায়ণ পৈতৃক বীজকল্প। কিন্তু আপনার শরীর তো হর্মিস্-মূর্তি নয়, আমার হাতটা যেমন পেন্সিলের কাঠ নয়। জীবন্ত শরীর চরম ব্যাখ্যায় ইলেকট্রন্ প্রটনের সমষ্টি নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার গঠন ও প্রণবব্যবস্থার কলাকৌশল ফাইডিঅস্ মূর্তির চেয়ে অনেক বেশি জটিল ও গভীর। তাছাড়া বড়ো কথা হচ্ছে, জীবশরীরে তথা আধুনিক নন্দনতত্ত্বে রূপ ও রস, বস্তু ও আকার অঙ্গাঙ্গি।

জ্ঞান যেন তিনমহলা বাড়ি, বাইরে দেখা যায় স্থূল চেনা রূপগুলি—মানুষে বাঁদরে, বাঘে গরুতে যেখানে মিল নেই। তারপর এই চর্মচক্ষেই দ্রষ্টব্য চর্মতলস্থ, চেরা যায় এমন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। জীবাণুবীক্ষণযন্ত্রের মহলে আবার নতুন জগৎ, কোটি কোটি প্রাণবল্লী কোষ, যারা সমগ্রের বাইরেও খণ্ড জীবনের শক্তিধর। ফর্মের দিকে এই কোষের তলার কোঠায় যে মেদবর্তকণা তার সন্ধানের দাম কম হলেও, কোষচক্রের অন্তরঙ্গ্ ক্রোমসোমে দায়ভাগবহ উত্তরাধিকার নগণ্য নয়। এই অণুগোষ্ঠীর জীবনে চলে অণুদের সঙ্গীত, ছোটখাটো সৌরমণ্ডলের মতো তানমানলয়িত সঙ্গীত বললেই হয়। প্রোটন্ ইলেকট্রনদের যেন সেখানে গ্রহকক্ষবিহার চলে।

আবিষ্কারটা মৌল। ১৯১৭।১৮ সাল অবধি লোকে বলত এই রসায়নিক তত্ত্বটি কল্পনা। হার্ডি ও ল্যাংমিউরের একাণুগোষ্ঠী ফিল্‌মে এ তত্ত্ব প্রমাণ হল প্রত্যক্ষে। দীর্ঘ হাইড্রোকার্বন রেখা দেখা গেল সত্যই দীর্ঘ; জলের উপরে অম্লের মেদ-শৃঙ্খল সত্যই আটকে থাকে, এদিকে তার অম্লভাগ জলের তলায় মিলিয়ে যায়। কৌটা-মার্কা অণুগোষ্ঠীর কৌটাবৎই ধরনধারণ। এসব তথ্য প্রবল সমর্থন পেল ইউঅল্‌ড্ ও ব্র্যাগদের এক্স-রে প্রয়োগে, যখন অণুশৃঙ্খলার ছকের বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেল। সুতরাং রূপ আজও রয়েছে। আণবিকস্তরে

কিন্তু এই রূপ আর ব্যবস্থামাত্র অভিন্নপরিচয়। যে আবেগই হোক এ মাত্রাবৃত্তে ঘূর্ণায়মান অণুদলগুলি গোষ্ঠী বাঁধে এক আপাতস্থূল রূপে। পদার্থবিদেরা বলেন এই পরমাণুগুলি মুখ্যত বিদ্যুৎ-তাড়না। অর্থাৎ স্থূলবস্তুরূপে আসলে শক্তিস্রোতপুঞ্জেরই প্রকাশ। ম্যাটার আজও বাস্তব, কিন্তু ম্যাটার ও ফর্ম আজ আর আলাদা করা যায় না। ফর্ম আজ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থারই নামান্তর, আর বস্তু আজ শক্তিপুঞ্জ, গতিশীল সম্বন্ধের রূপ।

আরেকটা মূল কথা হচ্ছে, বড়ো আর ছোটো। অণুগোষ্ঠীর প্রতিবেশিত্ব। প্রোটীন-অণুগুলি বৃহৎ যেমন হাইড্রোজেন অণুকণা সবচেয়ে ছোটো। প্রোটীনের রসায়নিক কাঠামোতে জীবদেহ তৈরি আর এই প্রোটীনে দেখা যায় যে কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন অণুরা মেরুদণ্ড এবং পাশের সারিতে পাঁজরার মতো কার্বন, নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন। গত কুড়ি বছরে উদ্ভিদ জন্তু ও মানুষের দেহে সংক্রামক রোগের সন্ধানে পাওয়া গেল এই ব্যাক্‌টিরিয়ার চেয়েও ছোট জীবাণু-বীক্ষণেরও অদৃশ্য ভাইরস্—যথা হামরোগের সংক্রামবহ অণু। এই জীবন্ত রোগাণু প্রোটীনের বিচ্ছিন্ন মৃত অণুর চেয়ে ছোট, সুতরাং তাদের গঠনব্যবস্থা নিশ্চয়ই জীবদেহের পক্ষে অভাবিতভাবে সরল। বস্তু ও রূপ, জীবন ও মৃত্যুর এখানে সীমানা মুছে যায়। ভাইরস্-অণু-র পা নেই বটে, কিন্তু বহু ব্যাক্‌টিরিয়া ও উদ্ভিদেরও নেই। হয়তো ভাইরসের শ্বাস নেই, কিন্তু বহু বীজ ও জীবাণুর শ্বাস-ক্রিয়া নগণ্য। অন্তত জীবনের তৃতীয় লক্ষণটি ভাইরসে প্রবল পরাক্রান্ত—প্রজনন। এই জীবন-মৃত্যুর সীমান্তের কনিষ্ঠ জীবদের একমাত্র ইলেকট্রনাণুবীক্ষণেই দেখা যায়।

এখানে আরেক বিস্ময়। সচরাচর অণুরা গোলাকারে ভিড় করে কেলাসিত হয়, কিন্তু এই ভাইরস্-অণুদের চেহারা লাঠির মতো। এদের ভিড়ের পরিণামও বিস্ময়কর—তরল কেলাস লিকুইড ক্রস্টাল্‌স্ অর্থাৎ এরা তিন ডাইমেন্‌সনসের বা আকারের নয়, এক কি দুইদিকে কঠিন। টিপে ধরলে ভেঙে যায় না, এলোমেলো এক ব্যবস্থায় আবার দানা বাঁধে। ডিমের ব্যাপারটাই ধরা যাক, ডিমটা উলটিয়ে-পালটিয়ে নেড়ে দিলেও আবার তার আভ্যন্তরীণ আণবিক ব্যবস্থার সাম্য ফিরে আসে এবং সেই যথাকালে বাচ্চা ফোটে। কোথায় এই ব্যবস্থাপক বা নিয়ন্ত্রক, এই সমাজকর্তা? সে প্রশ্ন মুলতবী রেখে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু এক কার্বন অণু-র কাণ্ড দেখা যাক। জীবদেহে প্রবেশান্তে মার্কামারা এই অণুদের বিচরণ লক্ষ্য করা সম্ভব। যাতায়াত বলা যেতে পারে। মৃত বিচ্ছিন্ন প্রোটীনে নয়, মস্তিষ্কের বা পেশীর জীবন্ত প্রোটীনে ফসফোরাস বা নাইট্রোজেন অণু ঢুকে পড়তে পারে, বেরোতে পারে, শরীরের ভারসাম্য তাতে অবিচলিত থাকে। এ রকম যৌথবৃত্তিতে, অণুস্তরে হলেও. নীডহ্যামের মতে সমাজের ভারসাম্যের ছকে ব্যক্তির স্বেচ্ছাসেবার কথা মনে পড়ে।

প্রোটন্ ইলেকট্রন্, অণু, অণুগোষ্ঠী, তার থেকে ক্ষুদ্রতম প্রাণকণা, কোষ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তারপরে সারা শরীর জন্তু বা মানুষ। নীডহ্যামের প্রশ্ন, ততঃ কিম্? নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থা এখানেই থামবে কেন? মনের প্রতিবেশী ভাগগুলি সমাজের যৌথআঙ্গিক, পরিবার থেকে মানব-সমাজের বিশ্বব্যাপী ঐক্যের অমোঘ গতিও তো জীবনযাত্রার শক্তির নিয়ন্ত্রণে দেশকাল-সন্ততিতে বিস্তৃত। অবশ্যই শুধু দেশ নয়, কারণ স্থানপাত্রের বিকাশ কালের বিবর্তনেই।

পণ্ডিত বলতে পারেন প্রগতির এ ছবি থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় বিধিতে টেকে না। জীববিদ্যার জগৎ স্বতন্ত্র, এ দ্বন্দ্ব তাই ভাববাদীর চিন্তার বিশৃঙ্খলা। তাই থার্মোডাইনামিক মতে যে বিশ্বে ক্রমিক ব্যবস্থা কমছে, এ তত্ত্বে জীবনের প্রগতি বাতিল হয় না। তাছাড়া এই পদার্থবিদের অব্যবস্থা নীডহ্যামের মতে মিশ্রতা বা ছকের মধ্যে অব্যবস্থা, প্রায় সোভিয়েট য়ুনিয়নে প্রাদেশিক স্বাধীনতার মতো, বা সুস্থ সমাজের সচ্ছল স্বাধীন ব্যক্তির মতো। তাই তিনি বলেছেন, মানুষের রাখীবন্ধনে যতো বড়ো বাধাই আসুক কূটনীতি আর মহাযুদ্ধ, স্থিরপ্রজ্ঞ সাম্যবাদী তবু হত্যার আগে গ্যালিলেওর মতো বলতে পারে 'তবুও পৃথিবী চলেছে।' 'ফ্রম ইচ অ্যাকরডিং টু হিজ ক্যাপাসিটি, টু ইচ অ্যাকরডিং টু হিজ নিড'—এ আর্যসত্যের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য।

বিজ্ঞানই সে কাজে স্থপতি। মানুষ আজ আর বস্তুমাত্র নয় ইটের মতো, মানুষ দেহমনে একটি বিকাশের জীবন্ত যন্ত্র, মানুষে মানুষে মৌলমিল, সমাজেরও নিয়ন্ত্রিত জীববৎ গতি ইত্যাদি কথা বিজ্ঞানের মোটা তথ্য। পেকহ্যাম্ এক্সপেরিমেন্টের বিস্তৃত সমর্থন এ তথ্যের পিছনে। উত্তরাধিকার বা বংশধর্ম আজ একদিকে দেহমনের অভেদ্য বন্ধন ও সমাজের সন্ততি প্রমাণ করে, তেমনি সেকেলে যান্ত্রিক অদৃষ্ট-বাদও উড়িয়ে দেয়। কারণ মেন্ডেলের তত্ত্বে বলে—জন্তুর স্বভাবের মর্মে আছে আলাদা আলাদা কয়েকটি স্বতন্ত্র বংশগত বিশেষত্ব, যেমন পদার্থবিদেরা বলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন অণুতে মিলে একটি সন্তত বস্তু। ওআডিংটন এক্কে বলেছেন, মিক্সচার নয়, ককটেল। ফলে হঠাৎ আমরা বিভিন্ন বিশেষত্ব দেখি দুই ভাইয়ের মধ্যে আর অবাক হই। কৃষিবিদ্বান মিচুরিন্ তাই ফসলের বিশেষত্বগুলি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মেলান নিজের পছন্দসই ফসলের বীজপ্রস্তুতকার্যে। মর্গ্যান্ দেখান যে, এই জীব-দায়ভাগ আস্তানা গড়ে সুতোর মতো এক বসতিতে যার নাম ক্রোমসোম। এইখানেই জীবদেহের স্বভাবে ঐক্য। জীবদৈহিক বিবর্তনের আলোচনায় এই ঐক্য বা সমগ্রতা স্পষ্ট হয়, যেমন আধুনিক মনস্তত্ত্বে মনের বিকাশের নিরীক্ষণ থেকে ব্যক্তিস্বরূপের ঐক্য বা সমগ্রতা প্রতিভাত হল। আধুনিক জীববিজ্ঞানের এই আপাতদ্বন্দ্ব প্রথমে অনেককে বিমূঢ় করেছিল। ১৯১৮ সালে সেমান্ আবিষ্কার করলেন যে নিউটের আস্ত কাঁচা ডিমে একটা অংশ থাকে যেটা বাকিটার বিকাশ চালিত করে। এর নাম হল 'আদিম নিয়ন্ত্রক'। একটা ডিম থেকে এই ব্যবস্থাপকটিকে কেটে আরেক ডিমে যথাস্থানে—ভাবী উদরের অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট করলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় ডিমটি দু-জন কর্তার ইচ্ছায় কর্ম আরম্ভ করে এবং ডিমটিতে দুটি ভ্রূণ গজায়। ওআডিংটন এ পরীক্ষা মুরগী ও খরগোসের উপর করে সফল হয়েছিলেন। জার্মানি ও আমেরিকায় মাছের উপরেও এ পরীক্ষা করা হয়।

এই নিয়ন্ত্রণকর্তার পরিচালনার কাজ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ধারার মধ্যে ভারসাম্য আনা। ইনি একাই আমাদের শিরদাঁড়া আর মগজ তৈরি করেন না, এঁর কাজ হচ্ছে স্থপতির মতো, নানা মিস্ত্রীর কাজের মধ্যে এঁর কাজ সোভিয়েট নির্মাণে কমিউনিস্ট পার্টির মতো। একটা প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে ইভোকেটর। এই ব্যঞ্জনাকার শিল্পীটি নিয়ন্ত্রণকর্তার আদেশে বেরিয়ে পড়েন পাশের কোষাবলীতে এবং ফলে তৈরি হয় স্নায়ুকোষ। এই সব প্রক্রিয়াগুলি পারস্পরিক। জন্মের ৮ই মাস আগে আপনার নিয়ন্ত্রণকর্তা যদি এই জাগানিয়া

জিনিসটির [illegible] ভাগ আউন্স না ছাড়তেন, তাহলে আপনার মস্তিষ্ক গজাত না, হে বঙ্কিমযুগের পাঠক!

কিন্তু ঐ দ্বন্দ্ব? দ্বন্দ্ব থাকছে না, কারণ ভিন্ন ও এক স্রোতধারা, বা ধারাগুলি মিশছে মিলছে ছড়াচ্ছে, দ্বন্দ্বাত্মক তাদের ঐক্য। চেয়ার টেবিল নয়. আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের তরঙ্গে এর উপমা। স্টেশনের ওয়েটিংরুম নয়, আমাদের বিষয় হচ্ছে সারা ট্রেনযাত্রাটাই, বহু স্টেশনের যতিতে একটি প্রোগ্রেস বা প্রগতি। বদরাগী আর দয়ালু দুইই কি করে এক ব্যক্তির পক্ষে হওয়া একসঙ্গে সম্ভব, তার জবাব এখানে। ঐ রাগ ও দয়া মনের দুটো গতি যার ঐক্য —ধরা যাক, রাসবিহারী ঘোষের ব্যক্তিস্বরূপের সমগ্রে। বিজ্ঞানের এই সত্তার —স্থাবরতা নয়, গতি বা বিকাশের মনোভাব আমাদের জীবনে ধীরে ধীরে ছড়াচ্ছে।। তাই আমরা এখন ব্যবসায়ী বলতে বিরলা বা টাটার কথা ভাবি না, শ্রমিক শ্রেণী বলতে একজন শ্রমিক নয়, সারাশ্রেণীর কথা ভাবি—কারণ যে গতিস্রোত আমাদের চোখে ভাসছে. তাকে বলা যায় শ্রেণীসংঘর্ষের ধারা। এই যে. বস্তু নয়, তার বিকাশপদ্ধতি, তার গতির উপরে ঝোঁক, এ ঝোঁক আধুনিক শিল্পসাহিত্যেও দ্রষ্টব্য। রিপ্রেসেন্টেশনের সুবোধ্য সুবিধাবাদ সত্ত্বেও আমরা আজ অভিজ্ঞতার গতিশীল যাথার্থ্যই খুঁজি। তাই কবিতায় গল্প থাকে না, ছবিতে থাকে না বহির্বস্তুর যথাযথ নকল। আর বিজ্ঞানে বিশ্বের ছবির কারবার একেবারে উঠে গেছে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ সত্ত্বেও।

আমাদের এই মাত্র দুশো কোটি বছরের পরিবর্তমান বিশ্ব! বিরাট তার দেশকালের পটভূমি, যেখানে নাকি আমাদের ছায়াপথ বা মিলকি ওয়ে একবার পাশ ফিরে ঘুরতে পারে ৩০০,০০০,০০০ বছরে, যেখানে নাকি সেকেন্ডে বারো মাইল করে আমরা, মাটির এনটিউস্-রা সূর্যসহ ঝাঁপিয়ে চলেছি হারকিউলিসপুঞ্জের দিকে। ক্রোথর্ এ বিরাটের পরিমাণ-বিষয়ে উপমা দিয়েছেন ভালো, রেলপথের মধ্যে স্টেশন প্লাটফর্মে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, মেলট্রেন গেল ছুটে। এনজিনের তীক্ষ্ণস্বর কেন ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজ বয়ে আনে? অতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের স্বর জোরালো হয় যতো কাছে আসে, সামনে দিয়ে যখন চলে যায় তখন তীক্ষ্ণতা থেমে যেন গলা ভেঙে যায়। এনজিন যদি দাঁড়িয়ে থাকত, বায়ুতরঙ্গ তাহলে কানে ভেঙে পড়ত সমান আবৃত্তিসংখ্যায়। এনজিন্ যদি চলে, তাহলে শব্দের বেগ স্থির পরিমিত বলে তরঙ্গগুলির পারম্পর্য হয় দ্রুততর বা ফাঁকটা হয় ছোটো, ফলে বেশি তরঙ্গ একই সময়ে কানের পারে আছড়ায়। স্বরগ্রাম তাতে চড়া শোনায়। স্বরের মাত্রা এনজিনের বেগের মাত্রার সঙ্গে সংলগ্ন। মজা হচ্ছে নিশ্চল এনজিনের স্বর যদি মাপা থাকে, তাহলে আর চলন্ত এনজিনের বেগ জানতে আমাদের এনজিনে চেপে বসতে হয় না, ঐ স্বরের মাত্রাতেই এনজিনের বেগ জানা যায়। এতে এনজিনের দূরত্বের হিসাব নিষ্প্রয়োজন।

শব্দের মতো আলোর বেলাতেও এই হিসাব চলে। চোখের রংধরা যন্ত্রে আলোর তরঙ্গক্ষেপে রংবাহার খেলে, লাল, কমলা, হলদে, সবুজ, নীল থেকে বেগনি। নিশ্চল সবুজ আলো কাছে চললে নীল, দূরে চললে হলদে লাগে। এই থেকে গ্রহনক্ষত্রের আলোক-বেগ—কারা আমাদের দিকে, কারা আমাদের দিকে পিছন ফিরে, পরিমেয়। আলোর বেগ সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল, এর চেয়ে

ক্ষিপ্র কিছু বিশ্বে নেই। আর ফিজো দেখান যে, আলোর বেগ একই থাকে, তা সে বায়ুস্তর স্থির বা অস্থির যাই হোক না কেন। মাইকেলসন্ এবং মরলির পরীক্ষাতেও জানা যায় মর্ত্যচর আলোর যাতায়াত মর্ত্যের আপন বেগের প্রভাবের বাইরে। আলোই এ অস্থির ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মকৈবল্যের অধিকারী। আমার নামটা ঠিক মনে নেই, কিন্তু বোধহয় এলেন্ নামক এক ক্যানেডিয়ান্ অধ্যাপকের ছড়াটা এখানে উদ্ধৃতি করছি :

'There was a young lady named Bright
Who walked faster than light.
She started one day
In the relative way,
And came back the previous night.'

আইনস্টাইন্ এর পরে এসে দেশকালের সমস্যার উদ্যত শিংদুটো ধরলেন আর দার্শনিক-ষাঁড়টি জব্দ, দেশকালের দ্বিধা একই ষাঁড়ের দুটো শিং। দেশ ও কাল, তথা জড়বস্তু ও তড়িৎশক্তি। বস্তুপুঞ্জ বেগের আবেগে জ্বলে ওঠে আলোকসত্তায়। বেগের উপরেই নির্ভর করে জড়বস্তুর আকার, যতোই জোরে চলা ততই ওজনে বৃদ্ধি আর আকারে হ্রাস। আর এই আলোর তরঙ্গ যেন এই বস্তুপিণ্ডের পিঠে চাপ দিয়ে আকাশকে করে দিলে অর্ধচক্র। যামিনী রায়ের ছবিতে যেমন, বিশ্বেও তেমনি সরল রেখা নয়, জ্যাবদ্ধ বক্রটানের চলতি।

তারপরে বর্ণবীক্ষণযন্ত্রের • এবং বর্ণবেগমাপের যন্ত্র। স্পন্দমান অণুর আবেগ লেবরেটরিতে যে মাত্রায় চলে, সেই মাত্রাই আমাদের সূর্যে আর দূরদেশের নক্ষত্রপুঞ্জেও সেই একই মাত্রা, প্রথম যন্ত্রটি তা প্রমাণ করে। বর্ণ-স্পীডোমিটারে জানা যায় নেব্যুলাদের ধরনধারণ। নেব্যুলা হচ্ছে দুরকম, এক দীপ্যমান বাষ্পের পিণ্ডসমষ্টি, আরেকটি কোটি নক্ষত্রের স্বাধীন সংঘ। আমাদের কাব্যের চেনা ছায়াপথ প্রথম শ্রেণীর এক নাক্ষত্রিকপুঞ্জ, আর ঐ স্বাধীন সংঘগুলি আরো দূরে। ঐ দ্বৈপায়ন বিশ্বগুলির দূর নক্ষত্র প্রায় সনাক্ত করাই যায় না, তবু চেনা নক্ষত্রের মতোই তাদের আলোকক্ষেপের ভঙ্গীতে বোঝা যায় যে, ওরা কোটি কোটি নক্ষত্র দীপাবলীর শোভাযাত্রা। এদের মধ্যে নিকটতম তারার ঝাঁক হচ্ছেন আন্ড্রোমিডা। এই বিরাট অশ্রুমতী অগ্নিশিখাও পরিমেয় এবং জানা যায় ইনি সেকেন্ডে বিশ মাইল বেগে মর্ত্যের আমাদের দিকে আসছেন। অভিসার বলা যায়, কারণ তাঁর সহচরীরা দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাচ্ছেন।

কিন্তু আলোর যাত্রার মাত্রা কি? প্রদীপের দূরত্ব জানা যায় সহজে, কারণ আলোর তেজ কমে দূরত্বের বর্গ অনুসারে। নক্ষত্ররাশির আলোর ধরন দু-রকমে জানা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান সঙ্গীর ছায়ায় নিয়মিত গ্রহণ লাগে। কোনো কোনো নক্ষত্রের বিচ্ছুরণ ছন্দিত স্পন্দনে। সেফাই-তে প্রথমে দৃষ্ট বলেই এই শ্রেণীর নাম হয়েছে সেফাইড্—এ দলে বিখ্যাত আমাদের ধ্রুবতারা এবং এর ছন্দের বৃত্ত চারদিক ঘিরে চলে। সাহিত্যের ধ্রুবতারায় প্রেমাবেগ দেখছি নিছক ধ্রুব নয়, যদিও এই ছন্দগত ওঠাপড়া আপাতনগণ্য।

ম্যাজেলানী তারকা মেঘে শ্রীমতী লীভিট্ দেখেন এক ব্যাপার। সেটা

হচ্ছে এই কোটি-কোটি প্রায় সমদূর পুঞ্জের নক্ষত্রদের স্পন্দনকাল ও সূর্য-শক্তির মধ্যে স্পষ্ট একটা অনুপাত। দশদিনব্যাপী উত্থান-পতন যে নক্ষত্রের ছন্দে, সে আমাদের সূর্যের চেয়ে ৯৬০ গুণ সূর্যশক্তিতে উজ্জ্বল, একশো দিনের ছন্দে ২০,০০০ গুণ উজ্জ্বলতর। যে-কোনো পুঞ্জে তাই একটি সেফাইড্ লাইটহাউসের নিশানা থাকলে, সে নক্ষত্রগোষ্ঠীর দূরত্ব মাপা যায়। দূরত্বের কথায় বলা যায় যে, ঐ দ্বৈপায়ন দূরযান বিশ্বের যেটি খালি চোখে সবচেয়ে বড়ো, আন্ড্রোমিডা নেব্যুলা, সে শুধু একটি নগণ্য তারার মতো দেখায়। আন্ড্রোমিডা কিন্তু বিরাট একটি ছায়াপথের তুল্য, দূরত্বের মাপ থেকে কষা যায় এর আকারের অঙ্ক আর দীপশক্তি। একশো কোটি সূর্যের আলো এই আন্ড্রোমিডার দীপ্তি। এদের কারো কারো আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পঞ্চাশ কোটি আলোকবর্ষ কেটে যায়। সবচেয়ে যে দূর দৃশ্যমান দ্বীপ বিশ্ব, সে আমাদের মায়া কাটিয়ে চলেছে সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে, রেডিয়ম্-ফাটানো হেলিয়ম্ অণুর চেয়ে পাঁচ গুণ দ্রুততর, আলো বা রেডিওর এক-তৃতীয়াংশ গতিতে।

এই যাতায়াতের ব্যাখ্যা মিন্ দিয়েছেন। ডানদিকের ধাবমান ছেলে আমার দিকে ছোটে ততক্ষণই, যতক্ষণ না সে আমাকে ছাড়িয়ে যায়, তারপরে সে আমাকে ক্রমেই দূরে রেখে বাঁয়ে ছোটে। তাছাড়া বিশ্ব বর্ধমান, বেলুনের মতো। ফলে প্রথম স্ফীতির অবস্থার দুটি মাছির একটি মাছি আরো বেশি স্ফীতির পরে দ্বিতীয় মাছির থেকে আরো দূরে চলে যায়। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে কিন্তু এই বিশ্বের ছবি আঁকা যায় না। প্রতিচিত্রের যুগ গেছে। বিপ্লবীসমাজের বিজ্ঞানে পুরানো চিহ্ন সব বদলাচ্ছে। আধুনিক শিল্পসাহিত্যে এই অভিজ্ঞারই ভিন্নজাগতিক সমর্থন। বিজ্ঞানের সন্ততিবোধে আপাতদৃষ্টিতে তাই ভাঙন ধরেছে যেমন ধরেছে মানবসমাজের ঐতিহ্যবাদে। সন্ততিবোধ থেকেই কার্যকারণ সন্ধান আসে। প্রাত্যহিক জীবনে দুইই সার্থক এবং সেই থেকেই এদের সর্বত্র প্রয়োগের ইচ্ছা। কিন্তু বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে এ প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। ম্যাক্সওয়েল্ তাই তাঁর চাকার ম্যাঙ্গেল্স্ ত্যাগ করেন যখন তার থেকে তাঁর বিদ্যুৎসন্ধান সফল হল। কারণ বিদ্যুতের আচরণ চেনা প্রতিচিত্রে বিকৃত হতে বাধ্য। মাক্সওয়েলের শুদ্ধবুদ্ধি অবশ্য অসামান্য, ধর্মভীরু হয়েও তিনি বলতেন আত্মায় তাঁর বিশ্বাস আছে কিন্তু সে বিশ্বাসই পাছে ঈশ্বরের আবির্ভাবে দুর্বল হয়ে যায়, তাই তিনি অবতার মানেননি। প্রতিচিত্রের সম্বন্ধে তাঁর এই সন্দেহ ছিল বলেই তিনি আধুনিক পদার্থবিদ্যার জনক। ফিজো এবং মাইকেলসন্ মর্লির প্রমাণ যে আলোর গতি নির্ধারিত, স্থির। আলোর চেয়ে দ্রুত চিহ্ন নেই এবং চিহ্ন বা প্রতীকেই বিজ্ঞানের কারবার। প্রতীকের অপরিমেয় বেগ রইল না, এ এক সমস্যা। আপেক্ষিকতত্ত্বে হল এর দুর্বোধ নিরাকরণ। দ্রষ্টার সম্বন্ধই নির্দেশ দেয় চলন্ত বস্তুর দৈর্ঘ্য, ভার ও সময়ের পরিমাণে। সেকেলে বিজ্ঞান এই প্রতীকহীন প্রতিচিত্রহীনতায় একেবারে ভেঙে পড়ল। দ্বিতীয় ধাক্কা এল প্লাঙ্কের কোয়ান্টায়। তিনি বলেন তাপ বা শক্তি যেন বিশেষ মাপের এক এক মোড়কে থাকে। অর্থাৎ চলন্ত চাকাটা ক্রমিকভাবে বেগ বদলায় না, এক বেগ থেকে আরেক বেগের অনুপাতে চলে না, বিপ্লবের মতো লাফিয়ে যায়। এক মোড়ক ওষুধ খেয়ে আরেক মোড়ক, মিক্শ্চারের বোতল খুলে

ফোঁটা ফোঁটা সমানে খাওয়া নয়। ফোঁটা ফোঁটাও অবশ্য অবিরাম নয়, তাতেও স্বাতন্ত্র্য। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকেই প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম বা পরিমাণতত্ত্ব।

এর প্রয়োগ হল বহু ক্ষেত্রে। লেনার্ডের পরীক্ষায় দস্তার পাতে অতিবেগনি আলো ফেললে বিদ্যুৎঅণু লাফিয়ে ওঠে। তার বেগ কিন্তু আলোর মাত্রা বাড়ালে বাড়ে না, বাড়ে অণুদের সংখ্যা। সমুদ্রের ঢেউএর উৎক্ষেপের সঙ্গে এ মেলে না। আইনস্টাইন তাই দিলেন বিপ্লবকর আভাস—আলোর ঐ রশ্মিগুলি তরঙ্গ নয়, আণবিক টুকরা। প্রতি টুকরাই খানিকটা শক্তির মোড়ক বা আধার। দস্তার পাতে তারা ধাক্কা দিলে বিদ্যুৎঅণু লাফিয়ে ওঠে, সমান বেগে, কারণ আলোর টুকরাগুলির সমান নির্ধারিত শক্তি। পরিমাণতত্ত্ব কি প্রমাণসাইজ পণ্যের যুগেই শোভন নয়?

নীল্‌স্‌ বোর দেখালেন এই পরিমাণ নির্ধারণ থেকেই জড়বস্তু বা ম্যাটারের স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য আছে। আর এই তরঙ্গ ও খণ্ড বা টুকরার দ্বন্দ্ব মিলে যায় নতুন অঙ্কে, যেখানে ক × খ আর খ × ক এক নয়। এ বীজগণিতে প্রতিমূর্তি গড়া যায় না। কিন্তু তাহলে ঐ বিদ্যুৎঅণুদের আদিনিবাস জানা যায় কি করে? হাইসেনবের্গের প্রতিভা বললে অনিশ্চয়তার নিয়মে। প যদি হয় ইলেকট্রনের সংস্থান আর ম তার বস্তুরূপ আর বেগের ফল তাহলে প নিশ্চয় মাপা যাবে কিন্তু ম-র নির্ণয় হবে অনিশ্চিত। তেমনি নির্ণীত ম-র বেলায় প হবে অনিশ্চিত।

মোটামুটি, বিষয়-বিষয়ী দ্রষ্টা-দৃশ্যের স্বীকারে ফিরে আসি। আইনস্টাইনের বিজ্ঞানে দেশকালের ভেদাভেদ ও চিরমূল্য নেই, কিন্তু দ্রষ্টা আবার সক্রিয়, সে নিয়ম খোঁজে ও খুঁজে পায়, কার্যকারণের লাঙল আবার তার হাতে। অবশ্য বোর ও হাইসেনবের্গের চর্চা বিশেষ অণু নিয়ে আর আণবিক সত্তা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ। কার্যকারণ সেই বিশেষের ক্ষেত্রে অবান্তর। তার মানে এ নয় যে, দ্রষ্টার অগম্য অণুর ধরন-ধারণ অঙ্কে ধরা পড়ে না। অঙ্ক অনেক ক্ষেত্রে ভাবীকথকও বটে। বলাই বাহুল্য এসব আণবিক সত্য কোটি অণুর সমষ্টি মানুষ বা ইট কাঠের জগতের ব্যবহারিক নিয়মাবলী বাতিল করে না। কার্যকারণ দেশকাল সবই সেখানে গ্রাহ্য। অনিশ্চয়তার বিধি অনুসারে আমাদের মগজের উপরে বংশের জৈব ও পারিপার্শ্বিকের নিশ্চিত প্রভাব অস্বীকৃত হচ্ছে না। রাত্রির অন্ধকারে নৈশ পাইলটের আকাশযাত্রার কর্তৃত্ব দিনের অনেক স্পষ্ট সাফল্যের চেয়ে মহৎ। তাছাড়া, দিনের সাফল্যে বাজার বসে যায়, সেখানে অনেক গ্লানি, আত্মপ্রসাদের অনেক ক্লেদ, সোভিয়েটবিদ্বেষজ বহু ভ্রান্তিবিলাস।

১১

পিকাসো

পল এলুয়ারের 'আ পাবলো পিকাসো' বইটি বিস্ময় ও পরিতৃপ্তি দুইই জোগায়। মহাশিল্পীদের উপরে তাঁদের বন্ধুদের লেখা নামক গ্রন্থমালার প্রথম বই এটি, অজস্র ছবির সঙ্গে মিলেছে গদ্যসমালোচনা এবং অজস্র কবিতা। কবিতার কিছু সাক্ষাৎ ভাবে বা দূরত পিকাসোর চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিছুবা পিকাসোরই উদ্দেশে। কবি হিসাবে এলুয়ারের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ভালেরি পর্যন্ত ফরাসী কাব্যের যে কঠিন প্রতীকী কৈলাস সংহতি তা এ'রই কাব্যে হয়ে উঠেছে পাহাড়ের নদীর মুক্ত গান। পিকাসোর বিষয়ে এলুয়ারের শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন অন্যত্রও মেলে। বিরামহীন কাব্য নামক পুস্তকে একটি দীর্ঘ কবিতা পিকাসোর উপরে লেখা। অনুপম সে শ্রদ্ধার প্রকাশ : ডিমের শাদা ও হলদে পর্দার উপর স্বচ্ছ নীলের আভা, তারই উপরে ঋজু কালো রেখা— চিত্রের এই প্রত্যক্ষ থেকে কবিতাটির আরম্ভ। সে সুর ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে চতুর্থ ভাগে পৌঁছে—কল্পবিম্বে বা ইমেজেই তো সব শুরু. ইমেজেই ঐক্য; কতো না উষা মেলে তাই এক মহাদিনে যখন বাসনাসাধ সব পেলব, মধুর ও প্রবল, কোমল রক্তায়মান ঘাসে কাস্তের মতো; তাই সাধ হয় আজ একযোগে খাওয়া-দাওয়া করার কিম্বা খেলার, হাসার, তাই সাধ হয় আজ ইউ-আর্-এস্-এসে যাবার কিম্বা হৃদয় মেলে দিতে দয়িতার বুকে, কর্মের শক্তিতে আর প্রবল আশায় চুম্বনতলে বদ্ধমুষ্টির আঁটির মতো।

পিকাসোর উপরে এলুয়ারের গদ্য আলোচনা শিল্পবোধে এতোই সাহায্য করে যে নিচে তা দেওয়া হল :

পিকাসোর রচনাবলী আমায় অন্তহীন আনন্দ দেয়, সেই শিল্পসৃষ্টির বেদী থেকে আহ্বান জানাই আমার আনন্দের অংশীদারদের, এই শিল্পের প্রত্যয় এবং রূপ থেকে দেখাতে চাই যে মানুষ মানুষকে কি আস্থা এনে দিয়েছে।

আমায় যা বাঁচতে সাহায্য করেছে, যা সৎ তারই কথা বলছি, যারা নিজেদের হারাতে চায় ভুলতে চায় শূন্যের ভালোবাসায়, যারা তাদের জীবনের নানা প্রয়োজন রুচি-অভিরুচি বৈরাগ্য বাদ দিয়েই চলে, যারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা অর্থাৎ জীবনকেই নিয়ে চলে তাদের মৃত্যুর বীভৎস পরিণতিতে, তাদের একজনা আমি নই। আমি কখনও এই বিশ্বজগৎকে শুধু বুদ্ধির ছকে আয়ত্ত করতে যাইনি, আমার জীবনবেদে যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রকৃত, উপযোগী সবারই স্থান, কারণ ঐ সব থেকেই আমার অস্তিত্বের মূল। মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব তার স্বকীয় সত্তাতেই। মানুষের এ সত্য মনে রাখা দরকার।

না হলে, তার বেঁচে থাকা অন্যের পক্ষে হয় মৃতেরই সামিল, পাথরের মতো, গোবরের ঢিপির মতো।

যে মহাপুরুষরা তাঁদের জীবনে চরম সার্থকতা এনেছেন, যাঁরা এই মর্ত্যলোক দিয়েই তাঁদের কাল কাটিয়ে যান হয়তো বা তার স্পর্শ আপাতভাবে না মেখেই, পাব্‌লো পিকাসো তাঁদেরই একজন। বিশ্বের কাছে আত্মদান করে অসমসাহসী তিনি বিশ্বকে খাড়া করলেন নিজেরই বিরুদ্ধে, তিনি যে হারবেন না, নিজের বৃহত্তর বিকাশই যে এর ফল হবে তার নিশ্চিত জ্ঞানে। 'নীল যদি না পাই, তাহলে লালেই চালাই'—কথাটা তাঁরই। একটি সরল রেখা বা বঙ্কিমার জায়গায় তিনি উন্মোচিত করেছেন হাজার রেখা, যারা নিজেদের সংহতিতে ফিরে পায় তাদের একতা, তাদের সত্য। বস্তুসত্তা বা বিষয়ের সত্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা উড়িয়ে দিয়ে তিনি আবার যোগ স্থাপন করেছেন বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে, বস্তু ও দ্রষ্টার মধ্যে অর্থাৎ বস্তুদর্শনের ফলে যে চিন্তা বা মনন করে তারই মধ্যে। তিনি আমাদের ফিরিয়ে দিলেন (চূড়ান্ত দুঃসাহসে, বিরাট মহত্ত্বে) মানুষ ও বিশ্বের অভিন্ন অস্তিত্বের প্রমাণ।

যাঁরা পিকাসোর প্রগতির এ চরম মাত্রা বোঝেন না, তাঁদের কাছে আমরা নিবেদন জানাই এই :

সাধারণত, চিন্তা বা ন্যায়জগতে বস্তু বা বিষয় ও তাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়; বস্তু থেকে আহরিত হয় প্রত্যক্ষ আইডিয়া ভাব বা অভিজ্ঞা, এবং সম্বন্ধনির্ণয়ে আসে পরোক্ষ আইডিয়া আর তজ্জন্য যেতে হয় বিষয়ী থেকে বিষয়ে। এই বিষয়ী থেকে বিষয়, কর্তা থেকে বস্তুতে যাবার পথে পাথেয় হচ্ছে খানিকটা সহানুভূতি বা অনুরাগ কিংবা বিরূপতা বা বিরাগ, অর্থাৎ পুরুষার্থঘটিত ধ্যানধারণা। এরই জন্য জন্তু, শিশু, বন্য পশু, পাগল, কবিরা ভুল করে বসেন অর্থাৎ অতিসরল প্রমাণ বা অনুবোধে আটকা পড়েন। তখন কাঁচের টুকরো প্রতীয়মাণ হয় ঘূর্ণাবর্ত কিম্বা ফাঁদ, আগুন মনে হয় মাণিক্য, চাঁদ নারী, বোতল অস্ত্র, ছবি জানালা। এ ভুল প্রায়ই হয় যখন তাঁরা সম্বন্ধপাত করেন বিরাগ বা দ্বেষে, সমরাগে সম্বন্ধক্ষেপে প্রায়ই সম্বন্ধের সত্যারোপে সাহায্য হয়। তখন এঁরা একই সঙ্গে বলা যায় এই তুলনাবৃত্তির কর্তা ও ক্রীতদাস, জীবন তখন পরিণত হয় প্রেয় ও অপ্রেয় হাঁ বা না-য়, তাঁদের নিজেদের পক্ষে আর বন্ধুবান্ধবের পক্ষেও। এ পল্বল অবস্থা থেকে কেউ আত্মউদ্ধার করেন আরেক পল্বলে : ঘরপোষা জন্তু, বয়ঃসন্ধির শিশুরা, সভ্যতার প্রান্তগত আদিবাসী আরণ্যক, আরোগ্যের মুখে উন্মাদ, আত্মভোলা কবিরা। কেবল, কয়েকটি কবিই এই করুণ দ্বৈত অতিক্রম করতে পারেন, তাঁদের স্বকীয়তা প্রসারে সক্ষম হন, মানবহৃদয়-কে রূপান্তরিত করতে পারেন সম্পূর্ণ নগ্ন প্রকাশের মধ্যেই—কবিপ্রজ্ঞায় কাব্যন্যায়ে।

চিত্রশিল্পীদেরও কপাল-দোষে শিল্পোপায়ের দাসত্ব করতে হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই নিজেদের হাতপা বেঁধে শুধু বিশ্বজগতের নকল করেন। নিজেদের ছবি আঁকতে হলেও তাঁরা আয়নায় ছায়া দেখতে দেখতে আঁকেন, ভুলে যান যে দর্পণ তাঁদেরই মধ্যে। কিন্তু বহির্বিশ্বকে বাহ্যবস্তু ভেবে তাঁরা ভুল করেন। আপেল নকল করতে গিয়ে ইন্দ্রিয়সংবেদ্য বস্তুসত্তা-কে দারুণ দুর্বল করে তোলেন। কে একজন একবার এক আপেলের ভালো নকল দেখে

বলেছিল, 'ওটা খাওয়া যায়।' কিন্তু এ ধারণা আসলে পরীক্ষা কেউই করে না। যতো বেচারা স্টিল লাইফ্, যতো বেচারা ল্যান্ডস্কেপ, ব্যর্থ রূপমূর্তি সব ভিড় করেছে এই বিশ্বে যেখানে সব কিছুই বাঁধন খোঁজে মানুষের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, তার মানসে, চিত্তে। প্রকৃতপক্ষে যা আবশ্যিক তা হল সাযুজ্যকরণ, আন্দোলন, বোধনা। পিকাসো পার হয়ে গেলেন সর্ব রসধারা, কি অনুরাগ, কি বিরাগ—দুই প্রায় এক, দুইই গতির প্রতিকূল, প্রগতির পরিপন্থী; পিকাসো সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করলেন—এবং সার্থকতালাভ করলেন—প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সম্বন্ধের হাজার জট মোচনে। তিনি সেই সত্তাকে করেছেন আক্রান্ত, যাকে সচরাচর বলা হয় অগোচর অথবা যদিচ যে শুধু মাত্র অনির্দিষ্ট। তিনি একে চেপে বসেননি, কারণ এ সত্তা তো তাঁরই, যেমন তাঁর ঘাড়ে ভর করেছে এই সত্তা। এ এক উপস্থিতি, উভয়ত এর আবির্ভাব অবিচ্ছেদ্য।

আঁধার কোটরে বা দীপ্ত কামরায় শতাব্দী শতাব্দী ভুলের পরে অযৌক্তিকতা এবার পিকাসোর কিউবিস্ট নামে অপখ্যাত চিত্রাবলীতে প্রথম যুক্তিসহ পদক্ষেপ করল এবং এই পদক্ষেপই তার চরম ইতিমূলক যুক্তি।

পিকাসো ফেটিশ্ (দ্রব্যগুণারোপিত বস্তু) সৃষ্টি করেছেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু এই ফেটিশ্‌গুলি নিজস্ব জীবনে প্রাণময়। তারা শুধুমাত্র মধ্যবর্তী রক্ষাকবচের ইঙ্গিত নয়, তারা গতির লয়চিহ্নও বটে। এই গতিতেই তারা পায় প্রত্যক্ষতা। এই সমস্ত চিত্রের মানুষগুলি থেকে, জ্যামিতিক প্রতিমা, তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্কেত থেকে নির্বিশেষ মানুষ, নারী, মূর্তি, টেবিল, গীটার হয়ে ওঠে আগের চেয়ে বেশি চেনাশোনা, কারণ তারা হয়ে উঠেছে বেশি বোধ্য, মানসে তথা ইন্দ্রিয়ে বেশি সংবেদ্য। যাকে বলা হয় ডিজাইনের বা পরিকল্পনার যাদু বা ম্যাজিক, এই রঙের ইন্দ্রজাল আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ-কে এবং আমাদেরও আবার পুষ্টিদান করতে থাকে।

কে যেন বলেছিল যে বস্তু ও তাদের সম্বন্ধ নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্ববীক্ষণ করার ভার আমাদের উপর ন্যস্ত নয়। বলা দরকার যে এ ভার জীবনেরই ভার, যারা এরই মধ্যে মৃত্যুর বীজ নিজেদের মধ্যে বহন করছে, যারা এরই মধ্যে দেয়ালে বা শূন্যে মুখ ঢেকেছে তাদের ধরনে নয়. কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতায়, চলিষ্ণু বিশ্বের সঙ্গে, সম্ভবের প্রতিক্রিয়াতে। চিন্তা বা যুক্তি যেহেতু শুধু সন্ধানী এজেন্ট বা প্রতিফলক মাত্র হতে চায় না বরঞ্চ উদ্দেশক শক্তি বা পরিচালকেই, কৈলাসপতি রূপেই, বিশ্বজনীন কার্যকারণে তার সংজ্ঞা, সেহেতু বস্তুদের সম্বন্ধগুলি হয়ে ওঠে অন্তহীন।

পিকাসোর অন্বিষ্ট সত্যই। তবে যে অপরা যাথার্থ্য গালাটেয়া-কে প্রাণহীন মূর্তিতে পরিণত করে, তা নয়, সেই অখণ্ড সত্য যাতে কল্পনা মিলিত হয় প্রাকৃত বিশ্বে, যার বিবেচনায় সবকিছুই বাস্তব এবং যা বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, নির্বিশেষ থেকে বিশেষে অবিশ্রাম যাতায়াতে অস্তিত্বের, পরিবর্তনের সব রকমফেরে অঙ্গীকার পায়—যদি তারা নতুন হয়, বীজবন্ত হয়।

জটিলতাতেই বস্তু তার অবর্ণনীয়তা অতিক্রম করে। পিকাসো জানেন যে কিভাবে সরলতম বস্তু আঁকলে সে ছবির সামনে যে-কোনো লোকেই বর্ণনে সক্ষম, শুধু সক্ষম নয় ইচ্ছুক হয়ে ওঠে। শিল্পীর পক্ষে, তথা একেবারে সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ ফর্ম বা রূপ বা পরোক্ষ রূপ বলে কিছু নেই।

শুধু আছে দ্রষ্টা আর দৃশ্যের মধ্যে সংযোগ, বোধের প্রয়াস, সম্বন্ধ পাতের চেষ্টা, মাঝে মাঝে বা নির্বন্ধ, সৃষ্টি। দেখা মানেই বোঝা, বিচার করা, রূপান্তর করা, কল্পনা করা, বর্জন করা বা বর্জিত হওয়া, ইতি বা নেতিতে নিঃশেষ হওয়া।

পিকাসোর বিখ্যাত ছবি লা ফাম্ অ' শেমিস্ মনে আসছে। কুড়ি বছরের চেনা কবি, সব সময়েই একাধারে অতো প্রারম্ভিক অথচ অতো অসাধারণ। তার আর্ম চেয়ারের মধ্যে মেয়েটির প্রকাণ্ড ভাস্কর্যময় ভার, স্ফিনকসের মতো ঝাঁকালো মাথাটা, বক্ষদেশে পেরেক আটকানো স্তনদুটি, সবই বিচিত্র বৈলক্ষণ্যে সমাহিত—এবং এ বিবাদী সাম্য মিশরী বা গ্রীক বা কোনো পিকাসোপূর্ব শিল্পীরই সৃষ্টি করা সাধ্য ছিল না—তনুলক্ষণময় মুখখানিতে, চুলের তরঙ্গে, চারু বাহুমূলে, বিস্তৃত হাতে, শেমিজের কুয়াশায়, মসৃণ আরাম কেদারায় দৈনিক সংবাদপত্রে।

'মা জলি'—ছবিটি ভাবছি, লেওনার্দো দা ভিঞ্চির উক্তি যাতে সব প্রথমে জ্বলজ্বলে প্রমাণ পেয়েছে : ভাস্বর শরীরে সব দিকে ছড়ানো প্রদীপ্ত দক্ষিণ বেয়ে স্পেস্ বা শূন্যসন্ততি উঠেছে পিরামিডে এবং উঠেছে এমনই তীব্র কোণের আকারে আকারে যে তাদের আরম্ভবিন্দুর থেকেও তাদের সুদূরতর মনে হয়।

মা জলি-র কথা ভাবি। সচরাচর যা দৃশ্য, যা জানা তার চেয়ে কতো সহজ রং। রংগুলি শূন্যের আকাশে আছড়ে পড়ে না, রংই হয়ে ওঠে স্পেস্, ছবির সীমান্তে আবদ্ধ, যেন ধোঁয়ার স্তম্ভ পাকেপাকে সারা ঘর ছেয়ে দিলে; অসীম এবং বৈশেষিক। কিছুই আমাকে আটকায় না, না ছবির সীমারেখা, না ঘরের সীমানা, সারা বিশ্বই তো এই যা রচনা করে নিজেকে, গলিয়ে দেয় নিজেকে, আবার করে রচনা। হে অস্পষ্ট কিন্তু আবশ্যিক স্মৃতি, আমি জানি যে, বাইরে, ঐ রাত্রি ছড়ায়, ঐ অদৃশ্য এক দল, কি কি রূপাকার সে ঢেকে ফেলে, এ সবই আমার মধ্যে যতোই তুচ্ছ হোক, যতোই এলোমেলো। আমি দেখেছি পিকাসো তাঁর পাললিক গিরিখাত (গাং) থেকে এনে দিয়েছেন কেলাসিত শিলা (ক্রস্টাল)।

আঁদ্রে ব্রেত' সুররেয়ালিস্ম ও চিত্রকলা পুস্তকে বলেছিলেন পিকাসোর চিত্রে সঙ্কল্পশক্তির শ্রান্তিতেই বুঝি আনন্দ আসে বিলম্বিতে, যদি আসে। নিশ্চয়ই, কারণ পিকাসোর হাতে যে বস্তুসত্তার ঘরে চরম প্রশ্নের অতি সুকুমার চাবি। তাঁর সমস্যা হল দ্রষ্টাকেই দেখা, দৃষ্টি-কে মুক্তিদান, দিব্যদৃষ্টি অর্জন করা। অর্জন তিনি করেছেন।

ভাষা একটা সামাজিক ব্যাপার। এ কি আশা করা যায় না যে একদিন ডিজাইন বা রূপায়নও ভাষার মতো, অক্ষরলিপির মতো সামাজিক সত্য হয়ে উঠবে, নির্বিশেষ হয়ে উঠবে? সব মানুষই তো পরস্পরকে জ্ঞাপন করে বস্তুর আলোকন দ্বারা এবং এই বস্তু-দর্শনে সেই চরম কথা বলা যায় যে তাদের সবার মধ্যে বিস্তৃত, যা বস্তুতে সাধারণ্য পায়, যা বস্তুতে তাঁদের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত। সেইদিনই বাস্তব সৎ দৃষ্টি বিশ্বকে অখণ্ডতা দেবে মানুষের যোগে, অর্থাৎ মানুষকে বিশ্বের।

১২

ক্যালকাটা গ্রুপ

আমাদের ক্ষীণ শিল্পসংস্কৃতির জগতে এবারের, ১৩৫৫ সালের শীতকালের, এই শিল্পপ্রদর্শনটি একটি প্রাণময় ঘটনা। কলকাতা গোষ্টীর শিল্পোৎকর্ষ বিষয়ে নতুন করে পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই, সম্যক আলোচনার জায়গাও এখানে হবে না। যামিনী রায়ের কীর্তির পরে এঁরা এবং এঁদের সহকর্মীরা ভারতশিল্পের আশা। সম্প্রতি শীলা অডেনের প্রদর্শনী দেখেও এই আশা সবল হোক্। বোম্বাই-এর চিত্তপ্রসাদের কাজও আশা করি আমরা দেখতে পাব। কলকাতা গোষ্ঠীরই এ-বিষয়ে সংগঠনে অগ্রণী হওয়া চাই। কারণ প্রদর্শনী সংগঠন করতে হলে যে রুচি ও কর্মক্ষমতা প্রয়োজন, তা যে এঁদের আছে, এবারে তাঁরা তার প্রমাণ দিয়েছেন।

বস্তুত, কলকাতা গোষ্ঠীর এবারের প্রদর্শনী আমাদের পক্ষে একটা যুগান্তকারী ব্যাপার। এরকম আলো ও দেয়ালের ব্যবহার, এরকম ছবি টাঙানোর বিন্যাস—সেই একটা রুচির শিক্ষা ও আনন্দের উৎস।

তাছাড়া, ব্যক্তিগত শিল্পীহিসাবে তাঁদের যে সজীব প্রতিরোধতীব্র টেক্‌নিকের বিস্তার ও জীবনাভিজ্ঞ আমাদের পূর্বপরিচিত সেসব গুণাবলী এবারেও দ্রষ্টব্য। গোপাল ঘোষের রঙের ছবির আকার-বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিতোষ সেন মনে হয় তাঁর দ্রুতরেখার চাপল্য এবং উজ্জ্বল রঙের আপাতিক দীপ্তির দ্বিধা প্রায় কাটিয়ে উঠলেন স্বকীয় রূপায়ণের মর্যাদায়। প্রাণকৃষ্ণ পাল তাঁর মাডনায়, স্টিল লাইফে, ঘোড়দৌড়ে, সর্বোপরি তাঁর তৈল-চিত্র চুম্বনে তাঁর সুকুমার ও শমিত প্রতিভার বিকাশ দেখিয়েছেন গভীরতর পারম্পর্য অন্বেষণে। অবনী সেনের ছবিগুলিতে রুচির অনিশ্চয়তা থাকলেও তাঁর রঙের জৌলস ও মোটা ফর্মের সন্ধান সম্ভাবনাময়। রথীন্দ্র মৈত্র হয়তো গত বছরের তুলনায় বিস্ময়কর কিছু দেননি, কিন্তু তাঁর বিন্যাসের বৈচিত্র্য এবারেও স্পষ্ট : কাশ্মীরের দুঃখ ও নমাজ থেকে রাস্তার কাক, আর লৌকিক শিল্পের বর্তুলে বর্তুলে চটকদার মুরগীপরিবারে অবধি। প্রদোষ দাশগুপ্তের পাকা ভাস্করের হাত ও মনন অল্প যে কটি কাজ তিনি দিয়েছেন, তাতেই স্বপ্রমাণিত। কমলা দাশগুপ্তের সমাহিত নৈপুণ্যে মুগ্ধ দর্শক তাঁর হাতের কাজ আরো দেখবার দাবি করে। নীরোদ মজুমদারের কাজ প্রবাসজনিত কারণে এবারে অনুপস্থিত। তাঁর সবল ছবির অভাব স্পষ্টই বোধ করলুম।

এই ক'জন শিল্পী যে আমাদের গলিত ভদ্রলোকসমাজের এবং তার জীর্ণ শিল্পধারার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অভিযান চালিয়েছেন, সে স্বীকৃতি আমাদের

প্রগতিবাদীরা নিশ্চয়ই তাঁদের দেবেন, কারণ প্রতিরোধের দ্বন্দ্বাত্মক আন্দোলনেই এ শিল্পশুদ্ধির উৎস ও বিকাশ। অন্ধ ও কুরুচিজীর্ণ, দুর্বল রং ও রেখা ব্যবহারে বা মডেলিঙে যে প্রত্যক্ষের সংঘাত বা যন্ত্রণা থেকে পলায়ন, সে শিক্ষাবিরোধী এবং নিশ্চেষ্ট গতানুগতিকতা বা এবস্ট্রাক্‌শন বা পরোক্ষতা এবং অন্যপক্ষে সজাগ সংবেদ্য চোখের মনের দ্বন্দ্বময় আর্তিতে যে তথাকথিত এবস্ট্রাক্ট বা কৈলাস রূপায়ণ এ দুইকে একমূল্য দেওয়া পেতিবুর্জোয়া মনেরই প্রগতিছদ্মবেশ। সেদিক থেকে প্রগতি বা এমনকি মার্কসবাদের নামাবলী পরিহিত সমালোচকেরও কটু সমালোচনা শিল্পীদের গায়ে মাথার দরকার নেই। এই প্রসঙ্গে প্রবীণ মার্কসবাদী শিল্পী ও সমালোচক জুর্‌দ্যাঁর কথা স্মরণীয়। কমরেড জুর্‌দ্যাঁ বলছেন :

এটা সেই ছোটো সমস্যাটারই সঙ্গে জড়িত, যেটা মর্‌ঁা (দার্শনিক, সমালোচক এবং লা প'সের সম্পাদক) ও আমি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি। আমরা অনেক বিষয়ে, বিশেষ করে শিল্পের সামাজিক উৎসের বিষয়ে জ্ঞান সন্ধানের স্বল্পতা সম্বন্ধে একমত। যে রিসার্চে শিল্পী ও তার পারিপার্শ্বিক, শিল্পরচনাটি এবং তার ধারণা ও উপলব্ধির কার্যকারণাবলী, সিম্‌ফনি বা কবিতা বা মূর্তি বা ছবিটি এবং তাদের অবস্থানিচয়ের মধ্যে সম্বন্ধপাত অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায়, সে বিষয়ে রিসার্চ অল্পই হয়েছে ; কার্যকারণের বা হেতু ও ফলের সম্বন্ধ, বিশেষ কোনো এক ক্ষেত্রে নির্ণয় করা আমার মতে বড়োই সূক্ষ্ম জটিল ব্যাপার। হেতুগুলি প্রায়ই এতো মধ্যস্থতাসূচক (মেডিয়েট্‌স্‌) এবং কার্যফল এতো বেশি অপ্রত্যাশিত হয় যে সততাসম্পন্ন কোনো পরীক্ষকের পক্ষে সরলতাবাদী এবং অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যায় সন্তোষ প্রচার করা সম্ভব নয়। ঐ রকম ব্যাখ্যায় মিস্টিক্‌ বা অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার সমালোচনার তা অন্তরায়, ভিত্তির অখণ্ডতার বিষয়ে এ মত নিজেই অনিশ্চিত, কাজেই তা বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় অকাট্য প্রমাণ হিসাবে অব্যবহার্য। এই দুর্বলতা থেকেই থীসিস আসে : সেজান্‌ বুর্জোয়া, অতএব তাঁর শিল্প একান্তই বুর্জোয়া, তাঁর শিল্পরচনা বুর্জোয়াসির লালাক্ষরণ, বুর্জোয়া মানসের একটি প্রত্যঙ্গের প্রতিবিম্বমাত্র। আমার মনে হয় এই থীসিস্‌ কোনো বিবেক-সম্পন্ন বিশ্লেষণে আসছে না, আসছে বরং কিঞ্চিৎ মতবাদলাগানো এক এপ্রায়োরিস্‌ম্‌ থেকেই, যার আশ্চর্য মিল অদৃষ্টবাদ গ্রহণের সঙ্গে (ফাতালিতে)। এ মত থেকে কি ন্যায়সঙ্গত তত্ত্ব দাঁড়ায় না এই যে মানুষ ইতিহাস করে না, শুধু ইতিহাস তৈরি করে দেয় মানুষ? যদি কেউ বলে যে সেজান্‌ যেহেতু বুর্জোয়া সেই হেতু বুর্জোয়াশ্রেণীপ্রত্যাশিত শিল্প থেকে চূড়ান্ত রকম ভিন্ন শিল্পসৃষ্টিতে অপারগ, তাহলে সে একই ঘায়ে মার্কস্‌ যে বুর্জোয়া চিন্তার লোহবন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রচার করে বসে। মার্কসের চিন্তা কোনোমতেই বুর্জোয়া নয়। সেজানের ছবি নয়। (লা প'সে, ২১ সংখ্যা।)

তাই তো সেজানের ঘরোয়া ছবি, আপেলগুলি অনেক বেশি প্রগতির বাহক, সমসাময়িক অনেক তথাকথিত রিয়ালিস্টিক্‌ ও জনপ্রিয় শিল্পীর চেয়ে, যাদের জুর্‌দ্যাঁ বলেছেন কেক্‌বানানোওয়ালা।

কলকাতা গোষ্ঠীর কাছে এবারে যে আবেদন আমরা জানাতে পারি সে

হচ্ছে যে তাঁরা সন্ধানের যে স্তরে পোঁছেছেন সেখানে তাঁরা যেন এখন ব্যক্তি-স্বরূপের গভীরতায় জারিত কালঘন গভীরতার দিকে আরো বেশি মন দেন। সেটা সম্ভব হবে যখন তাঁরা চিত্রের উপরত্বকের সমস্যা থেকে আরো সমগ্রতর সমস্যায় মন দেবেন, যখন প্রত্যক্ষ বহির্বিশ্ব, বস্তুজগৎ বা সমাজ তাঁদের চোখ থেকে মানস অবধি আক্রান্ত করবে এবং সেই দ্বন্দ্বকেই যখন তাঁরা আহ্বান করে স্বকীয় চৈতন্যের ও রূপায়ণের গভীরতায় জারিত করবেন। দর্শকের চাই ধৈর্য, বৈপ্লবিক ধৈর্য, কিন্তু শিল্পীরাও যেন সাধনার ধৈর্যভঙ্গ করে শুধু প্রদর্শনীর চমকে আমাদের দৈন্য দূর করার কাজে স্ববিকাশ রোধ করে থমকে না থাকেন।

১৩

সোভিয়েট শিল্প-প্রদর্শনী

আমাদের বিড়ম্বিত শিল্পচর্চার জীবনে এই বিরাট প্রদর্শনী এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ছবি যখন টাঙানো হচ্ছে—এবং সে প্রস্তুতির ব্যাপারটাও যে বীরত্বপূর্ণ সে কথা প্রবীণ জামশকিন ও রুশ শিল্পীদের কাজ যাঁরাই দেখেছেন তাঁরাই জানেন—তখন যামিনী রায় বলেছিলেন যে, রাজা ইংরেজ দুশো বছর রাজত্ব করল, ব্যবসা করল, আর্ট স্কুল করল, প্রথমে ইংরিজি ছবি আঁকা শেখাল, তারপরে নিরাপত্তা বিবেচনা করে ওরিয়েন্টাল আর্ট শেখাল, কিন্তু কোনোদিন নিজের দেশের শিল্পসম্ভার একবার এনে দেখাল না, বরণ্চ এদেশ থেকে ওদেশে নিয়ে গেল। আর, সোভিয়েট লোকেরা রাজত্ব করে না, কিন্তু গভীর শ্রদ্ধায় আমাদের সবাইকে শিল্পের ঐশ্বর্য বয়ে এনে দেখাল, আমরা নিজের চোখে দেখলুম পশ্চিম দেশের রিয়ালিসম্ কী ব্যাপার। বুঝলুম কী রীতিতে, কী সাধনায়, কী ঐতিহ্যে ও সামাজিক জীবনের বাস্তবপটে রিয়ালিস্টিক বা প্রত্যক্ষবাদী শিল্পের প্রাণ।

সোভিয়েট শিল্পপ্রদর্শনী যে আমাদের প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে, তার প্রমাণ দর্শকদের সংখ্যাগৌরবে, সাধারণ নিরহঙ্কার মানুষের স্বতোৎসারী প্রশংসায়, তথাকথিত বিশেষজ্ঞের ও অর্ধবিশেষজ্ঞের উল্টোপাল্টা নানা কথায়, আলঙ্কারিক শিল্পীদের নানান হতচকিত মন্তব্যে, যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও অতুল বসুর মতো আকাডেমিক শিল্পীদের তারিফে। তার উপরে প্রমাণ হল আরেকটি ব্যাপারে : যামিনী রায়ের মতো শুদ্ধ শিল্পীর নামে রুশবিদ্বেষী এক কল্পিত বিবৃতি এক দৈনিক পত্রে শিল্পজগতের কোনো কোনো মুরুব্বি মার্কিনী কায়দায় ছেপে দিলেন, যার সংশোধন যামিনী রায় পাঠালেও ছাপা হল না।

বলাই বাহুল্য, প্রদর্শনীটি এতো বড় হলেও সোভিয়েট মহাদেশের মতো মহান ও মুক্তদেশের পক্ষে এ একটা বাছাই করা সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনী মাত্র। মোটামুটি ভাবে যা আনা সুবিধা হয়েছে সেই প্রথাসিদ্ধ ও আপাতবোধ্য ছবি ও মূর্তিরই এটি একটি পরিচয়। উদাহরণত, বলা যায় যে আইকন চিত্র এতে ছিল না, কারণ গির্জা তুলে আনা অঘটন-ঘটনপটীয়সী সোভিয়েট শক্তিতেও সম্ভব হয়নি, যদিচ সে বিষয়ে আমাদের এক আইকনগ্রাফমতি সমালোচক দুঃখ-প্রকাশ করেছিলেন!

অনেক শিল্পীর কাজই আনা সম্ভব হয়নি, কারণ শিল্পীরা সে জীবন্ত সমাজে সার্থক ও সম্মানিত এবং সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে বহু। অষ্টাদশ শতাব্দীর

গোড়া থেকে নিকিটিন. আন্ত্রোপভ্, লোসেঙ্কো, বোকোটভ্, লেভিট্স্কি থেকে একালের নব্য শিল্পী অবধি শিল্পকার্য কিছু দেখা যায় নবপ্রকাশিত ট্রেটিয়াকফ্ গ্যালারির প্রকাণ্ড চিত্রপুস্তকটিতে। তাতে বোঝা যায়, বুর্জোয়া রিয়ালিস্‌মের কি বিকাশ রুশশিল্পে ঘটেছিল এবং বিপ্লবোত্তর কি রূপান্তর ঘটল সেই প্রবল বাস্তব ঐতিহ্যে। ইতালিতে বুর্জোয়া রেনেসান্সে, ওলন্দাজ বুর্জোয়া জাগরণে, জার্মান মধ্যবিত্ত উত্থানে, এমনকি ফ্রান্সের বুর্জোয়া নবজীবনে—দাভিদ্ দলাক্রোয়া এমনকি বার্‌বিজ' অবধি—রিয়ালিসমের যে শোভা তারই একটা দিক সাবেক রুশ শিল্পে উজ্জ্বল। অবশ্য সাহিত্যে যেমন রুশ গোগোল, ডয়েস্টভস্কি, টুরগেনীভ, টলস্টয়, চেখভ বা গোর্কির রিয়ালিসম্. ফরাসী বালজাক, স্তঁদাল. ফ্লোবেয়র, দ' মোপাসাঁ প্রভৃতির সমতুল্য কিন্তু স্বকীয় তীব্রতায় ও ব্যাপ্তিতে স্বতন্ত্র, চিত্রেও তেমনি রুশ বুর্জোয়া বাস্তবিকতা আপন বৈশিষ্ট্যে বলিষ্ঠ। আজ সে বাস্তবতা কিউবিসম্ ফিউচারিসম্ প্রভৃতি খণ্ড চৈতন্যের প্রয়াস পার হয়ে জীবনের রূপান্তরের চৈতন্যের সঙ্গে নতুন এক ব্যাপ্ত আকাডেমিক মানে পৌঁছচ্ছে।

ইতালীয় ওস্তাদদের কাজ যাঁদের ভালো লাগে, ড্যুয়েরর, রেমব্রান্ট, রুবেন্স, ব্রয়গেল, ভেরমীর, গোইয়া যাঁদের আনন্দ দেয় তাঁদের চোখে তাই এই প্রদর্শনীও নয়নাভিরাম লাগবে, জীবনমানসে ও বিষয়-বৈচিত্র্যে তা যুগান্তকারী হলেও। ধরা যাক, চিঠি পড়ার ছবিটি। তার আলোর আশ্চর্য দীপ্তি নিশ্চয়ই ওলন্দাজদের ভাস্বর আলো মনে পড়িয়ে দেবে। কিন্তু তফাতও আছে; ওলন্দাজ ছবিতে আলো অপেক্ষাকৃত মধ্যবিত্ত অন্তঃপুরীন এবং স্থিত, এই ছবিটিতে আলো ভাস্বর বহিঃপ্রকৃতিতে সমুত্তীর্ণ। শুধু তাই নয়, শরীর-রূপ এখানে আলোক-বর্ণের স্পন্দমান বাস্তবতায় প্রাণময়, আকার এবং রং অর্থাৎ সাকার বস্তুতে আলোর বর্ণাঢ্য রশ্মিসঞ্চার এখানে আরো অভিন্ন।

বস্তুত, রঙের এই ঐশ্বর্য সোভিয়েট চিত্রের এক আশুবোধ্য বৈশিষ্ট্য। হয়তো, রঙের এই উল্লাসে রূপ সময়ে সময়ে নিরাকার হয়ে গেছে—যেমন দেখা যায় কখনো কখনো ভেনিসীয় চিত্রে, কঠিনতর রূপস্বচ্ছ ফ্লরেন্সীয় চিত্রের তুলনায়। তাই হয়তো অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎকার নামক ছবিটি রঙের বাহারে ও বাস্তবতার অনুকারে, এমনকি ফুলের রক্তিমার প্রতিফলনেও আমাদের মুগ্ধ করে। তারপরে মনে হয় অখণ্ড সংযোজনে বা গোটা ছবির রূপবিন্যাসে শিল্পী হয়তো ঈষৎ কম মনোযোগ দিয়েছেন, যেটা রুশ ডকুমেন্টরি ফিল্মে মাধ্যমের গুণে স্বতই সংশোধিত হয়ে যায়। তাই স্বনামধন্য নেতাদের মধ্যে রঙে-রঙে উদ্‌ভ্রান্ত চোখ পথ হারায়, রূপায়ণের গতিতে সমগ্র জটিল চিত্রটি স্বকীয় বিন্যাসে স্পষ্ট হয় না। এদিকে নেতারা আমাদের পরিচিত ইতিহাসবরেণ্য মানুষ, তাঁদের শুধু পটভূমির ভিড় বলে ভাবতে আমাদের, তথা শিল্পীরও দোমনা লাগে। তাই কি ক্যাটালগের বা ট্রেটিয়াকভ গ্যালারির এক রঙা প্রতিচিত্রটি অনেক বেশি স্পষ্ট লাগে, রঙের বাহ্য ঐশ্বর্য বাদ দিয়ে চলমান ছবিটি নিজস্ব এবং স্বচ্ছতর জঙ্গম মর্যাদা পেয়েছে বলেই? আবার, তাই কি ফিল্মে স্টালিনকে দেখে অত ঘনিষ্ঠভাবে ভালো লাগে?

সত্যিই, এই সোভিয়েট প্রদর্শনী আমদের শিল্পজগতে মৌলিক আলোড়ন এনেছে। আমাদের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত অনেকেরই ধারণা, অবশ্যই মিথ্যা

ধারণা, যে শিল্প শুধু তথাকথিত পশ্চিমা আধুনিক শিল্পে নিঃশেষ, ভাঙনের অপরিহার্য চৈতন্যসংগ্রহেই জীবনের গতি ক্ষান্ত। বলা বাহুল্য, পশ্চিমের বুর্জোয়া শিল্পমঞ্চে যে নানা জঞ্জাল কালক্রমে জমেছিল, পিকাসো মাতিস্ ব্রাক রুয়ো বিকাশের অমর তাগিদে তা কম বেশি ঝেঁটিয়েছেন। শুদ্ধিদাতা তাঁরা নমস্য। তবু তাঁদের এই শুদ্ধি মুক্তির প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র, যেন বিপ্লবের নেতিমূলক প্রথম দশদিন। শিল্পের ভবিষ্যৎ ট্রট্স্কি-চালে এখানেই থামে না। তারপরে থাকে ধৈর্যের আস্তিক নির্মাণ, অনেক যন্ত্রণা অনেক প্রত্যয়ের মধ্যে দিয়ে। তাই শিল্পের শেষ পিকাসোর মতো ভাঙাগড়ার লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারীতেও নয়, কারণ জীবনের দাবি আরো প্রবল, আমাদের মানবিকতার মধ্যেই যে প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ বিশ্বের উপরে রূপকর্তৃত্বের সানন্দ অঙ্গীকার। অবশ্য এ-দাবির পিছনে এবং এ মেটাবার ক্ষমতা অর্জনের পিছনে শুধু শিল্প-বিপ্লব নয়, সমাজ অর্থাৎ জীবনের সমাধানও জড়িত। আমাদের দেশে বিড়ম্বনা সেইখানেই—আমাদের কোনো বুর্জোয়া রিয়ালিস্‌মের বর্তমান ঐতিহ্য নেই, আছে ভারতীয়ম্মন্য প্রাচ্যবাদ বা শূন্যজীবী পশ্চিমা আকাডেমিক শিল্পের প্রতিধ্বনি, কিম্বা হঠাৎ-হাওয়ায় উড়ে আসা আধুনিকতা, অস্পষ্ট থেকে গেছে দেশের লোকমানসের নানা শিল্পসাধনা, এবং শুধু দূর থেকে এসেছে নবীন শুদ্ধতার চৈতন্যের বিশ্বব্যাপী রেশ। এরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদেশে যামিনী রায়ের মতো শিল্পীর সাধনা ও সিদ্ধির সীমা।

সমতুল্য সমস্যাই মাতিস্ বা ব্রাক বা রুয়োর কর্মক্ষেত্রে। এ সাধনায় শুদ্ধের অভিযানে প্রত্যক্ষের বোধ, চৈতন্যের তলে বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে থাকলেও সাক্ষাৎ প্রেরণা কম-বেশি বা কখনো-কখনো পরোক্ষ মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। একেই সোভিয়েট ভাষায় বলা যায় 'এবস্ট্র্যাক্ট,' বলা যায় যে শিল্পীর প্রেরণা দৃশ্য ও জীবনগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বিশ্বের রূপদানে ততোটা নয়, যতোটা পরোক্ষ বা কলাকৌশলচিন্তায় অর্থাৎ এ চিত্রে খণ্ডচৈতন্যে অস্থির বিদ্রোহী শিল্পীর মননশীল ভাবনা জাগে রং রেখা রূপের নব নব বিন্যাসের প্রায় বৈজ্ঞানিক কৌতূহলে। মানুষের জ্ঞানের দিক থেকে এ কৌতূহল ও তার ফলাফল মূল্যবান, কিন্তু এ ঝোঁককে অগ্রগামী জীবন ও গতিশীল শিল্পেষণার একাকার সমগ্র প্রেরণা ভাবাও ভুল। এ এক রকম পচা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে শুদ্ধির এক প্রতিক্রিয়া। প্রয়োজনীয় কিন্তু প্রাথমিক মাত্র।

বলাই বাহুল্য, এই প্রেরণার সমগ্রতার যে শিল্পসিদ্ধি তা অনেক সোভিয়েট চিত্রে এখনও স্পষ্ট হয়নি। সেদিক থেকে সোভিয়েট নৃত্য, নাট্য ও ফিল্মই বোধহয় সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ। আইসেনস্টাইন পুডোভকিনের ছবি থেকে এ কালের মহাকাব্য বেরলিনের পতন অবধি দেখে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সোভিয়েট চিত্রে ভাস্কর্যে এখনও হয়তো মৃত্যুর আশপাশের প্রতিক্রিয়া থেকে আত্মরক্ষাতেই মৃত্যুঞ্জয় শিল্পীরা প্রতিমিতি ও জ্যামিতিক বিন্যাস, যথাযথতা ও সামগ্রিক সংযোজন দুটিকে একটু বেশিই ভিন্ন করে দেখেছেন—যদিচ ট্রেটিয়াকফ শিল্পাগারের লেনিনের একাধিক মূর্তি, স্টালিনের খোলা জায়গায় রাখা মূর্তিটি, গোর্কির তির্যক মুখখানি এবং অনেক মূর্তিতে ও চিত্রে এই প্রত্যক্ষ ও সংযোজন ইতিমধ্যেই সমগ্রতার আভাস পেয়েছে। এমনকি যাকে ভূতপূর্ব ক্যালকাটা গ্রুপেরও মনে হবে 'এবস্ট্র্যাক্ট' বা জ্যামিতিক এমন কাজেরও

অভাব নেই নবীন সোভিয়েট শিল্পীদের মধ্যে, যথা—ভিলেনস্কির চাইকভস্কি, মানিজেরের ভি, আই, লেনিন, কুক্রিনিক্সির চেকভের গল্পের চিত্রণ, শেরভুদের সৈনিক, নিকোলাদ্জের গ্রুজেনস্কি, মুখিনের রুটি, মেরখুরভের গ্রানিট পোট্রেট এবং সর্বোপরি পিনঝুচ্ছিয়ার স্টাখানোভ মহিলার গ্রানিট মনুমেন্টাল মূর্তিটি। তেমনি, মানুষের চেষ্টায় ও যন্ত্রণায়, মূল মানবিক দ্বন্দ্বের ট্র্যাজিক গভীরতার আভাসও এ'দের কাজে থেকে থেকে পাওয়া যায়, যদিও হয়তো নির্মাণের ব্যাপ্তির দিকে, প্রত্যয়ের প্রসারের দিকে আজও বাধ্য হয়েই ঝোঁক।

আরেকটি প্রশ্ন উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। সমাজতন্ত্রী আধেয় বা বিষয় ও জাতীয় শিল্পরূপ বা আধার—এ তত্ত্বটি আমরা সোভিয়েট নৃত্য-কলায় নাট্যে-সঙ্গীতে কাব্যে যেমনটি পাই তেমনটি কেন্ ফিল্মে বা চিত্রভাস্কর্যে পেলুম না? প্রথমত, কিছু বৈশিষ্ট্যের আভাস দেখা যায় বৈ কি, কিউবান কসাক্সে, পরদেশীদুলহ'নে, এশিয়ার ঝড়ে, সাইবিরিয়ার কাহিনীতে; কিংবা চুইকভের কিরঘিজ্ মেয়ের ছবিতে এবং উজবেক পোট্রেটে।—অবশ্য পাথরে ব্রঞ্জে বা তৈল চিত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশী শিল্পরীতির ভিন্নতা কিছুটা লুপ্ত হতে বাধ্য, যেমন এঞ্জিন বা মোটরযন্ত্র জাতি বা দেশ মানে না। দ্বিতীয়ত, আজকের দিনে এবং সোভিয়েট মহাদেশের মতো বিপ্লবোত্তর গোটা জীবনের রূপান্তরের মধ্যে আর আমাদের কলকাতা বা দিল্লীওয়ালে এবং অনুন্নত আদিবাসীর রক্ষণশীল ভেদাভেদ থাকে না। তাইতো পামীরের উপরে—সবচেয়ে উঁচু মিনার নয়—সুসজ্জিত গবেষণাগার বসে। তাই কিরঘিজ শিল্পী যখন তীনসান পর্বত আঁকেন, সে পর্বতের ছবি স্বভাবতই, উন্নত নব্য ইওরোপের পর্বতের ছবির মতোই লাগে, বুর্নিয়ে সাহেবের বহুপৃষ্ঠপোষিত অনুন্নত নেপালী চাকরের ছবির সঙ্গে তার ভিত্তিগত অমিল। অবশ্য সেখানেও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার বিষয়। বুর্জোয়া ইওরোপের যন্ত্র কৃষি-বিপ্লবের আগে নিসর্গ-দৃশ্য চিত্রে প্রায় অনুপস্থিত, তারপরে প্রকৃতি প্রথম হল জাঁকালো পটভূমি, ধনিক জীবনের প্রাকৃতিক অলঙ্করণ, তারপরে তা হল রেলপথে গম্য সপ্তাহান্তের চিত্তবিনোদন, অর্থসর্বস্ব যান্ত্রিক জীবনের কোলাহল এবং নোংরা থেকে সাময়িক বিশ্রাম। মানুষ তখনও প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বোত্তর একাত্ম নয়। শ্রেণীহীন সমাজের সঙ্কল্পেই দুই হয়ে ওঠে একাত্ম। এই একাত্মতার ইঙ্গিত সোভিয়েট নিসর্গচিত্রে এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে, উন্মুক্ত নিসর্গপটে ভোরবেলায় মাঠে আকাশের পটে স্টালিনের ছবিতে যার আভাস, কিম্বা কোরিন্-এর প্রকৃতির পটে দীর্ঘকায় রোগমুক্ত গোর্কি'র ছবিতে। ফিল্মে তো তা স্পষ্টই। তাই চুইফকের তীন্সান পুস্যাঁর খেয়ালী দুর্গমতায় জাঁকালো নয়, টর্নারের বর্ণ-কুহেলীতে তাঁর ঠুংরী আত্মদান নেই, সে সংহত, প্রায় মানুষের আয়ত্তে, ঘোড়ায় বা খচ্চরের পিঠে তা গম্য, তাই সারা ছবিতে নীলের আভা, যে নীল আমাদের টেনে নেয়, দূরে ঠেলে না। সোভিয়েট শিল্পের ভবিষ্যৎ মুক্তবুদ্ধির ন্যায়সঙ্গত ধ্রুপদের সংহতিতে—যেখানে উৎকট স্বকীয়তা নয়, সমবেত উৎকর্ষই মান। এই ভবিষ্যতেই মানুষের শিল্পের সেই বৃত্তের সম্পূর্ণতার ইসারা, যে বৃত্তের আরম্ভ আদিম প্রস্তর যুগে, পরিপ্রেক্ষিতহীন স্থানরহিত শিকার-জন্তুর স্তম্ভিত কিন্তু বাস্তব, আবস্ট্রাক্ট কিন্তু রিয়ালিস্টিক প্রতিলিপিতে এবং সেই সঙ্গেই জ্যামিতিক কিন্তু প্রচণ্ডভাবে গতিশীল জীবন্ত শিকারশিকারীর সম্বন্ধপাতের

সচল চিত্রে। এবারে আমরা কৃতজ্ঞ মিউসিয়মের, গ্যালারির, হলের ছবি দেখে; আগামী প্রদর্শনীতে নিশ্চয়ই দেখে কৃতার্থ হব, তারই সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের ছবি, বাসাবাড়ির অন্তরঙ্গ ছবিও, মানবিক আনন্দে ও যন্ত্রণায় ঘনিষ্ঠ ও অখণ্ড।

১৪

লোকসঙ্গীত

ভেরিয়র এল্‌উইনের সহানুভূতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের দেশে নৃতত্ত্ব আজ বিশেষজ্ঞের জঙ্গল থেকে মানবজীবনের ব্যাপ্ত মাঠে-হাটে মুক্তি পেয়েছে। আমরা, যাদের মুখ্য উৎসাহ প্রত্যক্ষ মানুষে, তাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ আমাদের মতো সাধারণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণের কাছে নৃতত্ত্বের নানা কাল্পনিক জাতিবিচারের বা মাথার খুলির নানান চেহারার কূটালোচনার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান মানুষের প্রত্যক্ষ জীবন, তার সুখদুঃখ। বিশেষ করেই কৃতজ্ঞ বোধ করি এলউইন্‌ ও আর্চরের কাছে, কারণ তারা নিজেদের কাজে এবং 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' পত্রের মারফৎ ভারতীয় জীবনের একটা বিরাট দিকে আলোকপাত করেছেন। সংস্কৃতিগত সংগঠনের বা ছকের দিকে তাঁদের সার্থক ঝোঁক মূল্যবান, কারণ তা না হলে সমাজজীবনের ছকও দুর্বোধ্য থেকে যায়। এইদিক থেকেই প্রথমত আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, ভারতীয় হিসাবে, শরৎচন্দ্র রায়ের উত্তরাধিকারী হিসাবেই।

তাছাড়া কবিতার দিক থেকেও বটে। কারণ কবিতারও নিজস্ব টেকনিকগত সমস্যা আছে—বিজ্ঞানের মতোই, যদিচ তার মূল্য গৌণ, এবং লোকসাহিত্য এ সমস্যা নির্দেশে আমাকে অন্তত সাহায্য করে। মুস্কিল হচ্ছে যে আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী। আর 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া'র বিষয় আমরা হলেও, দামের বহরটা সাহেব-শোভন। যাহোক, আমার মনে আছে আমার উত্তেজনাটা যখন আর্চরের সৌজন্যে ছত্তিশগড়ী গানের প্রুফকপি প্রথম দেখি। এল্‌উইনের ছত্তিশগড়ী বা আর্চরের উরাও* বা সাঁওতাল কবিতা যে নিছক আনন্দই দেয় তাই নয়, আমাদেরই সাহিত্যিক প্রশ্নাবলী তোলে এবং কথঞ্চিৎ সমাধানও করে এবং সে সমাধানও প্রায় আমাদেরই।

তাই বইটি পেয়ে বন্ধুত্বেরই উজ্জীবন পেলুম। নতুন পেলুম এল্‌উইনের প্রচুর টীকাটিপ্পনীর অংশ এবং আর্চরের ভূমিকা। আর্চর তুলেছেন যে-কোনো সাহিত্যভাবুক লেখকের পক্ষে আজ গুরুতর সেই প্রশ্নটি, যার জবাব যে-কোনো প্রকৃত ও বিকাশমান সাহিত্যিককে পেতেই হবে: সামাজিক ঐক্য বা সমষ্টিবোধ কতোখানি এবং কিভাবে কবিতা বা সংলাপের পদ্ধতি ও ফলকে নির্দিষ্ট করে। যে-কোনো শিল্পেই এ প্রশ্ন বিবেচ্য। চিত্রে বা ভাস্কর্যের ইতিহাসে দেখা যায় কিভাবে সামাজিক জীবনের একসূত্রে সংকেতিতমার্গের (কনভেনসন্‌স্‌) সীমার মধ্যেই নামহীন শিল্পসৃষ্টির লোকোত্তর মহিমা প্রকাশ পায়। লোকশিল্পের বাস্তববিরোধী নয়, বাস্তবপরিপক্ব পরোক্ষতা

(এবস্ট্রাক্‌ট্‌ ফর্ম) আসলে তার লোকায়তিক মুক্তিই। তাই আজ মাতিস্‌, পিকাসোর চোখ যায় স্পেনের এবস্ট্রাক্‌ট্‌ লোকশিল্পে, মরক্কোয়, নিগ্রোদেশে, মধ্যযুগের নামহীন ফরাসী কাচ বা পুঁথিচিত্রে। যামিনী রায় তাঁর উগ্র সমাজ-চৈতন্যের প্রকাশ পান বাংলার অসামান্য লোকশিল্পের নিদর্শনের সঙ্কেতেই তাঁর বলিষ্ঠ স্বকীয়তায় ('দি আর্ট অফ যামিনী রায়' দ্রষ্টব্য)। সঙ্গীতেও এই যে মুক্তির পথ তা বার্টক্‌, ও ওঅলটন্‌, ব্রিটেনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত। সাহিত্যেও যে তাই, আরাগঁর ক্ষেত্রে তা দেখি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে সোভিয়েট দেশে এই লোকশিল্পের চর্চা ব্যাপকভাবেই চলেছে এবং অচিরে যে এই স্রোত, বিপ্লবপূর্ব তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিক ঝোঁকের জেরকে মার্জিত করবে, জ্যাক্‌ চেন্‌ সে কথা বলেছেন।

আর্চরের এই সমস্যানির্ণয়ে নানা কথার মধ্যে একটা দিক হচ্ছে ফরাসী প্রতীকী কবিদের বিচার এবং সেই প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ সেকেলে ইংলন্ডের আধুনিক কবিদের। কবিতায় প্রতীক (সিম্‌বল্‌) অথবা প্রতিমা (ইমেজ) সম্পূর্ণ সার্থকতা পায়, যখন পুরুষার্থ (ভ্যালুস) বিষয়ে মোটামুটি খানিকটা সামাজিক মতৈক্য থাকে। এবং তা সম্ভব হয় সমাজ শ্রেণীবিভাগহীন বা অতিরিক্ত কোনো একটা ছকে গ্রথিত থাকলে—খানিকটা যেমন হয় মধ্যযুগীয় হায়ারার্কিক্যাল বা বৃত্তিজীবী সমাজে, আরো হয় আমাদের অনার্যপ্রতিবেশী-পূর্বপুরুষদের সমাজের মতো একে, বা সম্যক হয় সোভিয়েট দেশে। অবশ্য আর্চরের একথা সত্য যে সাম্যবাদের এখনও প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। সে কথা কেউ দাবিও করে না। কিন্তু ঐ সামাজিক জীবনের ঐতিহ্যের যে—শিল্প-সংস্কৃতির দিক থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় ও উর্বর—সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, সে কথা সাম্প্রতিক রুশকবিতাবিচারে বাউরার মতো অসাম্যবাদীকেও মানতে হয়েছে। তাছাড়া, এই আনকোরা কড়া মাটিতেই তো মায়াকফ্‌স্কির মতো কুশলী প্রতীকী প্রচার-ছড়া লিখেছেন, এবং পাস্টেরনাকেরও জীবনযাত্রা অচল হয়নি। সিমোনভের নামও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আর্চর আলোচনায় এলুয়ার ও আরাগঁর সাম্যবাদী বিবর্তন বাদ দিয়েছেন। লুমানিতে, আক্‌সিঁও, লেৎর-ফ্রাঁসেস্‌ ইত্যাদির সাক্ষাৎ প্রচার কি করে যে বিলাতী ছুঁৎমার্গে সাহিত্যিকদের কাব্যবিলাস চরিতার্থ করে, সে রহস্য তাই স্পষ্ট হল না। আসলে অবশ্য কবিতার দুই হাতই সমান চলে, কলিংউড্‌ সাহেব যেমন বলেছিলেন, এবং উঁচ্‌কপালে কবিতাও, তা সে আদিবাসী সমাজেই হোক, সোভিয়েট সমাজেই হোক। এবং দু'হাত থেকে থেকে একতালেই চলতে পারে, যদি কবির বহুধা মানসে থাকে সমগ্রতার কমবেশি আভাস।

এল্‌উইন্‌ 'ফোক সঙ্‌স্‌ অফ্‌ ছত্তিশগড়' বইয়ে সারা জীবনটাই গ্রহণ করেছেন, তাঁর অনুদিত কবিতা, ভাষ্য ও পাদটীকায় গভীর জ্ঞান ও দুর্লভ সংবেদ্যতায় জীবনের একতাই প্রকাশ। তাই অপূর্ব সুকুমার প্রেমের গানের সঙ্গে সচরাচর নিষিদ্ধালাপ বিষয় গর্ভাধানও স্থান পায়, চরম রোমান্টিক বেদনার সঙ্গে থাকে রাজনৈতিক গান আর মাছমার্কা দারোগাবাবুকে নিয়ে ব্যঙ্গ :

> দারোগা সাহেব
> এ কী সুখবর! বদলী হলেন

এক পয়সায়
তিনি কিনতেন মুরগী ও ডিম
দারোগা সাহেব ছাড়া আর কেবা এক পয়সায়
বাজারে কিনত কাপড় ?

বইটিতে এতো বেশি ভালো গান বা কবিতার প্রাচুর্য যে, দু-একটি উদ্ধৃতি-অনুবাদ অর্থহীন। কিন্তু এখানে বলা দরকার যে এসব কবিতার প্রতীক আমার কাছেই প্রতীক, তার গোষ্ঠীপ্রচলিত কৃতার্থ আমি জানি না বলে, এল্‌উইনের সাহায্যে তার ছত্তিশগড়ী মানে জানার পরে সেগুলি হয় শুধু অলঙ্কার বা রূপকী প্রতিমামাত্র। রূপকপ্রতিমা যেন বাজারে-কেনা প্রতীক, তৈরি মাল, অঙ্কের প্রতীকের বা চিহ্নের মতো। অথচ সার্থক প্রতীকী কবিতা প্রতীকী রূপ পায় সমগ্র কবিতার বা কবিতার স্তবকের মধ্যে দিয়েই, আদ্যন্ত রূপায়ণেই। এ দুয়ের তফাৎ প্রায় মালার্মে, ভলেরি, রিল্‌কে-র সঙ্গে আর্চের উল্লিখিত ডিলান্‌ টমাসের তফাৎ। বা বৃহত্তর ভাবে বলা যায় যে এদের তফাৎ কোলরিজ-বর্ণিত সংকল্পনা ও বিকল্পনার বিভেদ। কিম্বা উপমা ও উৎক্ষেপের মধ্যে যে তফাৎ। ছত্তিশগড়ের এই সব চমৎকার গানগুলির অধিকাংশই তৈরী প্রতিমায় বাঁধা, তাই সঙ্গীতে যে একক প্রতীক বা চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন রাগবিন্যাসে, বিন্যাসেরই মধ্যে দিয়ে বিশিষ্ট অর্থ পায়, সে অর্থের উদ্‌ভাসন এখানে দুর্লভ।

আদিম লোককাব্যে কেন এই তফাৎ বাস্তব, তার কারণ আপাতবোধ্য। খানিকটা এটা নির্ভর করে আত্মসচেতনতার পর্যায়ের উপরে, তার গভীরতা ও স্থিতিকালের, এবং তার শুদ্ধতার উপরেও। এইখানেই ইয়েট্‌স্‌ ও এলিঅটের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য। এলিঅটের অনেক কবিতায় অনেক জায়গায় মন্থিত প্রতিমাটি স্বকীয় সত্তা পায় তার রেফারেন্স ভ্যালু অভিধার্থের অপেক্ষা না রেখেই—যদিও অনেক সময়ে আবার দুটিধারা মিশ্র হয়ে যায়। সেইজন্যেই এলিঅটের মতো কবিতা লিখতে রাজতান্ত্রিক ধর্মতান্ত্রিক না হলেও চলে। কিন্তু ইয়েট্‌সের আলঙ্কারিক মানসের জন্যে তাঁর যোগ, ভূত ও আইরিশ রূপকথায় ভারাক্রান্ত প্রতীকগুলি চিত্তশুদ্ধি বা বিবিক্তির অভাবে যথেষ্ট পরোক্ষ নয়। এবং বলাই বাহুল্য, আদিম সরল সমাজের লোক-সাহিত্যে এটা আশাই করা যায় না। লোনিন-রূপকথায় আর রুরিক-রূপকথায় বা সোনাখাঁর কাহিনীতে এই তফাৎ। কিন্তু ডক্টর এলউইনের অনুপম এ অনুবাদ অনেকগুলিতে অবশ্য অনেক প্রতীকেরই নিজস্ব কাব্যসত্তা আছে :

কি করে ভাঙলে সোনার কলসখানি
বলো তো কোথায় হারালে তোমার জ্বলজ্বলে যৌবন?

বা, ও রূপসী মেয়ে ফুল ফোটে রাতারাতি
আমরাই যারা একদা ছিলাম ছোটো
আজ প্রেমে প্রস্তুত।

বা, হে শ্বেতকরবী তোমার তুলনা নেই
চয়নিকা তুমি হাজার মুখের ভিড়ে।

অন্তত আমার তাই মনে হল। হয়তো তার কারণ বাংলার অনার্য ধারার প্রবলতাই যার জন্যে আদিবাসীর প্রত্যক্ষধর্মী মানসের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিক মিল এতো গভীর, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও। অবশ্য ভারতরক্ষক নৃতাত্ত্বিকরা এখনও বাংলাকে বাদই দেন। কিন্তু জীবনের নানাব্যাপারে বাঙালী এবং সাঁওতাল বা গণ্ডীর যে সব বিস্ময়কর মিল, তার ব্যাখ্যা এখানেই, বাহ্য প্রভাববিস্তার সন্ধানে নয়। তাই আমার মনে হয় যে এলউইন ও আর্চর হিন্দুমহাজনব্যবসায়ী ও বাংলাকে কাকতালীয়ে এক না ভেবে (যে ভাবার পিছনে ইংরেজের রক্ষণাবেক্ষণের সমর্থন) যদি এ বিষয়ে আরেকটু মন দিতেন তাহলে আসামসীমান্তে মন্ত্রচালিত পার্বত্যস্থানের আন্দোলন জোর পেত না। (কিংডন-ওয়ার্ডের প্রবন্ধ, ম্যান ইন ইন্ডিয়া, এডমিনিস্ট্রেশন নাম্বর)। অধিকন্তু অনেক সংস্কৃতি বা মানসমূলক এবং সাহিত্যিক মার্গ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরও তাঁরা পেতেন যেমন পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর যুগান্তকারী বই 'বাংলার ব্রত'তে। নরনারীর দেহ সম্বন্ধে, মাতৃত্ব, খাওয়া এসবের প্রতি যে মনোভাব আদিবাসীদের, তাই কি আমরা পাই না বাংলার প্রাকৃত মনে ও জীবনে তথা মঙ্গলকাব্যে বৈষ্ণবপদাবলীতে? দেবর-ভাউজী সম্পর্কের কনভেনশন, এমনকি রসালু কাউরের সাহিত্যিক কনভেনশনেও সেই আত্মীয়তা প্রমাণিত। আর বট্‌কিনের পরেও কি লোকসাহিত্যাদি ফোকলোর ও কাল্‌চার শুধু আদিম অর্থনীতিতে নন্‌-রেগুলেটেড এরিয়াতেও খুঁজে বেড়াতে হবে? তাতে হয়তো স্টালিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণ মানার হাত থেকে আপাতত পালানো যায়, কিন্তু নিছক নৃতত্ত্বের দিকেও তাতে বাদ পড়ে অনেক কিছুই।

এ সমালোচনায় এলউইনের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা কমে না, যেমন কমে না এই বিজ্ঞানীর অসামান্য কবিপ্রতিভা।

একথা যথার্থই বলেছেন আর্চার তাঁর ভূমিকায় এবং তাঁর নিজেরও বিশেষ কবিপ্রতিভা। 'গোল্ড খান্'-এ আর্থার ওয়েলি তাঁর মুখবন্ধে এ দুইজনকে মানপত্র দিয়েছেন। এবং বলেছেন,

'It is to their category that Norman Cohn belongs, with his power to make us feel that nothing interposes between the reader of these songs and the primordial splendour of Siberian demigods.

ছটি দীর্ঘ কবিতা আছে আলটাই বা সোনা-খাঁ জড়িত বিষয়ে। দীর্ঘ কবিতা, প্রচণ্ড তার আবেগ, ভিন্ন তার বিন্যাস; চাকাস্ লোকসাহিত্য মোটেই সাঁওতাল বা গণ্ডী নয়। সাইবেরিয়ার নিসর্গ দৃশ্যে-এর পটভূমি। কিন্তু প্রায় এই অনুলিখিত কবিতার মতোই চমকপ্রদ এই চাকাস্‌দের সাম্প্রতিক ইতিহাস। সাইবেরিয়ার এই অঞ্চল আজ অদ্ভুত রকম কৃষিসমৃদ্ধ। তিনটি জাত নিয়ে এই চাকাস্ স্বায়ত্তশাসিত দেশ। ক-বছরে এই অশ্বারোহী যাযাবর জাত বৈজ্ঞানিক কৃষক হয়েছে, চালায় লেবরেটারি, ট্রাক্‌টর, কোঅপ্স, বর্ণমালা স্থির হয়েছে, পাঠশালা হয়েছে এবং লোকসংখ্যা হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এখন তারা শুধু নাকী সুরে টেনে-টেনে গান করে না সোনা খাঁর, লেখেও, এবং লেনিনের কথাও লেখে।

যেমন বলে বা গায় সত্যার্থীর দেশের লোকেরা, ভোজপুরী, আহির,

অন্ধ্রদেশী, পাঠান, রাজপুত বা ব্রহ্মদেশী। এবং অনুবাদের হাতও সত্যার্থীর ভালো, যেমন আশ্চর্য তাঁর ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণু তাঁর ভ্রমণ এবং সতত তাঁর মৈত্রী। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে এবং ফটোতে আমাদের দেশের চেহারা স্পষ্ট :

> তুমি তো দেখেছ কতো দেবদেবী, ইরাবতী
> তাঁরা কিবা কন্?
> তাঁরা কি করেন কিছু আমাদের স্বাধীনতা তরে
> তাঁরা কি দেবেন সত্য সুখ স্বচ্ছলতা, ইরাবতী বলো।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কেন বাংলায় এ কাজ করেন না, সুনীল জানার ক্যামেরা তো ভর্তি?

১৫

বুদ্ধিবাদী উপন্যাস

জ্ঞানী সমালোচকের সঙ্গে অন্তত এক বিষয়ে সাধারণ পাঠক সায় দিতে পারে যে চরিত্রপাত্রের মাহাত্ম্যেই উপন্যাসের মুখ্য সার্থকতা। উপন্যাসে চরিত্রপাত্রের অস্তিত্ব অবশ্য একাধিকলোকেও সম্ভব। বহির্জগতের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে ঝোঁকটা বহির্জগতের উপর পড়তে পারে, ব্যক্তির উপরেও পড়তে পারে। সেই অনুসারে পাত্রপাত্রীর চরিত্র অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল বা গতিচঞ্চল হয়। আবার তাদের স্বভাব অন্তর্মুখ বা বহিরঙ্গ হওয়াও আশ্চর্য নয়।

ধূর্জটিবাবু সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানী পাঠকের নানারকম আপত্তিতে আমার মতো সাধারণ পাঠকদের কিংকর্তব্যবিমোহ খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ করে যখন বোঝা যায় না যে উক্ত জ্ঞানী সমালোচকেরা, যাকে বলে মূল্যজ্ঞান, সেই জগচ্চিত্রতে শ্রেয়-প্রেয়ের মানদণ্ডে তাঁকে বিচার করেন কিংবা এরিস্টটেলীয় প্রতিভাসযাথার্থ্য নিরূপণেই তাঁরা ব্যস্ত।

কারণ ধূর্জটিবাবু সম্বন্ধে আমাদের মুশকিল হচ্ছে যে তিনি শুধু গল্প বা উপন্যাস লেখক নন, তিনি প্রবন্ধও লেখেন এবং তাঁর প্রসারে এবং প্রসঙ্গে তাঁর দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য স্বয়ম্প্রকাশ। তাই পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে প্রতিযোগী পাণ্ডিত্যাভিমানীদের আপত্তিও হয়তো ধূর্জটিবাবুর গল্প-উপন্যাসের সম্বন্ধে অনেককে দ্বিধান্বিত করে। অবশ্য প্লেটনীয় আপত্তিও তাঁর উপন্যাস সম্বন্ধে কেউ-কেউ হয়তো করেন, কিন্তু সে আপত্তি তো সব সাহিত্যিকেরই ভাগ্যে বর্তমান।

তাঁর ভাষা সম্বন্ধে আপত্তি বরং আরো বিবেচ্য। তাঁর প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধেও এ-আপত্তি উঠেছে নানামুখেই। সেখানে হয়তো খানিকটা ধূর্জটিবাবু দায়ীও। কারণ আমরা তথ্যান্বেষী; পণ্ডিত লেখকের কাছে আমরা পাঠ নিতে চাই, প্রবন্ধে তাই আমরা পাঠশালার আবহাওয়া খুঁজি, খামখেয়ালী শিল্পীর বহুধা-ভক্ত গ্রন্থবিহারে আমরা বিমূঢ় হয়ে পড়ি, ভুলে যাই যে অধ্যাপক শিক্ষকের বিদ্যালয়োত্তর জ্ঞানপ্রচার বেকন কিছু করলেও বার্টন করেননি, ফ্লোরিওর কাছে শেক্‌স্‌পিয়রও কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিও রেমোঁ সেবোঁ-র পরিচয়ে বিশ্বকোষের কৃপণ সেবকদের তথ্যবুদ্ধি হয় না। এখানে ধূর্জটিবাবুরও ভুল হয়ে যায়; তাই তিনি ইলিয়া-র চর্যা ছেড়ে অধ্যাপকী প্রবন্ধ লিখে ফেলে নিজেকে এবং পাঠককে দুনৌকায় দাঁড় করিয়ে দেন। আর এই দুই ভিন্নজগতের দ্বিধায় তাঁর প্রসঙ্গ-নির্ণয় বাক্যবিন্যাসাদি অর্থাৎ এককথায় ভাষাব্যবহার বিড়ম্বিত হয়ে ওঠে; শব্দের অভিধায় তাঁর স্বকীয় ভাষার লক্ষণা হারিয়ে যায়; যে স্থায়ীভাবে

তাঁর রচনার পুরুষার্থ, সেই শুদ্ধবাসনামূলক তাঁর সাধারণ্য তথ্যের অরণ্যে, বা ব্যুৎপত্তিতে কণ্টকাকীর্ণ নির্বাহের অন্ধকারে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু গল্পের বা উপন্যাসের উপলক্ষ্যই অন্য হওয়ায় ধূর্জটিবাবুর ব্যক্তি-স্বরূপ ও তাঁর সাধনা সার্থকতর মার্গ পায়। তাঁর দংশন শুধু গ্রন্থলোকেই প্রবল নয়, ব্যক্তিতেও তা ক্লান্তিহীন। যে কারণে উপরোক্ত আপত্তি তাঁর প্রবন্ধ সম্বন্ধে ওঠে, ব্যক্তিস্বরূপের সেই বিশেষত্বেই সামাজিক মানুষ সম্বন্ধে তাঁর চৈতন্য প্রখর। সেইটেই তাঁর কীর্তির পক্ষে যথেষ্ট, আর কিছু যদি তাঁর নাই থাকে। কারণ আমাদের নতুন সভ্যতায় নতুন সমাজ এই দেড়শ বছর মাত্র দেখতে হচ্ছে। সমাজের নানা স্তর ভাঙছে গড়ছে। তার মধ্যে শুধু কবিতার সরল আদিম চৈতন্যের হৃদয়-সংবেদ্যতায় কাজ গভীরে চললেও নানামুখিত্ব চৈতন্যালোকে আনতে হলে দরকার জটিল বহিরাশ্রয়ী সাকার তেত্রিশ কোটির বাহন গদ্য এবং রসাত্মক গদ্যরচনা। সেই জন্যেই তো বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক বা জাতীয়তা-ঘটিত মূল্য ছাড়াও যা কিছু সামান্য মূল্য থাকে, নাহলে মাইকেলের মনীষা বা কবিপ্রতিভা যারা বুঝেছে, বা দীনবন্ধুর মানবিকতার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে যারা তৃপ্ত, তারা বঙ্কিমচন্দ্রকে গ্রাহ্য মাত্র করলেন কেন? অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র শুধু শিল্প নয়, এই চৈতন্যসঞ্চারেও ফাঁকি দিয়েছেন। আমাদের বর্তমান অতীতে ও ভবিষ্যতে জড়িত, তিনি ইতিহাসহীন অতীতকে নিয়ে ব্যর্থশ্রম হয়েছেন। যেহেতু ইতিহাস চলে ভবিষ্যতের দিকেই নাক-বরাবর এবং আমরা সবাই অনিচ্ছায় বা অজ্ঞানেও ইতিহাসের একইসঙ্গে পত্রাধার, আকাশনীড়, সেই হেতু আমরা রবীন্দ্রনাথকে বারম্বার অদম্য কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই জন্যেই আমরা অনুরূপা দেবীর ফিল্‌ম্‌ সাফল্য সত্ত্বেও মোটামুটি শরৎচন্দ্রের চৈতন্যসঞ্চারের চেষ্টায় অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের বোধন প্রয়াসে কৃতজ্ঞ হতুম। কারণ রাস্তায় যখন চলতে হবেই, তখন সঙ্গী যদি পথের আভাস না দিয়ে ভূতেরা কি রকম পিছু হেঁটে বা শূন্যে লাফিয়েই চলে, সে বিষয়ে খুব বাস্তবপন্থী বর্ণনাও দেন, তো তাতে লাভ কি?

ধূর্জটিবাবুও এই জন্যেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। বিভূতিভূষণ হয়তো সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁর 'পথের পাঁচালী'-তে, কিন্তু সে পথ প্রায় প্রাক্‌পুরাণিক এবং তিনি এই প্রাক্‌পুরাণিক জগতের সঙ্গে বর্তমান জগতের দ্বন্দ্বে তাঁর অপুকে ট্রাজিক্‌ হিরো বলেও ভাবতে পারেন নি, সে অপরাজিত মাত্র, কোন দ্বন্দ্বে যে, সেটা মনে হয় গ্রন্থকারও জানা দরকার মনে করেন না। ধূর্জটিবাবু হয়তো এখনো সিদ্ধিলাভ করেন্‌ নি তাঁর সাধনায়, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি জীবনধর্মী। তাই বাংলা সাহিত্যের দুরবস্থায় যথেষ্ট লাভ, বিশেষতঃ যখন দেখি প্রেমেন্দ্র বা বুদ্ধদেবের মতো দক্ষ লেখকেরা বারবার আশান্বিত করেও শেষ পর্যন্ত প্রায়ই আশাভঙ্গ করেছেন।

ধূর্জটিবাবুর 'অন্তঃশীলা' ও 'আবর্ত' দুই উপন্যাসেই বা এক উপন্যাসের দুইভাগেই তাই দেখি যে, মানুষগুলি সমাজের যে অংশে মনন ভবিষ্যৎঘেঁষা, সেই পাড়ার বাসিন্দা। এবং তাদের নিয়ে যে জগৎ বা অবস্থান, সে বিষয়ে লেখক শুধু সজাগ নয়, সেই পরিস্থিতির উপরেই তাঁর আশা ভরসা বোধহয় জমে উঠছে। তাই তাঁর পাত্রচরিত্র সম্বন্ধে যাঁরা প্রাণহীন বা যাথার্থ্যহীন বলে আপত্তি করেন, তাঁদের কাছে এই বক্তব্য—

But this conclusion is reached without any direct examination of character as an illusion or as a symbol at all, for 'character' is merely the term by which the reader alludes to an author's verbal arrangements. Unfortunately, that image once composed, it can be criticized from many irrelevant angles—its moral, political, social, or religious significance considered, all as though it possessed actual objectivity, were a figure of the inferior realm of life. And because the annual cataract of serious fiction is as full of 'life-like' little figures of such, and no more, significance as drinking water is of infusoria... the meagre stream of genuine literature, being burdened with 'the forms of things unknown,' is anxiously traced to its hypothetical source—a veritable psychologico-biographical bog.

কারণ পাত্রপাত্রীচরিত্র উপন্যাসে আসলে একটা স্বসমুত্থ বা ইমার্জেন্ট ব্যাপার। লেখকের পুরুষার্থ ও তাৎপর্যার্থের আবশ্যিকতায় যে ছন্দ সমগ্র রচনার অস্থিমজ্জায় ছড়িয়ে পড়ে, সেই ছন্দের নির্দেশে, ভাষা ব্যবহারে, প্লটগতিতে, গল্পের বিকাশেই পাত্রপাত্রীর আবির্ভাব। শুধু চরিত্রই যদি উপন্যাসের উৎস হত, তাহলে টলস্টয়ের সমর ও শান্তি, হোমারের ওডিসি, বা রবীন্দ্রনাথের গোরা, এমনকি প্রুস্তের অতীতের অন্বেষণে-র মতো ব্যক্তিমনসর্বস্ব উপন্যাসেও কার্যকারণ নির্ণয় করা যেত না। সুখের বিষয় ধূর্জটিবাবুও পুরুষার্থ যে তাৎপর্যাথেই অস্তিত্ব পায়, এ-কথা বোঝেন। আর এ-কথাও স্বীকার্য যে তাঁর অন্তত দু'একটি পাত্র তাঁদের বিশেষ অবস্থানে থেকেই প্রাণৈশ্বর্যে প্রায় স্বয়ম্ভর। খগেনবাবু আজ খগেনবাবুর শত্রুদের কাছেও মূর্ত। সুজনও খানিকটা—যদিচ সুজন 'অন্তঃশীলা'য় সামান্য দুচার কথায় যে যাথার্থ্য পায়, 'আবর্ত'তে বহু বাক্যব্যয়েও তার বিপরীত দেখে আশ্চর্য লাগে। 'অন্তঃশীলা'য় ধূর্জটিবাবু আত্মনেপদের আভ্যাসিক আশ্রয়ে অর্থ-নিশ্চিত অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও যে তিনি 'আবর্ত'তে বহিরাশ্রয়ী তীর্থযাত্রা করেছেন, সে জন্যে তাঁর শিল্পশ্রদ্ধা ও সাধনার নিষ্কামতা বিস্ময়কর। কিন্তু প্রথমভাগে যার সামান্য আভাস আছে দ্বিতীয় ভাগে সেই আভাস তাঁর উপন্যাসের ক্ষতি করে লেখকের সাহসী উদ্দেশ্যকেই প্রকাশ করে দেয়। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের কতটুকু সহায়তা তিনি পেয়েছেন, তা দেখলে তাঁর কীর্তিই শুধু বিবেচ্য হয়ে পড়ে, ত্রুটি নয়।

আর বিশেষ করে সে ত্রুটি যদি নেহাৎ শিল্পত্রুটি না হয়, যদি লেখকের ব্যক্তিস্বরূপের বিশেষত্বই হয়, তাহলে সে বিষয়ে হাহুতাশ করা নির্বোধ পাঠকের অকৃতজ্ঞতামাত্র। রমলাদেবীর চরিত্র যদি পটভূমি না পেয়ে থাকে বা সুজনের জীবিকা ও জীবনযাত্রার চৈতন্য লেখক যদি পাঠকগোচর না করে থাকেন, তো সেটা তাঁর হাতের বাইরেই ধরতে হবে। হয়তো ধূর্জটিবাবুর জগচ্চিত্র এখনও অস্পষ্ট, হয়তো তিনি পুরুষার্থ সম্বন্ধে অনিশ্চিত। হয়তো তাই আবশ্যিক ছন্দ তাঁর মধ্যে-মধ্যে কেন্দ্রচ্যুত হয়, পাত্রপাত্রী আশ্চর্য ঘটনা-

বিন্যাস সত্ত্বেও সব সময়ে ঠিক বোঝা যায় না। এবং তাঁর কাটা-কাটা বাক্যবিন্যাস যা অনেকের মধুরাভ্যস্ত কানে খারাপ লাগে কিন্তু যা তাঁর ছন্দের পুরুষার্থের অনন্যগতি, তাও ঘুলিয়ে ওঠে। এবং এমন সব উপমা আসে, যেগুলি সংস্কৃত-রীতির সংকেতিতমার্গে হয়তো আশ্চর্য দক্ষ, কিন্তু ধূর্জটিবাবুর সক্রিয়, আধুনিক ভাষায় খাপছাড়াই মনে হয়।

মনে হয় এ সমস্তই আসলে ধূর্জটিবাবুর মধ্যে একটা রুচিবাগীশ নীতি-পরায়ণ উত্তরাধিকারের জন্যেই ঘটে। নীরক্ত ও বিলম্বিত ভিক্টোরিয়ান্ অলডাস্ হাক্স্‌লির মতো ধূর্জটিবাবু ট্রাজিক্ ও স্যাটিরিকের দ্বিধায় অনিশ্চিত। প্রবল প্রেম বা প্রচণ্ড ঘৃণা কিছুই তাঁর উপন্যাসের মানুষেরা তাঁর কাছে যেন পায় না। তিনি যেন মনে হয় প্রায়ই ক্লান্ত, বিমুখ। এবং লেখক তাঁর জগৎ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ বা বোর্‌ড্ হবার আভাস দিলে, সে জগতের বাসিন্দারাও প্রায় শুধু বিতৃষ্ণ নয়, বিতৃষ্ণাকর হবার সম্ভাবনাও এসে পড়ে।

কিন্তু 'আবর্ত' তৃতীয়ভাগের অপেক্ষা রাখে। হয়তো সে ভাগ বেরোলে সবশুদ্ধ জড়িয়ে ধরলে এসব আপত্তিই অবান্তর হবে। সেই আমাদের আশা এবং সে আশা লেখকেরই ইতিমধ্যের সাফল্যে প্রণোদিত।

১৬

বাংলা গদ্যকবিতা

চিরাচরিত কাব্যে অভ্যস্ত আমাদের পক্ষে নতুন কোনো কাব্যরূপ ভাবনার বিষয় হয়ে ওঠে। শ্রেণীবিভাগের সহজ চেষ্টায় তখন কাব্যপাঠ হয়ে ওঠে বিড়ম্বনা। বিশেষ করে বাংলা গদ্য কবিতার প্রথম সাক্ষাতে। কারণ ইংরেজি গদ্য আর পদ্যের চেয়েও বাংলা গদ্য আর পদ্যের মধ্যে বিরোধ বেশি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ এবং আমাদের প্রাত্যহিক আলাপ তুলনা করলে এই লজ্জাকর সত্য বুঝি। অথচ গদ্য ও পদ্য শত্রু নয়, সে কথা বুঝতে সংস্কৃত অলঙ্কার বা এরিস্টটলের কাছে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। এবং গদ্য ও পদ্যের এই আপাতবৈষম্য দূর করতে যিনি পুরোধা, সে মহাকবির কাছে কৃতজ্ঞ থাকাই আমাদের অভ্যাস।

সাধারণ জীবনে যদি সাহিত্যের ভিত্তি গাঁথতে হয়, তাহলে যে, বাংলা কবিতার নিতান্তই কবিজনোচিত ও উন্মার্গ সৌখীন চাল পরিত্যাজ্য, সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এবং যতদিন না গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা বাংলা কবিতায় হচ্ছে, ততদিন সামাজিক জীবনের অলিগলিতে বাংলা কবিতার যাতায়াত রুদ্ধ। আর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রায়ই উদাসীন, কবিতার পাঁচিল তিনিও ভাঙেন না, দরকার মতো শুধু গদ্যকে চমৎকার কাব্যমণ্ডিত করে পাংক্তেয় করেন। কিন্তু কায়স্থরা পৈতা ধরলেই কি সমাজসংস্কার শেষ? বিকালে এলবার্ট হলে বক্তৃতা দিয়ে বা চাঁদা দিয়ে ফ্রি-রীডিংরুম করে, সন্ধ্যায় ড্রয়িংরুমে নাগরজীবন যাপন করার মতোই এ সংস্কার লিবারল মাত্র। রবীন্দ্রনাথের আগেকার নানা গদ্য লেখায়, অবনী ঠাকুরে, এমনকি রমেশ দত্তের জীবন-সন্ধ্যায়, স্বভাবতই এই গদ্যচর্চা ঘটেছে। তফাৎ শুধু এই হয়তো যে সেকালে বড়ো-বড়ো গদ্যরচনায় এই রঙীন অংশগুলি অংশমাত্র, আর একালে এগুলি সর্বস্ব করে লিখলে ও লাইন ভাগ করে ছাপলে তাদের নাম দেওয়া হয় গদ্যকবিতা।

একান্ত সুখের বিষয়, সমর সেনের কবিতায় সংস্কারের অন্যদিকে সম্ভাবনা আছে। তিনি ফর্মের দিক থেকে, আমাদের দুর্ভাগ্যত, কবিতা থেকে গদ্যে, গদ্য থেকে কবিতায় না গেলেও তাঁর ভাষাব্যবহার কবিতারই, গদ্যের নয়। ভাষা তাঁর অবশ্যই গদ্য ব্যাকরণের, কিন্তু তার প্রয়োগরীতি কবিতার মতো ঐন্দ্রজালিক, গদ্যের মতো বিতর্কবাহক নয়। প্রত্যয়প্রতিজ্ঞায় তাঁর মন চলে না, তাই তাঁর গদ্য কাব্যালঙ্কারে মণ্ডিত হয়ে নিজেকে ও পাঠককে স্তম্ভিত করে না; তাঁর কবিতার আধার স্বকীয় জগৎ বানিয়ে প্রজ্ঞাপথে এসে সাক্ষাতে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বিষয়-বিষয়ীর সম্পূর্ণ সাযুজ্য তাঁর কবিতায় ঘটে, ফলে হয়তো ক্রোচের মতেই,

কবিতা আর তার ভাষায় আলঙ্কারিক বুদ্ধির স্থান থাকে না। থাকে থাকে গদ্যপন্থী নির্বাহকাব্যে বাক্যবহুল তাই সমর সেনকে হতে হয় না, নাটকের পাত্রপাত্রীর মর্মোক্তির মতোই তাঁর কবিতা আমাদের সামনে একেবারে আবির্ভূত হয়। এই হিসাবেই পাউন্ড-এর গদ্যকবিতা কবিতাপন্থী আর হুইট্‌ম্যানের কবিতা গদ্যপন্থী বলতে হয়। সমর সেনের যে সব কবিতায় বিষয়মাহাত্ম্য নেই, সেরকম একটি কবিতারই সঙ্গে, ধরা যাক 'পুনশ্চ'-র কোনো কবিতা, যথা কোপাই নামে কবিতার তুলনা করলে কথাটা স্পষ্ট হবে।

ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি।
বাতাসে ফুলের গন্ধ;
বাতাসে ফুলের গন্ধ
আর কিসের হাহাকার।
ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি
নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার।

ঘনায়মান অন্ধকারে
করুণ আর্তনাদে আমাকে সহসা অতিক্রম করল
দীর্ঘ দ্রুত যান—
বিদ্যুতের মতো :
কঠিন আর ভারি চাকা, আর মুখর—
অন্ধকারের মতো ভারি।
বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে দেখি;
দেখি আর শুনি
গন্ধস্নিগ্ধ হাওয়ায় কিসের হাহাকার :—
অন্ধকার ধূসর, সাপের মতো মসৃণ,
দীর্ঘ লৌহরেখার সহসা শিহরণ—
আর অস্ফুট শীর্ণ বহুদূরে কিসের আর্তনাদ
কঠোর কঠিন।
বাতাসে ফুলের গন্ধ
আর কিসের হাহাকার।

এ-কবিতাতে বিষয় মহৎ কিছু নয় এবং আবেগতাপও প্রবল নয়। সেই কারণেই এর কাব্যগুণ স্পষ্ট। আর এ-কথা বোঝা যায় যে সমর সেনের কাব্য-লোকের জলবায়ুও একান্তই কবিতার, রবীন্দ্রনাথের কবিতাগানের। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো কবিতার নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা ও গান এবং লিপিকা, শরৎ, আষাঢ় ইত্যাদি নানা লেখার মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত সমাজব্যাপী যে বর্তমান আবহ, সেই জলবায়ুই তাঁর সার্থক পটভূমি। সমর সেনের কবিতা যে-কোনো লোকোত্তর শূন্যের জীব নয়, সেইটেই তাঁর কীর্তির সূচনা। তাই

তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রগানলালিত ক্লান্ত করুণ বিষাদ শালমহুয়া-বনে, কৃষ্ণচূড়ার ডালে-ডালে, চাঁদের পাণ্ডুর আলোয়, পাহাড়ের দূর নীলে, শহরের এলোমেলো গলিতে, দূর দিগন্তে স্থিতি পায়। আর সে স্থিতি স্বকীয় ভারসাম্য পায় কবির নিজের প্রথম যৌবনের স্বাভাবিক দেহবিতৃষ্ণা আর ফিলিস্টাইন শরীর-সর্বস্বতার দ্বন্দ্বে আতুর ক্লান্ত আবেশে এবং সমাজ-জীবনের মর্মান্তিক ব্যর্থতাবোধে। এই ব্যর্থতাবোধের সম্ভাবনার জন্যই সমর সেনের বর্তমানে ক্ষান্ত না হয়ে পাঠকেরা তাঁর ভবিষ্যতে আশান্বিত।

ব্যক্তিস্বরূপের কি কৈবল্য থাকলে প্রথম যৌবনের আবেশকে জগচ্চিত্র না ভেবে সেই রোমান্টিকমন্যমাত্র ভাবকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তা হঠাৎ কল্পনা করা শক্ত। কিন্তু যখন এদিকে মোহিতলাল বা ওদিকে জীবনানন্দ দাশের মতো দক্ষ কবিকে এই সঙ্গতির অভাবে পীড়িত দেখি, তখন এই নবীন কবিকে প্রশংসা করতেই হয়। এবং এতই সৎ এই কবির ব্যক্তিস্বরূপ যে তাঁর মধ্যে এই শ্রেণীবিরোধের ব্যথা গোপনই আছে—কারণ তাঁর নিজের কবিপরিণতি, আর বাংলা কাব্যের বিকাশে এ-ব্যথা এখন শিকড়ই গাঁথতে পারে, স্বভাবত বনস্পতি হয়ে উঠতে পারে না। অথচ এই বিষয়ে আত্মবঞ্চনার লোভ সমর সেনের মতো সজাগ কবির কাছে যে বেগে আসতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

তাই সমরের বিষাদ যৌবনোচিত বাসনা ও ক্লান্তির নেতিতেই উৎস খোঁজে। ফলে অন্যমনস্কের কাছে কয়েকটি কবিতা একঘেয়ে লাগতে পারে। তার যথার্থ কারণও আছে। যথারীতি পদ্য এবং সংস্কৃতজ গদ্যের গম্ভীর তালমানবিলম্বিত ছন্দের সফল প্রয়োগে যে বৈচিত্র্য ও প্রচণ্ড জোর পাওয়া যায়, তা সমর সেন অবহেলা করেছেন। তাঁর নেতিবাচক ছন্দ আর ভবিষ্যতের প্রবলসম্ভাব্যঞ্জক ছন্দ একই রেশে বাজে। কয়েকটি কবিতায় তিনি ভিন্নপ্রয়োগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু ১৯০০, বসন্তের গান, একটি প্রেমের কবিতা, সিনেমায়, মেঘদূত ইত্যাদি কি এদিক থেকে অন্যথা নয়? অবশ্য শিথিলসমাধি সব লেখকেরই হয়। আর গদ্যকবিতায় মুশকিল হচ্ছে যে এখানে কোনো অধিদৈবত প্রমাণ বা প্রতিমাণ নেই, এমনকি কোনো কবিনিরপেক্ষ সংকেতিত মার্গও নেই। তাই কবির আবেগ এবং পাঠক এখানে মুখোমুখি বলে কান সময়ে-সময়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিপদে পড়ে। এবং সমর সেন যখন কাব্যের এই আর্কিটাইপ্যাল প্যাটার্ন বা কৈলাস-ভাবনাহীন ক্ষুরধার পথই নিয়েছেন, তখন তাঁর আরো সাবধান হওয়া উচিত। প্রথম কবিতাতেই তিনি লাইনভাগে অনবহিত হয়েছেন। সে ত্রুটি আমোর স্ট্যান্ডস আপন্ ইউ-তেও দ্রষ্টব্য। নাগরিক নামে উৎকৃষ্ট কবিতাতে তাই ৪২ লাইনে যে হুঁচট্ খেতে হয় তা কোনো নাটকীয় কারণে নয়। ২৫ পৃষ্ঠার মুক্তি-তে ডাস্টবিনের সামনে মরা না হয়ে মরে যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায় সময় এখানে কাটে। মৃত্যু, পোস্টগ্রাজুয়েটেও ছন্দ ঢিলে হয়ে গেছে এক-আধবার। অবশ্য গদ্য কবিতার ছন্দের বাঁধুনিতেই এ অনিশ্চয়তা। আবেগেই শুধু এ-ছন্দের বেগ নির্দিষ্ট করে এবং দুই ব্যক্তির আবেগের মাত্রা এক চালে না-ও চলতে পারে। যথারীতি পদ্যে এক-এক শ্লোকের বা যমকের বাঁধনে ছন্দ দানা বাঁধে, কিন্তু গদ্যকবিতার ছন্দের দম সম্পূর্ণতা পায় সমগ্র বক্তব্যের এক-এক পর্যায়ে—স্ট্রোফিক্ ইউনিট-এ। সমর সেন নিশ্চয়ই স্ট্রোফিক্ সম্পূর্ণতা পেয়েছেন কয়েকটি দিন কবিতার নিপুণ এই শেষ পর্যায়ে :

মড়কের কলরোল, নতুন শিশুর কান্না,
চিরকাল বেলাভূমির সমুদ্রের শেষহীন সঙ্গম!
অতীতের শবসম্ভোগী মন
কালের স্থবিরযাত্রায় স্থির অশান্তি আনে।
আজ দুঃস্বপ্নে দেখি,
বৃদ্ধ শিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের দল
স্খলিত দাঁতের ফাঁকে কাঁদে আর হাসে
ট্রামে আর বাসে;
দূরে পশ্চিমে
বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী।

কিন্তু আমার গলায় স্বভাবতই এর শেষ লাইনে চমক লাগে এবং পড়তে ইচ্ছা করে—স্তব্ধ মহানদী। দু-একবার বোধহয় শব্দ বা কথা সম্বন্ধেও কবির অসতর্ক ভাব দেখা যায়—লাইনের শেষে ক্রিয়া কঠিন বা বর্ণান্তক শব্দে, হতে শব্দটার সর্বদা ব্যবহারেও হয়তো, এবং বিশেষণের দুর্বলতায়, যথা চমৎকার কবিতা এই মদনভস্মের প্রার্থনায়—

মাস্তুলের দীর্ঘরেখা দিগন্তে,
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ন নাবিকের গান।

এ-রকম জায়গায় মালার্মে বা বদলেয়র কি 'অদ্ভুত' বলে স্থির থাকতেন? সমর সেনের কবিতাতে এগুলি চোখে পড়ে, তিনি তো গদ্যকবিতায় লরেন্স-মার্গী নন, তিনি পাউন্ড-পন্থী। ব্যুৎপত্তি বা ব্যাকরণার্থে তাঁর ছন্দ বা ভাষা-প্রয়োগ তো ঢিলে হবার কথা নয়, কারণ কবিতার উপযুক্ত তাঁর ভাষাব্যবহার ব্যঞ্জনায়, রূঢ়ার্থে গভীর, সমগ্র কাব্যের তাৎপর্যার্থে অখণ্ড।

কিন্তু ছিদ্রান্বেষীকেও থামতে হয়, এত সার্থক তাঁর অধিকাংশ রচনার আত্মস্থ শিল্পসৌন্দর্য। আর এ-কবির মনই শুধু বৃহত্তর পারিপার্শ্বিক সমাজ সম্বন্ধে উগ্র নয়, দৃষ্টিও প্রখর। বিস্মৃতি কবিতাতে এর ব্যতিক্রম হয়তো কেউ পাবেন, কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞা রসঘন উপমাউপচারে অন্বিত। রাত্রি বা বিরহ নামে কবিতাগুলি প্রায় জাপানী কবিতার মতো সরল স্পষ্ট ব্যঞ্জনায় গভীর, তাই রক্তকরবী, মহুয়ার দেশ ইত্যাদিতে উপমাউপচারের জটিলতার সহজ সাহস ও ব্যঞ্জনাঢ্যতা বিস্ময়কর লাগে। এবং এগুলি কবির গভীর চৈতন্যের মননজীব বলেই দেখি এই উপমাউপচারাদি এলিঅটের মতো মধ্যে-মধ্যে হয়ে ওঠে সিম্‌বল্‌ বা পরোক্ষপ্রতীক, যার লীলা বিশ্বজনীন। সেই জন্যেই একটু বিড়ম্বিত হতে হয় যখন একই প্রতীক কখনো পরোক্ষদীপ্ত হয়ে ওঠে আর কখনো প্রত্যক্ষেই লুপ্ত হয়।

তবু যে গদ্যছন্দসত্ত্বেও ঝড়ের নিঃশব্দ এই নাগরিক কবিকে আশা দিয়েছে, সেই আমাদের আশা। তাঁর সম্পদ তাঁর মননে, যার সাহায্যে তাঁর আত্মজ্ঞান ব্যঙ্গে হয়ে ওঠে নবসম্ভাবনায় চঞ্চল—শেষ কবিতা একটি বেকার প্রেমিক-এ—

চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি
সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি
মাঝে মাঝে ক্লান্তভাবে কি যেন ভাবি—
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি
আর শহরের রাস্তায় কখনো প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি—
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।
কলকাতার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙ্গে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

হাল্‌কা কবিতা

কোনো-কোনো যুগে সাহিত্য উচ্ছল হয়ে ওঠে প্রাচুর্যে, কোনো যুগে বা হয় ক্ষীণকায়। বিষয়বস্তু বা লিখনরীতি সব যুগে একরকম হয় না, কখনো কাব্য হয় অনায়াস, কখনো বা দুর্বোধ্য কঠিন। অডেনের মতে এ-সবের কারণ খুঁজতে হবে কবিদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ছেড়ে অন্যত্র।

কারণ কালাতীত কারয়িত্রীপ্রতিভাই শুধু সর্বযুগের কবিদের সাধারণ সম্পদ। ভাষামার্গ, কথ্য ও লেখ্যভাষার প্রতি পক্ষপাত, প্রত্যক্ষপ্রয়োগ, শ্রোতাদের গুণাগুণ ইত্যাদি সবই পরিবর্তনশীল রুচির গতিবিধি। কবির মুক্তি অবশ্য সত্যভাষণেই, বন্ধুবান্ধবকে আনন্দদানেই। কিন্তু সে সত্যের রূপ আর সে বন্ধুদের কুলশীলনির্ণয়ের ভার সমাজের এবং অংশত হয়তো কবির জীবন-যাত্রার উপরে। যখন কবির প্রত্যক্ষপ্রজ্ঞার জগৎ সমাজচৈতন্যের অখণ্ডতায় মোটামুটি পাঠকের জগতে সাযুজ্য লাভ করে, তখন কবি বহুর এক হয়, তার ভাষা হয় সরল, মুখের ভাষার পাশ ঘেঁষা, রুচির প্রগতি হয় বাঁধাসাধা। ছিন্নভিন্ন সমাজে কবি হয়ে ওঠে কবিবিশেষ, তার ভাষা হয় বিশেষজ্ঞের, তাকে অস্থির হয়ে বেড়াতে হয় চৌষট্টি সতীতীর্থে। অডেনের মতে প্রথম অবস্থায় লাইট্ বা অনায়াস বা লঘু কবিতার সম্ভাবনা। এই কাব্যশরীরে অনায়াস কবিতা মর্মে-মর্মে জীবনবেদে গভীর হতে পারে। লঘু কবিতা বলতে অনেকে যে ভাঁড়ামি বা ইয়ারকি বা সামাজিক পদ্য বোঝেন, তার কারণ রোমান্টিক উজ্জীবনের পরে সমাজবিপ্লবের ফলে কবি ও পাঠক এতই বিচ্ছিন্ন যে কবিদের গম্ভীর আত্মস্থতা থেকে ছুটি নিলে শুধু এই খেলো হাসিতে, নাগরিক আলাপের মৌখিকতায় বা ঠুনকো ব্যঙ্গেই নামতে হত।

কিন্তু চিরকাল এমনি ছিল না। এলিজাবিথান্ যুগ পর্যন্ত প্রায় সব কবিতাই অনায়াস ছিল। ধর্মের ঐক্যে, জগচ্চিত্রের একতায়, জীবনযাত্রার রীতি-পরিবর্তন যতদিন ক্রমিক মন্থর ছিল, ততদিন কবি-পাঠক ছিল সমগোত্র। ইলিজাবেথের সময় থেকে নটরাজের পদক্ষেপ হল দ্রুত এবং সম্ভব হল শেক্স-পিঅরের কিছু-কিছু, এবং ডন্, মিলট্‌ন্ প্রভৃতির কঠিন কাব্য। দুর্বোধ্যতা সর্বদাই নিন্দনীয় নয়। কারণ লঘিমাসিদ্ধি যতই লোভনীয় হোক, একথাও সত্য যে, সমাজচৈতন্যের একতার জন্যই লঘু কাব্য ক্রমে হয়ে দাঁড়ায় মামুলি। রক্ষণশীল সমাজের আত্মপ্রীতির আওতায় সংকেতিত বা অভ্যাসিক। স্থাপন-কালে গতানুগতিক রুতার্থে কবি তখন চিরকালের মানবিক পুরুষার্থকে দেয় বিসর্জন। তাই সমাজ যতই অস্থির হয়, কবি ততই সমাজ থেকে দূরে ছিটকে

পড়ে, তার দৃষ্টি ততই স্বচ্ছ হয়। কিন্তু সেই পরিমাণেই তার প্রকাশ হয় দুরূহ। কদাচিৎ এমন যুগও থাকে যখন এই দুয়ের দোটানায় একটা প্রচন্ড ভারসাম্য আসে এবং এলিজাবিথান্ যুগের এই সৌভাগ্য হয়েছিল এবং হয়তো আজকাল সেরকম যুগের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

সপ্তদশ শতকে দেখি ধর্মের মতো কাব্যেও উৎকেন্দ্রিক লীলা চলছে। স্পেন্‌সর্‌কে বাদ দিলে মিল্‌টকেই বলা যায় প্রথম আত্মসর্বস্ব উন্মার্গ কবি। এই ছন্নছাড়া ভাব হর্বার্ট, ক্র্যাশ প্রভৃতির কাব্যে, ব্রাউনের গদ্যেও দ্রষ্টব্য। এক মার্ভেলেই কিছু এবং হেরিকেই ঐতিহ্যের প্রভাব বর্তমান।

রেস্টোরেশনে আবার সমাজ দানা বাঁধল—যদিচ শুধু সমাজের উপরতলায়, উজ্জীবিতরাজ্যের আশেপাশে। কবির মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। ড্রাইডেন্ এবং পোপ্ তাই অবলীলায় কবিতা লিখলেন। সীমাবদ্ধ তাঁদের কবিতা, তাঁদের পাঠকসমাজের মতোই। কিন্তু সেই গন্ডির ভিতরে তাঁদের বিচরণ কমবেশি স্থিতধী, স্বচ্ছন্দ।

তারপরে রোমান্টিকদের পালা—যান্ত্রিক বিপ্লবে ছত্রভঙ্গ, অস্থির। গ্রাম হল গৌণ, সমাজ হল শহুরে, বিবাহে সম্পর্ক স্থাপন না করলে বা কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী না হলে মানুষে মানুষে সম্বন্ধ রাখা দুরূহ হয়ে উঠল। শ্রেণীবিভাগ হয়ে উঠল বহুধা আর আরো ধারালো। চাকুরিয়া বা জমিদারদের দায়িত্ব ঘাড়ে না পেতেই হল এত নতুন শ্রেণী—ডিভিডেন্ডজীবীর দল। যেন জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা বা লালগোলা বা শোভাবাজারে আর কবিদের আসন পড়ল না, পাঠক হয়ে দাঁড়াল অপরিচিত মিশ্র এক জনসাধারণ নামে নির্বিশেষ প্রত্যাহার। লিরিকল্ ব্যালাড্‌সের প্রস্তাবে এর আলোচনা পঠিতব্য। ফলে কবিরা সমাজের দেয়ালে মাথা ঠোকা ছেড়ে মন দিলে আত্মচর্চায়, অথর্ববেদ ছেড়ে বেদান্তে। ফলে ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ পোপের চেয়েও শৌখীনমার্গে লিখলেন তাঁর স্তবগুলি, আত্মজীবনীর নাম দিলেন—এক কবির মনের বিকাশ। রোমান্টিকেরা সবাই ছুটলেন ঘরকে করতে বাহির, কেউ নিসর্গে, কেউ স্বর্ণভবিষ্যতে, কেউ অতীতের মায়াকাননে, কেউবা নিরালম্ব কাব্যের সাত্বিক তপোবনে।

কবির কাজের চেহারাও গেল বদলে, কবিতা হল গৌণকথকের অরণ্যে-রোদন। ব্যক্তিগত জগতে কিছুকাল চলল ঘোরা-ফেরা, আবিষ্কার ও আত্মজ্ঞানের সীমা এসে মিশল মনোবিশ্লেষণে। নব্যসমাজতন্ত্রের বামাচারীই আজ ভরসা। কারণ ডিভিডেন্ডজীবীদের ভবিষ্যৎও আজ শ্রমিকদের উদ্যত বাহুতে নির্দিষ্ট।

কিন্তু এর মধ্যেও লঘুকাব্য জন্মেছে। চাষাসমাজের বর্নস্ আর বনেদি বায়রন্ দুজনেই স্কচ্। কিন্তু বর্নসের সমাজে চলতি ছিল বহু একতার ধারা—ধর্মে, লোকাচারে, লোকসঙ্গীতে। ফলে বর্নসের বিহার ব্যাপক, কান্নাহাসির জগৎ তাঁর প্রত্যক্ষ ও কৈবল্যে অভিন্ন। কিন্তু বায়রনকে হয় শুধুই গর্জন বা মজা করতে। কাব্যের অন্তরঙ্গ গাম্ভীর্য বা কবিত্ব তাঁর নেই কারণ স্মার্ট সমাজে সে বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তাই প্রীডও প্রাঅরের চেয়ে অসার।

তারপরে উনিশশতকে দেখা যায় গ্রামসম্পর্ক ছিঁড়ে যাওয়ায় জ্ঞাতিকুটুম্ব-হীন ব্যক্তিদের একমাত্র নিরাপদ ও প্রকাশ্য সম্বন্ধ দাঁড়ায় পিতামাতা ও শিশুর সম্বন্ধ। সেই ভিত্তিতে গড়ে উঠল শিশুসাহিত্য ও নন্‌সেন্স-কাব্য। অবশ্য লোকসাহিত্য চিরকালই রয়েছে, কিন্তু সমাজের ঘুণ তাতেও ধরেছে। তাই

সেকালে যে ট্রাজিক্ মাহাত্ম্য বর্ডর্-ব্যালাডেও পাওয়া যেত, তা একালের গানঘরের পালাগানে দুর্লভ। তাই এখন মনঃসম্পন্ন অনায়াস কাব্য লিখতে গেলে গা ভাসাতে হয় কোনো প্রবল শ্রেণীস্বার্থের নির্দিষ্ট স্রোতে। কিপলিং মধ্যবিত্তের সাম্রাজ্যবাদে ডুবে তাই করেছিলেন। এবং বেলক্ ও চেস্টরটন্ রোমান্ ক্যাথলিক্।

আজকে তাই কবিকেও নিজের গরজে ভাবতে হয় ভাবী সমাজের প্রয়োজন, যেখানে অন্যায় সুযোগের পক্ষপাতে জাত ভেদবুদ্ধি থাকবে না। সচেষ্ট চৈতন্যেই তার সম্ভাবনা, নচেৎ আজকে তার অধঃপতন। সেই সমাজের একতা-নির্দিষ্ট স্বাধীনতাতেই সম্ভব বয়স্ক বুদ্ধিসম্পন্ন অথচ অনায়াসবোধ্য বা লঘু কাব্য। এবম্বিধ মুখবন্ধ যাঁদের অভিরুচি মতো নয়, তাঁদেরও কিন্তু চয়নিকাটি ভালো লাগবে তার বহুবিধ কবিতার সন্নিবেশে। অনেক কবিতা নতুনও লাগতে পারে—দি মেজরও মাইনর প্লেসর্স্ অব্ লাইফ্, দি উইক্ এন্ড, বুক, দি বুক অব্ লাইট্ ভর্স সত্ত্বেও। বইটি আরম্ভ দি সং অব্ লিউইস্ দিয়ে—

Richard, that thou be ever trichard,
tricchen thou shalt be nevermore.

সব শেষ করে স্কেলটন্—

By Saynt Mary, my lady,
Your mammy and your daddy
Brought forth a godely baby!

ডনবরের কবির লড়াই বা ফ্লাইটিং কবিতাটিও বর্তমান। মধ্যে অজস্র নামকরা, কম নামকরা কবির কবিতা ও বহু নামহীন কবিতা ও গান শেষ করে এসে পড়া যায় বেলক্ চেস্টরটন্ প্রভৃতিতে। সওয়া পাঁচশ পৃষ্ঠার চয়নিকার প্রতি সুবিচার উদ্ধৃতিতে সম্ভব নয়, যার বৈচিত্র্যের মধ্যে লিডেল এবং স্কটের গ্রীক অভিধান শেষ করার উপলক্ষে হার্ডির মজার কবিতা নির্বিবাদে খাপ খেয়ে যায় লিঅর্ বা ক্যারলের সঙ্গে বা অনামী কবির এই উপদেশের সঙ্গেও—

Then to each gay flighty wife may this a warning be,
Don't write to any other man or sit upon his knee;
When once you start like Mrs. Maybrick perhaps you
couldn't stop,
So stick close to your husband and keep clear of Berry's drop.

অথবা এডমন্ড্ ক্লেরিহিউ বেন্টলির :

What I like about Clive
Is that he is no longer alive,
There is a great deal to be said
For being dead.

১৮

এলিঅট

I sometimes wonder if that is what Krishna meant—
Among other things—or one way of putting the same thing:
That the future is a faded song, a Royal Rose or a lavender
spray
Of wistful regret for those who are not here to regret,
Pressed between yellow leaves of a book that has never
been opened.
And the way up is the way down, the way forward is the
way back.
You cannot face it steadily, but this thing is sure,
That time is no healer : the patient is no longer here.
—*The Dry Salvages*

উনিশ-কুড়ি বছরে যে কবি লিখতে পারেন শুচিবাইগ্রস্ত এলফ্রেড্ প্রুফ্রকের প্রেমগীতি বা এক মহিলার ছবির মতো পাকা কবিতা এবং যাঁর অদম্য পরিণতি শেষে বরন্‌ট্ নর্টন থেকে লিটল্ গিডিং অবধি বিশ শতকের সবচেয়ে সার্থক ইংরেজি কবিতার চতুরঙ্গে এসে দাঁড়ায়, তাঁর বিষয়ে ভাষান্তরে কিছু লেখা কঠিন। বিশেষ করে ভিন্নধর্মী আনকোরা ভাষায় এই কবিতার তীব্র সৌন্দর্য এবং এই কবির রসলোকের ক্ষুরধার যাত্রার আশ্চর্য সঙ্গতি ও সম্পূর্ণতার পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে ব্যর্থ চেষ্টা।

আমি শুধু এলিঅটের বিষয়ে বহু বক্তব্যের একটি বলতে চাই। এলিঅটের কাব্যে যে বেদনা, যে রোমান্টিক যন্ত্রণা—সেই ভাবাশ্রিত বিশেষত্বেই এলিঅট আমাদের এতো নাড়া দেন এবং সেই বেদনার আবেগেই তাঁর চিত্রকল্পগুলি প্রতীক হয়ে ওঠে। এলিঅটের প্রতিনিধি-মূল্যও এই কারণে এতো বেশি। এ যন্ত্রণার উৎস শেষ পর্যন্ত স্বভাবের গভীরে এক দ্বন্দ্বে, নানা সমষ্টিতে নয়—খাপছাড়া অনুষঙ্গে। এলিঅটের স্বকীয় রসায়নে আমাদের সমাজের এই বিচ্ছিন্নতা কাব্যরূপ পেয়েছে। তাই একালের কবিদের তাঁর কাছে ঋণস্বীকার করতে হয় বারবার। খণ্ডচৈতন্যের এমন একাগ্র উপলব্ধি ও এমন কাব্যসমৃদ্ধ রূপ এবং তার থেকে বর্ধমান

নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি কাব্যজগতে এলিঅটের দান। এ-দান ভুললে এলিঅটোত্তর কাব্যের মুক্তির উৎসও ভুলতে হয়।

অখণ্ড চৈতন্যের অভাবের জন্য এলিঅটের দায়িত্ব অনেকখানি নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ক্ষমতার বাইরে। আত্মসচেতন মানস স্বকীয় দ্বিধায় খণ্ডিত সমাজে দীর্ণ হতে বাধ্য, সততা যদি থাকে। এখানে এ দ্বিধার ইতিহাস বা কারণ নির্দেশ অবান্তর। এলিঅটের শেষ বয়সের কাব্যে চৈতন্যের সন্ততি বা বিস্তার ও একতার ভাববিলাসী প্রশ্ন উঠে কিভাবে কাব্যকে রঙিয়েছে, তাই সংক্ষেপে দেখা যাক।

প্রশ্নটির চঞ্চলতা, সুদূরের পিয়াসী আমাদের এই শেষ রোমান্টিককে প্রেরণা দিয়েছে ক্লাসিসিস্‌মের দিকে; হৃদয়বেদনা তাই খুঁজেছে গির্জার সমর্থন; সমাজ-বোধের অভাব আত্মগোপন করতে গেছে সামন্তবাদী রাজশক্তির কল্পনায়। লক্ষণগুলি নগণ্য নয়, কারণ এলিঅট শুধু আত্মসচেতন কবি নন, যদিচ সে কীর্তিও নির্বোধ আনাড়ী কাব্যতত্ত্বের প্রচলনের জগতে প্রচণ্ড সিদ্ধি। তার চেয়ে বড়ো কথা, এলিঅট হচ্ছেন আত্মসচেতনতারই মহাকবি। তাঁর কাব্যের মূল বিষয়ই হচ্ছে আত্মসচেতন মানস, তার নাট্যরূপ ভিন্ন কবিতায় ভিন্ন হলেও। ইংরেজি কাব্যে তার প্রয়াস এই প্রথম—ভালেরি ও রিল্‌কে-র কথা দুটো কারণে এখানে ওঠে না। প্রথমত তাঁরা বিদেশী; দ্বিতীয়ত, ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে, ভালেরি বা রিল্‌কের মধ্যে যন্ত্রণা এতো তীব্রতায় দানা বাঁধেনি বলেই হয়তো তাঁদের আত্মপ্রকাশ কবিত্বে প্রচ্ছন্ন। আত্মসচেতনতার সাহিত্যরূপ অবশ্য গদ্যে দেখা গেছে প্রুস্তে, জয়সে, কাফ্‌কায়, পাস্টের্‌নাকে খানিকটা ভার্জিনিয়া উল্‌ফে। ইংরেজি কাব্যে কিন্তু এলিঅট অতুলনীয়; তাঁর এই আপন সত্তার মুখোমুখি কাব্যযাত্রার অমাবস্যাই আমাদের মন বিচলিত করে। শিল্প-সাহিত্যের মানসে সামাজিক কারণে বা যে কারণে হোক পূর্বোক্ত দ্বন্দ্ব অর্থহীন, যদি না এই চৈতন্যের আত্মনির্ভরতা দেখা দেয়। শিল্প-সাহিত্যের বিষয়ী মনের পক্ষে দ্বন্দ্বের নিরাকরণে প্রয়োজন ঐ প্রাগাত্মচৈতন্য, অর্থনীতির মূল্যবান ছক নয়।

চৈতন্যের সন্ততি ও একতার প্রশ্নেই জড়িত কর্মজীবন, মানসিক সক্রিয়তার তাগিদ। এলিঅটের আত্মসচেতন ভারসাম্য পাবার বারম্বার চেষ্টাই আমার কথার প্রমাণ। ১৯১৭ সালেই এলিঅট বোঝেন আত্মসচেতনতার প্রকৃতি—তাঁর ভাষায়, প্যার্সনল্যাটি বা ব্যক্তিস্বরূপ এবং নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ। কারণ ব্যক্তিবাদের যুগে নৈর্ব্যক্তিকতার জানলার পথেই ব্যক্তিস্বরূপের মুক্তি। অতঃপর অল্পবয়সেই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ—ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা। পশ্চিম ইওরোপের ঐতিহ্য এলিঅট নিজে সংগ্রহ করছিলেন প্রচুর ও গভীর। দুর্ভাগ্যক্রমে তন্ময় পশ্চিম ইওরোপে এসে পড়ল গত মহাযুদ্ধ আর গত শান্তিপর্ব। নৈরাশ্যের পোড়োমাঠে এলিঅট দেখলেন নৈর্ব্যক্তিকতার আরো গভীরে শিকড়ের প্রয়োজন, এবং ভাবলেন তাঁর ঐতিহ্যবোধ তাঁর সহায় হবে ভাবদুর্গের মধ্যেই মৃত্তিকা সন্ধানে। এ সন্ধানের পরিণাম যে ধর্মধ্বজ হবে তাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে এই মনোভাব যে-হিসাবে এবং যতোখানি তাঁর কবিতার উপজীব্য জুগিয়েছে, সে-হিসাবে তা গোটেই নৈর্ব্যক্তিক নয়, ধ্রুপদীও নয়। নৈর্ব্যক্তিকতা বা ধ্রুপদী শান্তির নির্ভর সমাজ-ব্যাপী পুরাণে, যে পুরাণ মোটা একটা সমাজ-সংস্কৃতির একতায় ব্যক্তি-সাধারণকে আশ্রয় দেয়। পুরাণ যে ঐতিহ্য-জ্ঞানার্জনে তৈরি করা যায় না বা

পুরাণ যে কখনো ব্যক্তিগত সৃষ্টি হয় না, এ ভুল প্রাচীন রোমান্টিক কবিরা পণ্য-বিপ্লবের পরে তাঁদের উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের মর্যাদার অন্বেষণে করলেও, এলিঅট নিশ্চয় তা করেননি! অন্তত এলিঅটের পক্ষে তা করা মানায় না, শেলি বা ব্লেকের উপরে অতো কঠিন সমালোচনার পরে।

পুরাণের পটভূমির খোঁজে কালোপযোগী সামাজিক পরিবর্তনে ভীরুর গন্তব্য হয়ে পড়ে ফ্যাশিস্‌মের স্নায়ুবিকারে জোর করে তৈরি সাময়িক একতার ছক। পাউন্ডের মতো এলিঅট তাতে ঝোঁকেননি। তাঁর বিবেচনায় ইংরেজি গির্জার আশ্রয়ে ক্যাথলিক ঐতিহ্যের নিরাপদ দিব্যভাবের আবেদন বেশি। ব্লেক সম্বন্ধে এলিঅটের মন্তব্য ছিল : পুরাণাভাবে বাধ্য হয়ে এই সব কল্পনায় যদি ব্যক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টির প্রতি,—সাধারণ বুদ্ধির উপরে, বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিকতার উপরে,—শ্রদ্ধা থাকত, তাহলে ব্লেকের উপকারই হত। মন্তব্যটি এলিঅটের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

এলিঅটের যে ঐ ব্যক্তিনিরপেক্ষ শান্তদৃষ্টির উপরে লোভ আছে, সেটা স্পষ্ট। কিন্তু বিজ্ঞানে তিনি নিরুৎসাহ; বিজ্ঞান সব মানুষের মূল্য স্বীকারে আজ তৎপর বলেই কি? তিনি ফিরে চান ধর্মের মাল-মশলার ফর্দ; তাঁর যাদুঘর ঐতিহ্যের সামাজিক প্রাণ একদা ছিল বলেই সেই বিগত যুগের টুকিটাকিতে তিনি অশ্রুপাত করেন। ব্লেক্‌ এবং শেলির বেলাতে যেমন এলিঅটের ক্ষেত্রেও 'চিন্তা, আবেগ ও দৃষ্টির বিশৃঙ্খলা' শুধু কবির দায়িত্ব নয়, সেটা জড়িত 'কবির পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যেখানে কবির প্রয়োজন মেটেনি'। কবি হিসাবে এলিঅটও হয়তো 'এইসব কারণ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন'।

আমাদেরই মতো এলিঅট মানুষের ইতিহাসটা দেখতে গিয়ে থমকে গেছেন ক্যাপিট্যালিস্‌মের ব্যাপারটায়—তাঁর মতে যা 'অর্থনীতি ও যন্ত্রশিল্পে একটা খটকা মাত্র।' সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো এই খটকার ব্যাপারটার ফল হয়েছে জন্‌ ডিউঈ-র ভাষায়:

compartmentalisation of occupations and interests which brings about separation of that mode of activity commonly called "practise" from insight, of imagination from executive doing, of significant purpose from work, of emotion from thought and doing...Those who write the anatomy of experience then suppose that these divisions inhere in the very constitution of human nature.

তাই গীডিয়ন্‌ বলেছেন ভালো, যে গত শতাব্দীর দায়ভাগে মানুষের বিবিধ কর্মধারাও স্বতন্ত্র, প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের লেসে-ফেয়ার এন্ড লেসে-আলের মানসিক জীবনের কচঙ্গনে প্রযোজিত।

মানুষের চৈতন্যের এই খণ্ডতায় এলিঅটের যন্ত্রণা ডিউঈ-ভাষ্যের অনুবর্তী। তিনি একে মানবস্বভাবের চিরাচরিত পাপপুণ্যের জালে ফেলে ঈশ্বরের অখণ্ডতার দুরূহ সন্ধানে ব্যস্ত। অর্থনীতি ও যন্ত্রগুলোর ঐ সামান্য ব্যাপারটা সংশোধনের অনেক বেশি সহজসাধ্য সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা না করে তাই এলিঅট অসম্বদ্ধ মুহূর্তে শান্তি খোঁজেন, ফাঁকি দেন নিজেকে

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বরূপের মতবাদে। সে ব্যর্থ চেষ্টায় যন্ত্রণা বৃদ্ধিই পায় (যন্ত্রণা বৃদ্ধিতে অবশ্য কাব্যের আবেগ আরো তীব্র হয়ে ওঠে)।

সুবিধা হচ্ছে এ-ফাঁকিতে ফাঁপামানুষ ঠাসামানুষের কিছু দায়িত্ব থাকে না, কারণ মানুষের মন তো বহুধা হবেই। বহুকাল আগে তাঁর ঐতিহ্য-প্রবন্ধে (আমার বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তর স্বগত দ্রষ্টব্য) এলিঅট লেখেন :

The point of view which I am struggling to attack is perhaps related to the metaphysical theory of the substantial unity of the soul; for my meaning is, that the poet has, not a personality to express, but a particular medium, which is only a medium and not a personality.

মীডিয়ম্ বা শিল্পপদ্ধতিকে যে কি করে শিল্পী প্রকাশ দেবে সে প্রশ্ন না তুলে বলা যায় যে শিল্পী, প্রকাশ নয়, ব্যবহার করে তার শিল্পপদ্ধতি—মানস ও শিল্পবস্তুর জ্যাবদ্ধ সহযোগিতার ও বাধার মধ্যে দিয়ে। মনের একতা সমগ্রতাকে এলিঅট একাকার সংমিশ্রণ বলে ভুল করেন, সে প্রশ্নও এখানে তোলা নিষ্প্রয়োজন।

শুধু স্মরণীয় যে এই রোমাঞ্চসাধনা এলিঅটের ভাষা-ব্যবহারের মাত্রাতেও দ্রষ্টব্য। জনসনের পদাঙ্কে তিনি ন্যায়তই ধমক দিয়েছিলেন মিলটনের অপ্রাকৃত ভাষা-ব্যবহারকে। তিনি নিজে অবশ্য ভাষার ধর্ম বা প্রকৃতি অনুসারে শব্দ বাক্য ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। মিলটনের মতো অমিত্রাক্ষরের চৈনিক প্রাচীর তৈরি করার গুরুচণ্ডালী দোষ না থাকলেও কিন্তু কার্ল ফস্লের-এর অর্থে এলিঅটের ভাষাব্যবহারও খানিকটা অপ্রাকৃত। ধরা যাক, ঈস্ট কোকর্-এ সেই জাঁকালো ছত্র যেখানে এলিঅট সেকেলে ইংরেজিতে পূর্বপুরুষের কথা বলেন কিন্তু উহ্য থাকে সমরসেটশিয়রের গণ্ডগ্রামের বর্ণনা। সপ্তদশশতকে নাকি এলিঅটেরা ঐ গ্রাম ছেড়ে সাগরপারে যান। কিম্বা আগেকার কোনো একটি কবিতা ধরা যাক—বর্ব্যাঙ্ক উইথ্-এ বায়ডেকের দেড় পৃষ্ঠার কবিতাটি ঐতিহ্যের ভাঁড়ার বল্লেই হয়। শেক্সপিয়রের নানা রচনা থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখের সংখ্যা অন্তত নয় হবে, তাছাড়া গতিয়ে, সেন্ট্-অগস্টিন্, হেন্রি জেম্স্, ব্রাউনিং, রস্কিন্, ডন্, মার্সটন, ফোর্ড ও স্পেন্সর আছেন।

পেটার সম্বন্ধে এলিঅট লিখেছিলেন,

"...it represents, and Pater represents more positively that Coleridge of whom he wrote the words, 'that inexhaustible discontent, languor, and homesickness...the chords of which ring all through our modern literature.'

সিম্বলিস্টদের গুরু-স্থানীয় পেটারই প্রথম চর্চা করেন মুহূর্তমাহাত্ম্যের, হীরকদীপ্তিতে মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বলার তীব্রতার :

to give nothing but the highest quality to your moments as they pass, and simply for those moments' sake.

মুহূর্তের ক্ষণিকতাই যন্ত্রণার কারণ, মুহূর্তের এই নশ্বরতাই মহৎ কাব্যের বিষয় এলিঅটের শেষ চারটি কবিতায় :

The moments of happiness—
Not the sense of wellbeing, fruition, fulfilment, security or affection,
Or even a very good dinner, but the sudden illumination—
We had the experience but missed the meaning,
And approach to the meaning restores the experience
In a different form, beyond any meaning
We can assign to happiness.

For most of us, there is only the unattended
Moment, the moment in and out of time,
The distraction of it, lost in a shaft of sunlight,
The wild theme unseen, or the winter lightning,
Or the waterfall or music heard so deeply
That it is not heard at all, but you are the music
While the music lasts.

এই সব সুখের মুহূর্তগুলি—পাতার আড়ালে শিশুর দল, হাস্যরত, সূর্যের রশ্মিপাতে হঠাৎ উচ্ছল বা নিরুদ্দেশ; শুষ্ক সরোবরের শানে রৌদ্রের ছটা; গোলাপ-বাগানের কুঞ্জগুলি; ত্বরিতে, এখনই এখানে, এখনই, চিরকাল—এই সব মুহূর্তগুলি বারবার ঘুরে-ফিরে আসে চারটি কবিতাতেই এবং পরিবারের পুনর্মিলন নামক নাটকে। এই মুহূর্তগুলিই কি দি স্প্রিং অব্ দি টার্নিং ওয়ার্ল্ড ?

ঘূর্ণায়মান বিশ্বের স্থিরকেন্দ্রে দোলকযন্ত্রের প্রতীকটি এলিঅটের কাব্যে কোরিওলান্ যাবৎ দ্রষ্টব্য। প্রতীকটি তাঁর বহু গভীর কাব্যাংশের কেন্দ্র। মনে হয় এই পরিবর্তমান বিশ্বের স্থিরবিন্দুটি, দেয়ার হোয়্যার দি ড্যান্স ইস, যে নাচে বিশ্বজন মোহিছে, নাচের গতিতে নেই, যতোটা আছে ঐ সব নিছক মুহূর্তে, আছে শৈশবের অমর স্মৃতিতে। অর্বাচীন রোমান্টিক ওআর্ডসওঅর্থের মতো, প্রবীণ ধ্রুপদী এলিঅটও গান করেন শিশুমনের নিরালম্ব শুদ্ধতার।

Issues from the hand of God, the simple soul (Animula).

ঈশ্বরের হাত থেকে বাহিরিয়া সরল হৃদয় যদি বিজ্ঞানে চেষ্টা না করে 'পরিবর্তমান সদা আকারে ও বর্ণে চির জড় এ পৃথিবী' নিয়ন্ত্রিত করতে, তাহলে পেটারের মুহূর্তসাধনা ছাড়া উপায় কি বা ওঅর্ডস্ওঅর্থের শৈশবের অমরত্বাবাহক সংবাদ ছাড়া? কারণ শিশু স্বভাবতই আত্মসচেতনতায় বিধুর নয়। কিন্তু ঐ নাচের প্রতীক ?

প্রত্যক্ষ জীবনের অবসাদ ও বুদ্ধিগত পরোক্ষতত্ত্বের প্রাণবত্তায় চিন্তিত ভালেরি এই নাচের প্রতীক টেনেছেন তাঁর স্থপতি য়ুপালিনস্—মন ও নৃত্যের

বিষয়ে নামক সক্রাটিক আলাপে। ভালেরির যুক্তি এলিঅটের চেয়ে বেশি সম্পূর্ণ, সাধ ও সিদ্ধান্ত-সঙ্গত। দীর্ঘ এক আলোচনায় চিকিৎসার বাইরে এই জীবনাবসাদরোগ ক্ষণিক আরাম পেল শিল্পের স্বাধীন সত্তার স্পর্শে, আতিক্তের নাচের পরোক্ষ মুক্তিতে; এবং সক্রাটিস্ বলে ওঠেন :

হে অগ্নিশিখা!...
মেয়েটি আসলে হয়তো মস্তিষ্কহীন?...
হে অগ্নিশিখা!...
কে জানে ওর অতিসাধারণ মনটা কতো কুসংস্কারে
আর কতো খামখেয়ালে বোঝাই?...
হে অগ্নিশিখা, চির নিবাতনিষ্কম্প্র! প্রাণময় আর দেবতুল্য!...
এই অগ্নিশিখা, এ আর কি, বন্ধুগণ! যদি না এ হয় সাক্ষাৎ মুহূর্তটিই?...

এলিঅট কিন্তু ঐ অবসাদ-সীমা ছাড়িয়ে নাচটাকে একেবারে এবস্ট্রাকশন্ বা পরোক্ষতত্ত্বভাবে দেখেন না, নর্তককেও দেখেন না। অথচ নৃত্যের বিষয়ানুগ নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর মতো মহাকবিকে কাব্যবিষয় জোগাতে পারত। চিত্রকল্পটি সরল ও দ্বৈত—এক হচ্ছে দর্শক দূরে থেকে বসে দেখে এবং নর্তকদের খণ্ডগতির সমষ্টিতে উপলব্ধ হয় নাচটার রূপ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কবিও নৃত্যের মধ্যে সক্রিয়, নৃত্যের কেন্দ্র ঘিরে ঘুরে-ঘুরে এদিকে-ওদিকে সংলগ্ন নর্তকরা যেখানে নৃত্যকে মূর্তি দিচ্ছে। নৃত্যের খণ্ডিত কিন্তু সক্রিয় উপলব্ধিতে আসে নৃত্যের পরোক্ষ রূপটি, স্থানে কালে সমগ্রে ও খণ্ডের সংলগ্নতায়। এখানে দর্শকের ব্যক্তিগত বিষয়ী চিন্তাবলীতে উপলব্ধির আরম্ভ নয়। অংশের ক্রমিকতায় নয়, নর্তকের স্বাতন্ত্র্যে নয়, সারা নৃত্যে সক্রিয় উপলব্ধি একাগ্র। আমার প্রতীকটা স্থূল হল, কিন্তু এলিঅটের লেখনীতে এ প্রতীকের কাব্যোৎসারে বিশ্ব ও ব্যক্তি, বিষয় ও বিষয়ীর চৈতন্যকৈবল্য কি মর্মস্পর্শী রূপ নিতে পারে তা কল্পনীয়।

শেষ কবিতাগুলিতে এলিঅট এ প্রতীকের খুবই কাছাকাছি আসেন। তাঁর অন্বিষ্ট—বিষয়সর্বস্ব বা বিষয়বিষয়ীর দ্বন্দ্বাতীত স্থিরবিন্দুটি, স্থিতি যার গতির মধ্যে, অবিচ্ছিন্ন চিৎপদ্মের মধ্যমণিতে। বিষয়লগ্ন এই দৃষ্টি সম্ভব সক্রিয়চক্রের মধ্যে অস্তিত্বস্বীকারেই, উপর থেকে আবছা দেখায় বা পাশ থেকে তির্যক দৃষ্টির ছবিতে দ্রষ্টাদৃশ্যের মীমাংসা ঘটে না। এবং এই চক্রবৎ পরিবর্তন তো জীবনেরই গতি যার পরিধির পারে শুধু মৃত্যুরই নেতি নেতি। তাই মৃত্যুর জীবন্ত ছলা—মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দর্শকের স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু এ স্বাধীনতায় নৃত্যের রূপায়ণ ব্যাহতই হয়, স্থিরবিন্দুটি হয় অস্থির। ঘূর্ণায়মান বিশ্বের স্থিরবিন্দুর এ প্রতিবাদে, মানছি, অশান্ত হৃদয় অনেক চমৎকার কল্পনা ছিটিয়ে বেড়ায়,—অনেক নরকল্প দেবদেবী, কাল্পনিক আয়রল্যান্ডের মত পুরাণ, অনেক তন্ত্রমন্ত্রের কুহক।

এলিঅট তাই অনিবার্যকারণে বিজ্ঞানবিদ্বেষী, মানবচৈতন্যের সমগ্রতা তাঁর কল্পনায় নেই, জড়প্রকৃতি বা সমাজে সম্ভব যে মানুষের নিয়ন্ত্রণ তা তিনি মানেন না। তাঁর সুরে পণ্যাবিপ্লবের দ্বিধাদীর্ণ বেদনার—হোয়াট ম্যান হ্যাজ মেড

অব্ ম্যান! মানুষের মনের ভাঙন মর্ত্যলোকে চিরস্থায়ী, কারণ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' কিঞ্চিৎ সুখসুবিধাও আছে। সুতরাং—

And hear upon the sodden floor
Below, the boarhound and the boar
Pursue their pattern as before
But reconciled among the stars.

অমানুষিক ঐ নক্ষত্রস্বর্গ আমাদের দায়িত্বের নাগালে নয়, অতএব কর্মফলহীন কর্মে কিবা লাভ? শিকার-শিকারীর প্রকৃতি নশ্বর জীবনে চিরাচরিত, তার থেকে আসে মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তার গভীর আবেদন।

এলিঅট অবশ্যই সাম্রাজ্যের স্তম্ভ নন, তবু তিনিও যে দায়িত্বহীন ব্যক্তি-স্বরূপের মতবাদ খাড়া করে ইটন-হ্যারোর ব্যক্তিমাহাত্ম্য গান করবেন এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আর সমাজপারিপার্শ্বিকের প্রভাব ও সংস্কৃতির প্যাটর্নস মানবেন না, তাতে সাম্রাজ্যের পাপই প্রমাণিত। সেই পাপেই জড়প্রকৃতি বা পশুপ্রকৃতির সঙ্গে মানবস্বভাবকে এক করা ইতিহাসের চোখে মার্জনীয়, ঈশ্বরের চোখে নারকীয় ভ্রান্তি। কিন্তু আমার মন্তব্যের স্থানে এলিঅটের আশ্চর্য কবিতা উদ্ধৃত করাই বাঞ্ছনীয়।

At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless:
Neither from nor towards; at the still point, there the dance is,
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity.
Where past and future are gathered. Neither movement from nor towards,
Neither ascent nor decline. Except for the point, the still point,
There would be no dance, and there is only the dance.
I can only say, there we have been: but I cannot say where.
And I cannot say, how long, for that is to place in time.

অতুলনীয় এ-কবিত্বে শ্রদ্ধা স্বতই অসীমে পৌঁছায়; ভাবি এবারে বুঝি আইন্‌স্টাইন্-প্লাঙ্কের জগৎ, আধুনিক জীববিদ্যার মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞা কাব্যের গভীর রূপ পেল। কিন্তু এ পরিগ্রহণ সাময়িক, এলিঅটের দ্বন্দ্ব যে নিরাকৃত হয়নি তার প্রমাণ ভিন্নস্তরের অভিজ্ঞতার ব্যর্থ মধ্যপদলোপী সন্ধিচেষ্টায়। গতি ও আপেক্ষিকতা এবং স্থিতিকেন্দ্র অস্বীকারের ব্যথিত ভিত্তিতে, ব্যক্তির চৈতন্যের কল্পিত তাঁর দ্বিধা :

I said to my soul, be still; and let the dark come upon you
Which shall be the darkness of God. As, in a theatre,
The lights are extinguished, for the scene to be changed

With a hollow rumble of wings, with a movement of
darkness on darkne
And we know that the hills and the trees, the distant
panorar
And the bold imposing facade are all being rolled away—
Or as, when an under-ground train, in the tube, stops toc
long between statio
And the conversation rises and slowly fades into silence
And you see behind every face mental emptiness deepen
Leaving only the growing terror of nothing to think abou
Or when, under ether, the mind is conscious but consciou
of nothi
I said to my soul, be still, and wait without hope
For hope would be hope for the wrong thing;
wait without lc
For love would be love of the wrong thing; there is yet fai
But the faith and the love and the hope are all in the waitir
Wait without thought, for you are not ready for thought
So the darkness shall be the light, and the stillness
the danci
Whisper of running streams, and winter lightning,
The wild theme unseen, and the wild strawberry,
The laughter in the garden, echoed ecstasy
Not lost, but requiring, pointing to the agony
Of death and birth.

মর্মভেদী এ কাব্যের পরে নতমস্তকে জানাতে হয় বিচলিত হৃদয়ের সম্ভ্রম। কি
ধার্মিক মরমিয়ার একি মহাশূন্য? মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সম্প
জীবনের শেষে জীবন্মৃত্যুর ছলার দৃপ্ত স্বীকার বা পূরবীর ঐশ্বর্যের কথ
শূন্যতার অগ্নিবাষ্পে ভরা।

এ স্থির মহাশূন্যের সমস্যাই আরো সহজবোধ্য নাট্যরূপ পে
ফ্যামিলি রিয়ুনিঅন্‌এ। বুড়ো লেডী মন্‌চেন্‌সে এমির অতীতের শে
নাটকের আরম্ভ:

O Sun that was once so warm,
O Light, that was taken for granted
When I was young and strong and sun and light unsought

স্থূলবুদ্ধি আইভি বলে: আমি হলে সূর্যের পিছনে ছুটতুম, সূ
আশায় থাকতুম নাকো বসে। চার্লস্‌ বলে: এমি আমাদের বনেদী ধ
চিরটা কাল ঘোড়া ও কুকুর বন্দুক নিয়ে কাটিয়ে শেষে ইংলন্ড ছেড়ে কো

তাবে শীত। এমির দিন কাটে উইশউড্ প্রাসাদে ছেলের প্রতীক্ষায়। লর্ড হ্যারি আট বছর ধরে সারা পৃথিবী ঘুরছে এক বাজে বউ নিয়ে। এগাথা বলে : তার প্রত্যাবর্তন নিশ্চয়ই হবে যন্ত্রণাকর,

I mean painful, because everything is irrevocable,
Because the past is irremediable,
Because the future can only be built
Upon the real past...
He will find a new Wishwood. Adaptation is hard.

এমি বলে : কিছুই তো পরিবর্তন হয়নি। এগাথা উত্তর দেয় : আমি বলছি যে উইশ্উডে হ্যারি দেখবে আরেক হ্যারিকে। যে মানুষ ফিরবে সে দেখবে সেই ছেলেটিকে যে যাত্রায় বেরিয়েছিল। ইতিমধ্যে হ্যারি জাহাজ থেকে তার নির্বোধ স্ত্রীকে সাগরতলে পাঠিয়ে ফিরে এল। একা, তার পিছনে পিছনে গ্রীক গল্পের বিবেকরূপিনী চণ্ডভগিনীরা প্রতিশোধের খোঁজে ছুটছে, ফিরে এল বরনূট নর্টনের মতো উইশ্উডের জমিদার-বাড়ীতে। হ্যারি দেখল সেই সব চেনা মানুষ, যারা আত্মঅচেতন, যাদের মনের তীরে ঘটনার ঢেউ বৃথাই আছড়ে আছড়ে পড়েছে, আর সে নিজের মনের বালাই নিয়ে অস্থির।

হ্যারি বলে তার নিঃসঙ্গতার কথা, ভীড়ের মধ্যে একাকিত্বের বুকচাপা ভার, আর স্ত্রীর মৃত্যুর কথা, নিজের যন্ত্রণা। ছোট মাসী এগাথা সান্ত্বনা দেয় আর বলে :

There is more to understand, hold fast to that
As the way to freedom.

যা আবশ্যিক, তার সীমা স্বীকারেই তো মুক্তি। এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হ্যারি বলে : মনে হয় বুঝি তোমার মানেটা, অস্পষ্টভাবে—সেই যেমন তুমি বুঝিয়েছিলে চিমনিতে কান্নাটা বা অন্ধকার ঘরে সেই মন্দটার ভয়।

মেরি-র সঙ্গে ছেলেবেলার স্মৃতির আলাপের পরে হ্যারি বুঝতে পারে স্মৃতিজীবী বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের ভ্রান্তি :

The instinct to return to the point of departure
And start again as if nothing had happened.
Isn't that all folly?

এখানে এলিঅট কিভাবে তাঁর মোট প্রশ্নগুলি তোলেন এবং নিজেই জবাব দেন, সেটা লক্ষ্য করবার বিষয়। কিন্তু চণ্ডিকাদের সামনে হ্যারি আবার আঁকড়ে ধরে বহুধা ব্যক্তিস্বরূপের অছিলা : আমি যখন তাকে (স্ত্রীকে) খুন করেছিলুম, সে আমি আর এ আমি এক নয়। চেম্বরলেন-সরকারের দায়িত্ব আর চার্চিল্ সরকারকে ভুগতে হবে না। এগাথা বৃথাই বলে যায় যে শাস্তি এড়িয়ে অপরাধের দায়িত্ব এড়ানো যায় না :

That there is always more: We cannot rest in being
The impatient spectators of malice or stupidity.
We must try to penetrate the other private worlds
Of makebelieve and fear. To rest in our suffering
Is evasion of suffering. We must learn to suffer mor

প্রায় মাক্সীয় প্রজ্ঞার এ আভাসে শেষটা অবশ্য হ্যারি চণ্ডিকাদের বহির্বি
করতে সক্ষম হল এবং পেল মনের মুক্তি :

This time you are real, this time you are outside m
And just endurable.

এখানে হ্যারির যে ব্যাখ্যা তার বাপমায়ের অপরিতৃপ্ত প্রেমের, সে বিষয়ে এক
কথা বলা যায়—দেয়ার ওয়াজ নো এক্‌স্‌ট্যাসি। তাই কি এলিঅটের সা
কাব্যে শুধু প্রেমের ক্লান্তি ও বীভৎসতা—দি বোর্‌ডম, দি হরর্‌-ই আ
প্রেমের আনন্দ, দি গ্লোরি শেষ ডাং এন্ড ডেথ্‌-এ? এতো বড় কবির কা
সংগ্রহে মাত্র দুটি কবিতায় প্রেমের বিষয়ে এলিঅট একটু সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে
—লা ফিল্লিয়া কে পিয়ান্‌জে এবং দি ওএস্টল্যান্ডের প্রথম অংশে। তা
সেখানে কবির বিষয় রবীন্দ্রনাথের মতোই প্রেমের চঞ্চলতা, পিয়াস, প্রেমে
সম্পূর্ণতা নয়। বোধ হয় প্রেম দুই ব্যক্তির দ্বৈতে একটি চলিষ্ণু সম্বন্ধ ব
তাতে মুহূর্তবিলাসী দেখে শুধু ক্ষণিক সক্রিয়তার অনাচার।

গীতা এলিঅটকে তাঁর কাব্যের চমৎকার রসদ জুগিয়েছে, তাই গীতা
ভাষাতেই বলা যায় যে কর্মেন্দ্রিয় নিবৃত্ত রেখে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষ
সমূহে মনে মনে বাস করে, সে উদ্‌ভ্রান্ত জন কপটাচার করে। বলাই বাহুল
কাব্য আচরণ নয়, কাব্য হচ্ছে মনের অন্তরঙ্গ উদ্বেলতার বহির্বিষয়ে অঙ্গীকা
কাজেই কপটতা নয়, উদ্‌ভ্রান্তিই এখানে দ্রষ্টব্য। এই উদ্‌ভ্রান্তি ছাড়া এলিঅটে
একাধারে আশ্চর্য সুকুমার প্রজ্ঞান্বেষণ এবং মৃত্যুর উপরে ভয়ানক ঝোঁ
মেলানো যায় না। ক্ষুধা নয়, রোগ নয়, প্রেম নয় ঝগড়া নয়, যুদ্ধ দুর্ভি
নয়, কারণ এইসবই মানুষের সক্রিয় সাধ্যের ভিতরে, শুধু বিষ্ঠা আর মৃত্যু
মৃত্যু যে স্বাভাবিক, এবং স্বাভাবিক নিয়ে শোক করা যে নির্বুদ্ধিতা, সে
অবশ্যই এলিঅট জানেন তবু কেন এত ঝোঁক? প্রাজ্ঞ কখনো বিচলিত হন ন
জীবিত বা মৃতের জন্য। এলিঅটের মুখ্যবিষয় নিশ্চয়ই আত্মসচেনতার সমস্যা
আত্মসচেতন ও কর্মের আপাত দ্বন্দ্ব,—কর্মফল নয়,—কর্মের আর আত্মসচেত
মনের সঙ্গতির সন্ধান, বিচ্ছিন্ন জীবনের পুরুষার্থে ঐক্যের সমস্যা।

নিশ্চয়ই থিয়েটারসভার নিষ্কর্ম ঐ অন্ধকার নয়। কারণ কৃষ্ণ উবাচ
নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলেও কর্মের দায় এড়ানো যায় না। প্রকৃতিজাত কার
জীবমাত্রেই প্রতিমুহূর্তে কর্মস্রোতে চলিষ্ণু। কর্মের স্বাধীনতা কর্মের মধ্যে
সকল কর্মের সমগ্রতায়, হে পার্থ জ্ঞানের উৎস। আগুন যেমন জ্বলতে-জ্বল
ইন্ধনকে করে দেয় ছাই, জ্ঞানের অগ্নি তেমনি জ্বলে কর্মের জ্বলার মধ্যেই।

কিন্তু হৃদয় যদি মানেনা মানা, যদি মুহূর্তেই বসে থাকে অনড় জড়
পদার্থবৎ? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যদি সোনার হরিণের মায়ায় ডাকে? সে বাসনা

পরিণাম রাগে, কারণ এ পিয়াসী মন বৈজ্ঞানিকোচিত নৈর্ব্যক্তিকতায় ভেবে না কেন মুহূর্তের বাসনা চিরস্থায়ী বস্তু হতে পারে না, তাই হয় নিরাশ। ক্রোধ থেকে আসে, কৃষ্ণ বলেন, ভ্রান্তি থেকে উচ্ছৃঙ্খল দৌরাত্ম্য প্রতীকোৎসারী স্মৃতির যন্ত্রণা। যতোই বিশৃঙ্খল, যতোই ...ণা, ততোই জীবনে অসহিষ্ণুতা—বাসনাসঙ্কুল এই যে জীবন অসম্বন্ধ, সমর্থনহীন, একক আত্মজ্ঞানের দ্বন্দ্বে স্মৃতিমুখর। আর দুর্মর স্মৃতি।

আমার বিশ্বাস এলিঅট এই ভাবগুলিই নাট্যকাব্যে রূপায়িত করেছেন তাঁর ...সোনা (রূপায়ণে শিল্পীর নাট্যরূপ বা মুখোস) সুচিন্তিত, তিনি নিজে ... তোমার-আমার মতো সাধারণ লোকই হচ্ছে নাট্যপাত্র, বাদবিসম্বাদে ...ভ্রান্ত। তাই তিনি বলতে পারেন যে মুক্তির পথ শূন্যের পথ, মালার্মের ...তের মতো। ধর্মসাধকেরা আধ্যাত্মউপলব্ধির এ বর্ণনা মানেন না, এলিঅটের ...তা সাধক নিশ্চয়ই সে বর্ণনা করতে চাননি। এ শূন্য বোধ হয় শুধু যন্ত্রণার ... নিখাদে চড়িয়ে দেবার কৌশল।

এলিঅটের এই সমস্যা। বিজ্ঞানবিরোধী, তিনি গতিশীল জীবনে কোনো ডায়ালেক্‌টিক্‌সের হাল ধরতে পারেন না। সমস্যাটা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। টমাস্‌ ব্রাউন্‌ এই সমস্যার শিং ধরে সমাধান করেন নিজের মতো, ধর্মে তাঁর বিশ্বাস নেতিবাচক ছিল না, বিজ্ঞানেও ছিল আস্থা; তিনি ভিন্ন স্বতন্ত্র ন্যায়বিশ্বের মতবাদে সমাধান খুঁজে পান যাতে অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞান দুইই বিশ্বাস্য। ...টেনের সমাধানও প্রায় এইরকম যদিচ তাতে জিজ্ঞাসার ভাগটাই বেশি। মিলটন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিরই একচেটে ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁর ঈশ্বর প্রায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির রূপক বললেই হয়। বেকন তো বৈজ্ঞানিক। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরায় সেকালে ডনের কান্নাটা খুব করুণ—এন্ড নিউ ফিলসফি কল্‌স্‌ অল্‌ ইন্‌ ডাউট। এলিঅটের অবস্থা প্রায় ডনের মতো; মনের গঠনে নেই অধ্যাত্ম-জীবীর ঐশ্বর্য, তবু তিনি ধর্মবাদী স্থায়ী বন্দোবস্তের মরিয়া ভক্ত। তাই এ বিচ্ছেদের, ভেদাভেদের গান। কৃষ্ণ ব্যাপারটা জানলে হয়তো বলতেন, ... জ্ঞানে সর্বজীবের বিবিধ জীবনধারা বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত, সে জ্ঞান ...সনাদুষ্ট।

বলাই বাহুল্য গীতার অপব্যবহারে আমার কিছুমাত্র আর্যোচিত আপত্তি নেই। এলিঅট নিজেই তো সেনেকা প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কি করে, অজ্ঞানে বা ...পজ্ঞানের ভিত্তিতে মহৎকাব্য রচিত হতে পারে। দি ড্রাই স্যাল্‌ভেজেস্‌-এর ...কালো গীতাব্যবহারে আমার কাব্যাস্বাদ পরিতৃপ্ত; আর পাণ্ডিত্য না থাকায়, পাণ্ডিত্যাভিমান সংযত করার প্রশ্নই ওঠে না। আমার মতে দি ড্রাই স্যাল্‌-ভেজেস্‌ই কবিতাচতুষ্টয়ের মধ্যে সবচেয়ে আঁটসাঁট কবিতা। লিটল্‌ গিডিং-এর ...ন্তশোভন ভাস্কর্য ও গাম্ভীর্য সত্ত্বেও এই শেষ কবিতাটি এক হিসাবে প্রত্যাবর্তন। এখানে এলিঅট শেষ করেছেন এয়র-রেড রাত্রির জাঁকালো বর্ণনার ... নটিংহ্যামের রয়্যালিস্ট চ্যাপেলে প্রথম চার্লসের নৈশাভিযানে যখন ...তর্যুদ্ধে রয়্যালিস্টরা হেরে গেল। অবিসম্বাদী কবিত্বে এলিঅট আর্তনাদ ...রেছেন পার্টিরাজনীতির নশ্বরতায়। মৃত্যুতে, কালস্রোতে রয়্যালিস্টও শূন্যে ...ীয়মান, কি হবে কিছু করে, লড়ে, তাই হায় হায়।

আমি শেষ করি তৃতীয় কবিতার আশাপ্রদ শেষ ছত্রে :

We content at the last
If our temporal reversion nourish
(Not too far from the yew tree)
The life of significant soil.

প্রুফ্রকের আত্মসচেতন নিষ্ক্রিয় কৈশোর থেকে এ কবি পরিণতির দীর্ঘ মহাপ্রস্থান নমস্য কীর্তি তার করুণ রাজনীতিসত্ত্বেও।